বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা **হালখাতা**

ইতিহাসের দর্শন সংখ্যা

৩য় বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রকাশকাল
১ জুলাই ২০০৯

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭
ই-মেইলঃ halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা ‘ক্লোক নো নাম্বারস’ অবলম্বনে
[সংগ্রহ জাইদ বিন কালাম]

জনসংযোগ
আবদুল হাই

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৬ $ ডলার

সম্পাদকীয়ঃ এক

দর্শন মানেই প্রশ্ন, বিচার বিশ্লেষণ, সত্যের অনুসন্ধান; সেই দর্শনহীন ইতিহাস পালতোলা অথচ হালছাড়া নৌকার মতো। প্রকৃত ইতিহাসই পারে গত-হয়ে-যাওয়া সময়-কালকে জানার ও বোঝার সুযোগ করে দিতে। যে জানা-বোঝার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

মানুষের অগ্রসরমানতার পেছনে রয়েছে তার যে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণী মনোভাব, সেই জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণী মনোভাব সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত ইতিহাসকে বিতর্কের মুখে ফেলেছে। এদের ইতিহাস লিখিত হয়েছে চির অবহেলিত ও বঞ্চিত নিম্নবর্গের অবদানকে এড়িয়ে গিয়ে, এমনকি এদের অবদানকে অস্বীকার করেও। অথচ এই নিম্নবর্গের অংশগ্রহণ ব্যাতিত সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতি গঠন অসম্ভব। এক্ষেত্রে মার্কসবাদী ইতিহাসের দর্শন নিম্নবর্গের ইতিহাস-দর্শনের কাছাকাছি হওয়া সত্বেও, নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকে মার্কসবাদীরাও সমালোচনা করতে ছাড়েননি।

অন্যদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল কিছু উচ্চবর্গের হিন্দু ইতিহাসবিদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে লিখিত হয়নি এঅঞ্চলের মুসলমানদের ইতিহাস। অথচ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাকে অস্বীকার করা যায় না কোনোক্রমে। বলা হয় মধ্যযুগে সাহিত্যের লাগাম টেনে ধরে রেখেছিল মুসলমানরাই।

এছাড়া আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। যা লেখা হয়েছে তা সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। বঙ্গবন্ধু, জেনারেল ওসমানী, জিয়াউর রহমানসহ সকল সেক্টর কমান্ডার ও অন্যান্য বীরদের অবদানের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ যে অবদান রেখেছেন, সেই ইতিহাস রচনা করার সময় এসেছে। এধরনের ইতিহাস রচনার কৌশলটা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা ব্যতীত উচ্চ বা মধ্যবর্গ নিজেদের ইতিহাসকে বৈধ করতে পারবেন না। এ-ও মনে রাখা দরকার, নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের উপাদান থাকে যা মার্কসবাদ চর্চার সহায়ক, প্রতিবন্ধক নয়।

ইতিহাস লেখা ও চর্চা মুক্তি পাক কূপমণ্ডুকতার হাত থেকে; সেই লক্ষ্যে প্রকাশিত হল সংখ্যাটি। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

নির্বাহী সম্পাদক
০১.০৭.২০০৯

সম্পাদকীয়ঃ দুই

অতীতকে আমরা জানি না বলে ভবিষ্যৎকে দেখতে সাহস পাই না। আজকের বর্তমান এক সময়ের ভবিষ্যৎকাল ছিল; তখন আজকের সময়কে দেখতে পারিনি তাই বর্তমান আমাদের কাছে এত জঞ্জালপূর্ণ হয়েছে। এটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে ঠিকঠাক করে সাজানো যায় না; যখন সাজানো যেত সে-সময়টা অতীত হয়ে গেছে।

অতীত, সে 'ইতিহাস' হয়ে আমাদের কাছে তার রেপ্লিকা পাঠায়। অতীত মানেই ইতিহাস নয়; ইতিহাস মানেও অতীত নয়; ইতিহাস হল অতীতের রেপ্লিকা, নকল রূপ।

নকল মানে হল নতুন সৃষ্টি, যা আসল রূপ থেকে আলাদা। সে অর্থেই, শিল্প মানেই নকল। ইতিহাস হুবহু ঘটনা নয়; ঘটনার শিল্পরূপ, যা নকলের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। ঘটনার যথেচ্ছ মিথ্যাচার কি তাহলে ইতিহাস হবে? হ্যা, তা-ও ইতিহাস হবে। সেক্ষেত্রে সেই ইতিহাস জনগণের পক্ষে যায় কি-না, জনগণের গ্রহণযোগ্যতা পায় কি-না, দেখতে হবে। ইতিহাসের গর্ভ হল 'ঘটনা'। সেই ঘটনা যেমন নির্মম হয়, একইভাবে কোনো ঘটনার 'ইতিহাস'ও নির্মম হতে পারে। ইতিহাস নির্মম হতে পারে এই অর্থে যে, বাস্তবে যা ঘটে, ইতিহাসে তার ঠিক উল্টোটা বর্ণিত হতে পারে; এমনকি ঘটনার উল্টো বিষয় ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেতে পারে। যাকে বলা হয় 'ইতিহাসের শিকার'।

বাংলা ভাষায় 'ইতিহাস' কিছু লিখিত হয়েছে বটে! কিন্তু 'ইতিহাসের দর্শন' নিয়ে একটি লাইনও কেউ মৌলিক লেখা লিখেছেন আমাদের জানা নেই। বাংলায় কেবল 'ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি' বইটির অনুবাদ মেলে। সেই অভাব হেতু হালখাতা'র এই ক্ষুদ্র আয়োজন।

আমাদের অনেক কিছুই নেই, যা আছে সেটা হল সীমাহীন হীনমন্যতা, মূর্খতা। সেই অসীম নেতিবাচক ভাণ্ডার থেকে ইতিহাস নয়, ইতিহাস বিকৃতি চলছে অনবরত। বাংলাদেশে 'ইতিহাসের দর্শন' লেখা তো দূরের কথা, 'ইতিহাস' লেখারও কি নিবেদিত-প্রাণ আছেন? যার পরিষ্কার জবাব হল নেই। আমরা যেন ভবিষ্যৎকে দেখতে চাই না, তাই অতীত না-লেখার এই লেখায় মেতেছি।

পৃথিবীতে যত ইতিহাস লেখা হয়েছে তার সবই সবলের ইতিহাস। দুর্বলের ঐ টুকুই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে যেটুকু সবলের ইতিহাস বৈধ করার জন্য প্রয়োজন। দুর্বলের ইতিহাস কখনো লেখা হয়নি; তারপরও যেটুকু পাই সেটা সবলের চোখে দুর্বলকে যে-রূপ দেখা যায়, সে-রূপ। কিন্তু দুর্বলের মধ্যে যে শক্তি, প্রেম ও ত্যাগ আছে সেটা ব্যতীত কোনো সভ্যতাই কি টিকে থাকে? 'দুর্বল' এই সংজ্ঞায়নটি-ই-বা কাদের করা? এই সংজ্ঞা সবলেরই দেয়া। আর প্রতিটি 'সবল' শ্রেণী যখন উচ্চারণ করে 'আমাদের', তখন ঐ 'আমাদের' শব্দটির মধ্যে শ্রেণীকরণের প্রক্রিয়াই বিদ্যমান থাকে। এযাবৎ কালে সকল ইতিহাসই হল শ্রেণীকরণের প্রেষণা হতে জাত। যখন বলা হয় 'সাদা' ও 'কালো', 'উঁচু' ও 'নিচু', 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'– তখন এর গভীরে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাদারা কখনো কালোদের ইতিহাস লিখবে না, উঁচুরাও নিচুদের ইতিহাস লিখবে না– একইভাবে এ অঞ্চলের উচ্চ বিত্তের হিন্দুরা এ অঞ্চলের পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের ইতিহাস লেখেনি। একই কারণে তারা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ইতিহাসও লেখেনি।

বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের কারণে এখন এ অঞ্চলের মুসলমানদের ইতিহাস লেখার সুযোগ এসেছে। মান্যবর আহমদ শরীফ ও সেলিম আল দীন মুসলমানের অবদান কিছুটা দেখিয়েছেন; কিন্তু সেগুলো ইতিহাস আকারে আসা দরকার। এবং সেটা হতে হবে ধর্ম হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের বর্ণনা মাত্র নয়, বরং মুসলমান হওয়ার কারণে অবহেলা-বঞ্চনার শিকার এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বরূপ ও লড়াইকে জানার প্রয়োজন থেকে। সেই সঙ্গে হিন্দু নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং আদিবাসীদের ইতিহাসও ব্যাপকভাবে লেখা জরুরি।

যারা রাষ্ট্র চালান তাদের এসব বিষয়ে বোধদয় হওয়া কঠিন, কারণ তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকেন অশিক্ষিত। সেক্ষেত্রে হয়ত তাদের দিয়ে কিছু উদ্যোগ অন্যরা গ্রহণ করাতে পারেন। কারণ আমাদের লিখিত ইতিহাস যে নেই এটি-ই সত্য। সেই সত্যকে 'হালখাতা' তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তুলে ধরল; নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ না-লেখা এই ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নেবেন।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিয়ে যারা সঙ্গে থেকেছেন, তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদক
০১.০৭.২০০৯

সূচি

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

সেরা চিন্তাবিদদের সমাবেশ কিন্তু...
জাঈদ বিন কালাম ০৬
রবীন্দ্রনাথের কাছে আর কত চাই?
মিজানুর রহমান ০৮

প্রবন্ধ
ব্যক্তিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
সিরাজুল ইসলাম ০৯

প্রবন্ধ
জন-ইতিহাস কী এবং কেন?
আহমেদ কামাল ১২
ইতিহাসচেতনা: অতীতের মোহ ও ভবিষ্যতের কল্পস্বর্গ
আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৫
ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি?
কালী প্রসন্ন দাস ২৪

প্রবন্ধ
ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে– একটি মার্কসীয় অবতারণা
আবুল বারকাত ৩০
স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা: ইতিহাসের পরিহাস দর্শন
মেসবাহ কামাল ৪৪

প্রবন্ধ
ইতিহাসের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়
যতীন সরকার ৫২
ইতিহাসের দর্শন : বৈজ্ঞানিক সত্যের খোঁজে
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার ৫৭

প্রবন্ধ
ইতিহাসের দর্শন: কতটুকু বুঝেছি
মুস্তাফা জামান আব্বাসী ৬৩
ইতিহাস ও দ্বন্দ্ব
মো. আব্দুল আউয়াল ৬৫
ইতিহাসের দর্শন ও নারীর জীবন
ফেরদৌসী সুলতানা ৬৯
ইতিহাসের দর্শনে বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান
ইসরাইল খান ৭২
ইতিহাসের দর্শন
জাকির তালুকদার ৭৬
ইতিহাস ও তার ভিত্তি
আদিত্য চৌধুরী ৮১

অনুবাদ

ইতিহাসের দর্শন : মার্ক্সের রচনায় বস্তুর অধিবিদ্যা স্কট মাইকেল/
অনুবাদ শওকত হোসেন ৮৪

প্রবন্ধ

মহাভারতের ঐতিহাসিক সত্য ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা
জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২
ইতিহাসের দর্শন: ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালীন প্রভাব
শাহ্ আলম সারওয়ার ১০০
ইতিহাসের চোরাবালি: উপলব্ধির শিথিলতা
ফরীদুল আলম ১০৩
ইতিহাসের দর্শন, উপনিবেশের বাসনা
ফয়েজ আলম ১০৯

প্রবন্ধ

ইতিহাসের দর্শন : একজন পাঠকের অবস্থান থেকে
নূর মোহাম্মদ ১১৩
যিশু ও ইতিহাস
শামসুদ্দোহা শোয়েব ১৩০
ইতিহাসভক্ত বলে ভেবে সে আমাকে সেঁকে দেয় কালের কঙ্কাল
গাজী রফিক ১৩৪
নারীর ইতিহাস দর্শন: কয়েকটি সম্পূরক কথা
জোহরা পারুল ১৩৬
নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের ইতিহাস দর্শন
আজিজুল রাসেল ১৩৯

সেরা চিন্তাবিদদের সমাবেশ কিন্তু...

কোনো জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সংকটকালীন সময়ে সেরা চিন্তাবিদ এবং গবেষকগণ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যে একমত পোষণ করেন তার জলজ্যান্ত উদাহরণ মেলে হালখাতার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়। সমষ্টিগত ভাবে আমরা 'বাঙালিরা' যে একরকম ভাবে ভাবতে পারি, একে অন্যকে একসঙ্গে জানতে এবং জানাতে পারি এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিকতা আর ভারসাম্যহীন অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতেও জেনেছি অন্তত জাতিগত ভাবে এই ঐক্যের ভাবনাটি আমাদের প্রেরণার উৎস, যুগে যুগে তাই আমরা 'বাঙালিরা' জয় করেছি অনেক বাধা।

"দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা সংখ্যা" এবারের হালখাতা-য় প্রধানত দুই ধরনের লেখা স্থান পেয়েছে। একদিকে গবেষণাধর্মী-পেশাধারী রচনা অন্যদিকে মতামত সম্বলিত মর্মস্পর্শী অনুভব। আবুল বারকাত, আতিউর রহমান, আনু মুহাম্মদ, এম এম আকাশ, নূর মোহাম্মদ, ফরীদুল আলম, হারাধন গাঙ্গুলী, মাহমুদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ তাদের স্ব-স্ব প্রবন্ধে 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা' সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী ভাবনার ঐক্য ঘটিয়েছেন। তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্লেষণ, যুক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আলোচকগণ

দেখিয়েছেন কিভাবে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তথাকথিত 'সিন্ডিকেট'-এর দুষ্ট চক্রকে ভেঙে চাহিদা-সরবরাহকে স্থিতিশীল রেখে এবং সরকারের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকার মধ্যদিয়ে 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি' রোধ করে তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নাগালে রাখা সম্ভব। 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা সংখ্যা: পৃথিবী আজ কোন পথে?' এই শিরোনামে বদরুদ্দীন উমর হালখাতার সাক্ষাতে যেমনটি বলছেন: "আমাদের এখানে যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা, তাতে উৎপাদনটা হয় সামাজিক ভাবে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা ব্যক্তিগত। কিন্তু যা হওয়া দরকার সেটা হল; উৎপাদন হবে সামাজিক, একইভাবে মুনাফা বা সুবিধা বণ্টনও হবে সামাজিক উপায়ে।... স্বাভাবিক ভাবে এখানে যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে তার দীর্ঘমেয়াদী একটি ভীষণরকম খারাপ প্রভাব রয়েছে।" তবে উমরের শেষ কথার সাথে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না: "পুঁজিবাদের ধ্বংসপ্রায় অবস্থাটি প্রমাণ করে যে, সমাজতন্ত্র মানুষের ঐতিহাসিক নিয়তি।"

সারা দেশ আজ তুচ্ছ-নগণ্য পণ্যের এক বিশাল বাজারে পরিণত। আমাদের আজ দশ রকম শ্যাম্পু, বারো-চোদ্দ প্রকারের কোমল পানীয়ের তো কোনো প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার সাথে এসকল পণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। যার মূলে রয়েছে সরকারের অপরিকল্পিত এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা। অন্যদিকে একটি বহুজাতিক কোম্পানি যদি পারে তার পণ্যের যথেচ্ছ মূল্য গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করতে তাহলে কেন একজন কৃষক তার রক্তঘাম করা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেন না? যে বাজার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ তাকে মদদ দেয়ার-ই-বা দরকার কী? আবুল বারকাত যেন ঠিক একই প্রসঙ্গে বলছেন তাঁর 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন' প্রবন্ধে: "মনে রাখতে হবে অবাধ বাজার অর্থনীতি দরিদ্র-বান্ধব নয়; অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বাজার বিকৃত হতে বাধ্য। যে বিকৃতি রোধে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য অনস্বীকার্য। কিন্তু চলমান রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ।" তার শেষ কথা অনেকটা সঙ্গত বলেই মনে হয়: "সুতরাং দেশের সত্যিকার উন্নতি বিধানে নিশ্চিত করতে হবে মানুষের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা, যার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা।" কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এটাই যে, দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী, আবুল মাল আবদুল মুহিত, হালখাতার সাক্ষাতে বলছেন ঠিক উল্টোটি: "পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৈষম্য থাকবেই। প্রবৃদ্ধি যত বৃদ্ধি পাবে বৈষম্যও ততই বাড়তে থাকবে।... প্রবৃদ্ধি যদি আট এমনকি নয় শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যায়, তাহলে এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কোনো মানুষই অন্তত অনাহারে থাকবে না বা বাসস্থান-চিকিৎসার অভাবে থাকবে না।" দেশের শাসনকাঠামোতে যখন যে ব্যক্তিই আসেন না কেন আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে তারা সবাই কীভাবে যেন একই সুরে কথা বলেন। তারা এমন সূত্র চিত্তে ধারণ করেন যা সারাক্ষণ জপ করতে থাকেন। যার প্রতিফলন ঐ সাত আট ধরনের প্রবৃদ্ধি বাস্তবে কখনোও আর দেখা যায় না। মুহিত-এর "নিশ্চিত" হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের পুরোদমে সন্দিহান করে তোলে। অন্যদিকে তিনি এ-ও স্বীকার করে নেন যে: "মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণই হল সিন্ডিকেট"।

বর্তমান অর্থমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকারটি হালখাতার অন্য সকল প্রবন্ধের নিরিখে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত এই কারণে যে প্রায় সবগুলো লেখাতেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি ভূমিকা ও হস্তক্ষেপের কথা আলোচিত হয়েছে বারবার। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়েছে এ ব্যাপারে খোদ অর্থমন্ত্রী তার সরকারের হয়ে কী ভাবছেন। আর এ কারণেও আবার হালখাতাকেও সাধুবাদ জানাতে হয় কেননা খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনকোয়েরি করা হয়েছে এই সাক্ষাতকারটিতে। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশে এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রচলিত যেখানে জনগণ তাদের নাগরিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার জন্য সরকারকেই প্রত্যক্ষ কিংবা

পরোক্ষভাবে দায়ী করে; এর থেকে পরিত্রাণের উপায়ও তার কাছেই খোঁজে। আবার অন্যদিকে, সরকারও ঠিক উল্টো কাজটি করে। তারা সব দায়ভার চাপায় জনগণের ওপর আর ঠিক এরকমই মনে হল আমাদের অর্থমন্ত্রীর কথায় যার মাধ্যমে তিনি এই "দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি" সমস্যার সমাধান চাইছেন: "সব তো আর আইন করে করা যায় না, অনেক কিছুই মানুষের নিজস্ব বিচারবোধের ওপর ছেড়ে দিতে হয়। ... কথা হল আমাদের সেই সংস্কৃতি নেই কিন্তু সব তো লিখেও হবে না যদি না আমরা মানুষ হিসেবে উন্নত হই।" তাহলে ব্যাপারটি কি এমন দাঁড়াচ্ছে না যে "দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি" এই সমস্যার সমাধান সাধারণ মানুষ নিজেরাই করতে পারে। অর্থমন্ত্রী কি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কথা ভাবছেন না? এই সকল রাজনৈতিক ডিসকোর্স-এর বাইরে গিয়ে আইনুন নিশাত তাঁর 'কেনাকাটা ও দ্রব্যমূল্য এবং বৈশ্বিক মন্দা' প্রবন্ধে অনেকটা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলে যান: "মাঠ পর্যায়ে কৃষককে তার উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা যেমন সমাজের দায়িত্ব, তেমনি একজন সাধারণ ক্রেতা যাতে কোনো দুষ্টচক্রের কারণে অধিক মূল্য দিতে বাধ্য না হন, সেটা দেখাও সমাজের দায়িত্ব। আর সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা আছেন, তাদের হাতে। ... একজন সাধারণ ভোক্তাকে পণ্যদ্রব্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা কে দেবে? আবারও বলব, এখানে রাষ্ট্রের রেগুলেটরি দায়িত্ব রয়েছে।"

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া যে অর্থনীতির কোনো অংকই বোঝে না তার পরিচয় পাওয়া গেল আনু মুহাম্মদ-এর 'দাম বৃদ্ধির ব্যাকরণ এবং পুঁজির নানা বাহু' প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন এই সময়ের "দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি" এদেশেরই অত্যধিক মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের অনৈতিক চরিত্রের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ। চাহিদা (demand) এবং সরবরাহ (supply) কোনো নিয়মেই এই বিরূপ প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। "...চাহিদা বাড়ে। যোগানও বাড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়ে। ...এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ভোক্তাদের জিনিসপত্র ক্রয়ের চাহিদার অনমনীয়তা। দাম বাড়লেও চাহিদা এখানে কমে না। এবং এই অনমনীয়তা বা বাধ্যবাধকতার সুযোগটিই গ্রহণ করতে চেষ্টা করে ব্যবসায়ীরা।" তিনি এ-ও উল্লেখ করেন ব্যবসায়ীদের কোন্ শ্রেণীটি কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: "... এই দামবৃদ্ধি বৃহৎ পাইকারি পর্যায় থেকে হচ্ছে– স্বয়ংক্রিয় বা বিচ্ছিন্নভাবে নয়।" আবুল বারকাত-এর সাথে তাঁর বোঝাপড়ার ঐক্য এখানেই: "মুক্তবাজারের আড়ালে কতিপয় গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া কর্তৃত্বের সন্ধান। সেটা হল, কতিপয় আমদানিকারক, কতিপয় পাইকার, পণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় খাজনা বা চাঁদাবাজ গোষ্ঠী কৃত্রিম দামবৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফার আয়তন বৃদ্ধি করে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তবাজার অর্থনীতির কোনোরূপ সুফল তো আমরা পাচ্ছিই না বরং তা দিন-কে-দিন আমাদের কৃষিউৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিকে করছে বিপর্যস্ত।

এবারের সংখ্যায় "দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা" মোকাবেলায় যে সকল উপায় বাতলেছেন প্রায় সকল লেখক তা যদি আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের কান পর্যন্ত পৌঁছে, তারা এগুলো যদি উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই মঙ্গল। নইলে অমানিশা খুব নিকটেই। যে কাজ শত শত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আর ওয়ার্কশপ করতে পারছে না তা হালখাতা করছে অবলীলায়– চিন্তার মিথষ্ক্রিয়ায় ঘটাচ্ছে পাঠকের চেতনার উত্তরণ।

এ সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে আরও যাদের লেখায় তারা হলেন, রেহমান সোবহান, আতিউর রহমান, এম.এম আকাশ, শাহ আলম সারোয়ার, নূর মোহাম্মদ, আবীর হাসান, হারাধন গাঙ্গুলী, মিজানুর রহমান, ফেরদৌসী সুলতানা, সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, আদিত্য নজরুল ও অপর্ণা হাওলাদার। বলা যায় এদের প্রত্যেকের লেখাই উৎকৃষ্ট। ফরীদুল আলমের লেখাটি বিশেষভাবে মনোযোগ কাড়ার মত। এই প্রথম একটি সংখ্যা, যেখানে শওকত হোসেনের অনুবাদ ছিল না। জাঈদ বিন কালামের অনুবাদটি ছোট হলেও চিন্তাসমৃদ্ধ।

জাইদ বিন কালাম
পাঠক, লেখক। শ্যামলী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে *আর কত চাই?*

এই সংখ্যার একটি বিষয়ের সঙ্গে বিরোধিতা না করলেই নয়; রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে যে মূল্যায়ন করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত পোষণ করতে পারছি না। আমাদের উচিত রবীন্দ্রনাথকে আর টানাটানি না করা; তিনি অনেক তো দিয়েছেন, তাঁর কাছে আর কত চাই?

যা-হোক, দেখতে দেখতে 'হালখাতা'র ছয়টি সংখ্যা বেরিয়ে গেল! প্রতিটি সংখ্যা একেকটি বিষয়ের ওপর। যা ভবিষ্যতে বাংলাভাষার চিন্তাচর্চার সম্পদ হয়ে থাকবে। বর্তমান সংখ্যাটি 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিশ্বমন্দা' নিয়ে। এ সংখ্যায় লিখেছেন বাংলাদেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদগণ। রেহমান সোবহান, আবুল বারকাত, আতিউর রহমান, আনু মুহাম্মদ, এম. এম. আকাশ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ দেশের সেরা চিন্তাবিদ হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক মানের লেখক হিসেবে নিজ নিজ গুণে ভাস্বর। এত জন অর্থনীতিবিদের এতগুলো ভালো লেখা একটি সংখ্যায় পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়। এরকম একটি সংখ্যা বাংলাদেশ কেন পশ্চিম বাংলাতেও গত পঞ্চাশ বছরেও হয়েছে কি-না আমার জানা নেই।

বিশ্বমন্দা নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি দূর হওয়ার জন্য সংখ্যাটি বিশেষভাবে কাজে আসবে। বিশ্বমন্দা নিয়ে হেন বিষয় নেই যা এই সংখ্যায় আলোচিত হয়নি। বিশেষত্বপূর্ণ সেই সব কোটেশন উল্লেখ করতে গেলে হয়তো বড় কোনো প্রবন্ধ বা বই-ই লিখতে হবে। এখানে সেই সুযোগ নেই। দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিশেষ করে আবুল বারকাতের লেখাটি আক্রমণাত্মক। এ ধরনের লেখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের টনক নড়ার কথা। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে যারা যুক্ত কিংবা এই বৃদ্ধি রোধের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কেউই যদি এগুলো না-পড়েন, তাহলে আমাদের মতো বেচারা গোছের মানুষের হাততালি বা নিন্দার কোনোই মানে দাঁড়াবে না। সে জন্য সংখ্যাটি প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনা যেতে পারে। তাতে দ্রব্যমূল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তার দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা তথ্য পেয়ে উপকৃত হবেন।

অপর্ণা হাওলাদার, আদিত্য নজরুলসহ আরও দু'এক জনের লেখা আমার ভালো লাগেনি। এদের লেখায় যেমন ভাষাগত সমস্যা আছে, আবার এগুলোকে অপরিপক্ক লেখাও মনে হয়েছে। মিজানুর রহমান, ফেরদৌসী সুলতানা, ফরীদুল আলম, শাহ আলম সারোয়ার, আবীর হাসান– সম্ভবত এদের কেউই অর্থনীতিবিদ নন। তবু সহজ ও ঝরঝরে ভাষায় এদের লেখা সুখপাঠ্য যা সহজ অথচ গভীর চিন্তায় সমৃদ্ধ। আইনুন নিশাত সহজ কথায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে পণ্যের দাম বাড়ে। নূর মোহাম্মদ সাহেবের লেখাটি তার ভাষার কারণে পড়তে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং তিনি এত কোটেশন ব্যবহার করে যেন অযথাই লেখাটি টেনে দীর্ঘ করেছেন। হারাধন গাঙ্গুলীর লেখাটি তথ্যবহুল এবং মানসম্মত।

অর্থমন্ত্রী একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েও অনেক খোলামেলা জবাব দিয়ে নিজের সবল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এবারে কিছুটা দরিদ্র-বান্ধব বাজেট করার জন্য তাঁকে বাড়তি অভিনন্দন জানাই। শ্রদ্ধাভাজন বদরুদ্দীন উমর এই সংখ্যায় তার সাক্ষাৎকারে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে কিছুটা হলেও হতাশ হয়েছি। অবশ্য নিরেট অর্থনীতি নিয়ে তাঁর পক্ষে কথা বলাও হয়তো কষ্টসাধ্য ছিল। তবে সাক্ষাৎকারের শুরুতে উমর সম্পর্কে যে ভূমিকা দেয়া হয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের যে-কোনো সচেতন ব্যক্তিমাত্রই একমত হবেন।

মিজানুর রহমান
প্রাবন্ধিক, গল্পকার
বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ঢাকা।

প্র ব ন্ধ

ব্যক্তিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

সি রা জু ল ই স লা ম

মধ্যযুগে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যবস্থার নানা নিয়ম-নির্দেশনায় বাঁধা ছিল মানুষের 'জীবন' ; সে জীবন ছিল পাপী ও অসহায়, চার্চের চোখে কনডেম্‌ড বা ঐশ্বরিকভাবে প্রত্যাখ্যাত। প্রার্থনাই ছিল একমাত্র মুক্তির পথ। মধ্যযুগীয় এ চিন্তাকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন ফরাসি চিন্তাবিদ ও আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের জনক রেঁনে ডাকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)। মধ্যযুগীয় বাঁধন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন অস্তিত্ব হিসেবে একজন "ব্যক্তি" মানুষকে সমাজ, রাষ্ট্র ও চার্চের উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রথম প্রবক্তা ডাকার্তের চিন্তায় মানুষের অবস্থান ঠিক উল্টো। অর্থাৎ মানুষই সবার উপরে, কেননা সমাজবদ্ধ জীবন, রাষ্ট্র ও ধর্ম মানুষের চিন্তার ফসল, যত ক্ষতিকরই তা হোক-না কেন। তিনি দাবি করলেন মানুষের অসহায়ত্বের চিন্তাটি বিধাতার নয়, নিয়ন্ত্রণলোভী মানুষের, চার্চের, তথা রাষ্ট্রের।

ডাকার্ত ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার ডাক দিলেন। তাঁর মতে মানুষ অসহায়, পাপী ও প্রত্যাখ্যাত জীব নয়, বরঞ্চ মানুষ অবিশ্বাস্য রকম এক সৃষ্টিশীল সত্তা। প্রতিটি ব্যক্তি এ সৃষ্টি শক্তির অধিকারী। ডাকার্তের বিখ্যাত উক্তি ও think, therefore, ও ধস। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব আছে, সত্তা আছে কেননা সে চিন্তা করতে পারে, আর চিন্তা করতে পারা মানে সিদ্ধান্ত নেওয়া, গ্রহণ করা, বর্জন করা, এক কথায় সৃষ্টি করা। চার্চের 'অসহায়ত্ব' দাবি চ্যালেঞ্জ করে ডাকার্ত যুক্তি দেন যে জ্ঞান দৈব কিছু নয়, জ্ঞানের উৎস মানুষের চিন্তা। জ্ঞানের উৎস হিসেবে তিনি মধ্যযুগীয় ধর্মবাণী, ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যুক্তিতর্ককে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাবি করেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল মানুষ নিজে। তাকে কথায়, মানুষ যখন নিজে চিন্তা করতে পারে এবং সে যখন তার দেহজগতের মালিক, তখন তাঁকে জ্ঞানের জন্য বাহ্যিক উৎসকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজেকেই সে সার্বভৌম দাবি করতে পারে, ধ্যান ও চিন্তার মাধ্যমে বাহ্যিক জগতকে জানতে পারে এবং এমনকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে ডাকার্তের এ চিন্তা দার্শনিক মহলে Individualism বা ব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত হয়। ডাকার্তের তত্ত্বকে একটি পুরাদস্তর রাজনৈতিক তত্ত্বের রূপ দেন ইংরেজ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক টমাস হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯)। হব্‌স তাঁর Individual I Social Contract গ্রন্থে ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের আদি নির্মাতা হিসেবে ঘোষণা দেন। তাঁর মতে, আদি সমাজে সবাই ছিল স্বাধীন এবং এসব স্বাধীন ব্যক্তিরাই একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সমাজ গঠনের এবং পরে ঐ ব্যক্তিরাই একটি চুক্তির মাধ্যমে গঠন করেছে রাষ্ট্র ও সরকার এবং ব্যক্তিবাদী মানুষ সেটা করেছিল তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য, তাদের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বিসর্জনের জন্য নয়, বাহ্যিক কোনো কর্তৃপক্ষকে পূজা-অর্চনার জন্য নয়। ডাকার্ত এবং হবস্-এর ব্যক্তিবাদ তত্ত্ব অতি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে অনেক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দার্শনিকদের। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জন লক (১৬৩২-১৭০৪), বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (১৭০৬-৯০), এ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০) ও টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯)। ব্যক্তিবাদের পক্ষে এবং চার্চ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাঁদের মতবাদের ফলে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্র ও চার্চের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত তৈরি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে দেখতে পাই কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন ইংল্যান্ডে Glorious Revolution (১৬৮৮), আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮৩) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। প্রতিটি বিপ্লবে দেখতে পাই ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে এবং স্বৈরাচারের বিপক্ষে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও বিপ্লব। বদলে যেতে শুরু করল গোটা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মানস। সব কিছুর উপরে স্থান লাভ করল ব্যক্তি ও তার অধিকার, তার চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা। ভেঙে পড়তে শুরু করল সামন্তবাদী উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা। সকল প্রকার উৎপাদন, বিতরণ ও অর্থায়নে প্রাধান্য লাভ করল ব্যক্তি। দাবি করা হয় যে, ব্যক্তিবাদ দর্শনের ফলে মানুষের মধ্যে যে মেধার বিকাশ ও জীবনভঙ্গিতে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে এর একটি অন্যতম ফল আঠারো শতকের শেষ পাদের শিল্প-বিপ্লব এবং তদজনিত সামাজিক পুনর্গঠন ও সর্বত্র ব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা থেকে উদ্ভূত হল অন্য পরিবর্তন যার নানামুখী প্রভাব যা ছিল ডাকার্ত, হবস্, লক প্রভৃতি দার্শনিকগণের পূর্বধারণার বাইরে। এক পরিবর্তন সূচনা করে আরেক পরিবর্তনের যার ডালপালা বিস্তারের পরিধি পূর্ব থেকে অনুধাবন করা কঠিন। ব্যক্তিবাদ নানামুখী পরিবর্তনের সূচনা করল। এক পরিবর্তন থেকে আরেক পরিবর্তনের, সূচনা এবং সে পরিবর্তন যেন সীমাহীন।

সর্বপ্রথম পরিবর্তন হাজার বছরের সামন্তব্যবস্থায় ভাঙন সূচনা, এবং এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি; ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরাতন গিল্ড সিস্টেম-এর পতন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মুনাফামুখী প্রতিযোগিতা ও পুঁজিবাদের বিকাশ এবং পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা; নগরায়ণ, পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তঃসাগরীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা; জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশে ঔপনিবেশিক বসতিস্থাপন, একচেটিয়া পুঁজিবাদী জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক যুদ্ধ, এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ঘন ঘন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং সবশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এসব ঘটনারাজির আদিসূত্র ব্যক্তিবাদ। কিন্তু মানুষের মেধার মুক্তি যে ইতি ও নেতিবাচক এসব পরিবর্তন আনতে পারে তা ছিল সতেরো শতকের দার্শনিকদের চিন্তার বাইরে। এসব দ্রুত ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে গবেষণার সূচনা করেন টমাস পেইন, ডেভিড হিউম, মার্কস এবং এঙ্গেলস। দার্শনিকভাবে তাঁরা সবাই একমত যে, নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিবাদ এবং নিয়ন্ত্রণহীন রাষ্ট্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে আঁতাতই শিল্পায়িত দেশগুলোকে পুঁজিবাদী শোষণ, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর উপশম হিসেবে তাঁরা সুপারিশ করেন ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার যার উদ্দেশ্য হবে রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা, ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা, এবং ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। তা না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যক্তিবাদ মানুষকে নির্মমভাবে স্বার্থপর ও মুনাফামুখী করে তোলে, যার সার্বিক ফল অভ্যন্তরীণভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিকভাবে বাজার দখলের প্রতিযোগিতা এবং এর ফলশ্রুতিতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ।

অনেকে দাবি করেন যে, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও আধিপত্যবাদের মাধ্যমে শিল্পায়িত দেশগুলো পদানত অশিল্পায়িত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু আসলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের নেপথ্য পরিচালক হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণী সহজেই রাষ্ট্রকে সরকারি অর্থ ব্যয়ে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্ররোচিত করতে পেরেছে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ব্যয় বহন করেছে সরকার কিন্তু অধীনস্থ দেশ থেকে আয় আহরণ করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী। জে.এ. হবসন তাঁর অতি প্রভাবশালী গ্রন্থ Imperialism: A Study *(১৯০২)*-তে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য থেকে আগ্রাসী রাষ্ট্র ও এর জনগণ কোনোভাবেই লাভবান হয়নি, বরং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু সব সময়ই যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে সুবিধা লাভ করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী এবং ঐ পুঁজিবাদী শ্রেণীই বরাবর রাষ্ট্রকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। এ সম্পর্কে এক পর্যবেক্ষণে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিকাশের শুরুতেই অর্থাৎ ষোল শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ মানববাদী ও রাষ্ট্রনায়ক স্যার টমাস মোর (১৪১৭-১৫৩৭)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে বাজার সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অপার অর্থ ব্যয় ও অগণিত মানুষের জীবন দিয়ে মানুষকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা– এটা কেমনতরো ব্যবসা? আসলে আমি তো দেখতে পাচ্ছি পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রের শিকার রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মানুষ। নিজেদের পুঁজি ও সুবিধা আরো বৃদ্ধি করার জন্য, শোষণের পরিধি আরো সুসংহত করার জন্য রাষ্ট্রকে জড়ানো হচ্ছে যুদ্ধে, আর বলা হচ্ছে এটা কেবলই রাষ্ট্রীয় স্বার্থে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ চলছে ষোল আনা বৈদেশিক বাণিজ্যে রত পুঁজিপতিদের স্বার্থে"। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জনক বৃটেন, কারণ বৃটেনেই সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লবের উৎপাদন ব্যবস্থার জঠর থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর প্রথম সংঘবদ্ধ পুঁজিপতি শ্রেণী। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার অনেক অতিরিক্ত উৎপাদন করার ফলে অতিরিক্ত পণ্য বিদেশে বাজার সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদেশে স্থায়ী বাজার সৃষ্টি করতে না পারলে পুঁজিবাদের তথা আধুনিক বৃটেনের পতন অবশ্যম্ভাবী। এ মর্মে প্রথম তত্ত্ব দেন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। তাঁর চিন্তাধারায় সমর্থন দেন জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২), টমাস মালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) এবং তদীয় পুত্র স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রমুখ চিন্তাবিদ। তাঁরা সবাই ছিলেন বৃটিশ Utilitarian Movement- এর পুরোধায়। এ আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতির সমর্থন দেয় একটি নৈতিক কারণে যে, তাদের ভাষায় ঔপনিবেশিক প্রজা হিসেবে 'হীনতর' ও অনুন্নত দেশগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতার শাসনাধীনে থেকে সভ্যতার আলো লাভ করার সুযোগ লাভ করবে। তাঁদের যুক্তি, পৃথিবীকে শুধু সভ্য মানুষ দিয়ে অধ্যুষিত করাতে হলে হয় হীন সমাজগুলোকে ধ্বংস করে দিতে হবে নয় এদেরকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সভ্যতার নিম্নস্তর থেকে উপরে তুলতে হবে, এবং যেহেতু অনুন্নত সমাজকে ধ্বংস করা মানবিক কারণে সমীচীন নয়, একে সাম্রাজ্যের প্রজাতে করাই মানবিকভাবে শ্রেয়। এ ধরনের তত্ত্ব আঠারো শতক থেকেই পাই, তবে তা বিশেষ পুষ্টি পেল শক্তিমানের অনুকূলে ডারউইন-এর প্রাকৃতিক বাছাইয়ের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব থেকে।

কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক চিন্তায় সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে। কার্ল মার্কস পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, এবং পুঁজিবাদের আশু অবক্ষয় ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলে ভবিষ্যৎবাণী দেন। কিন্তু তাঁদের তত্ত্ব ডাকার্ত ও লকের তত্ত্বের মতো তেমন ফলপ্রসূ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, অন্তত ইউরোপে। বরঞ্চ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে জে.এ.

হবসনের যুগান্তকারী গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর। ১৯০২ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ Imperialism: A Study (১৯০২) পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের চিন্তায় অনেক প্রভাব ফেলে হবসনের তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা। সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে হবসন যুক্তি দেন যে, বৃটিশ সরকারের জন্য ভারত সাম্রাজ্য ছিল একটি প্রকাণ্ড আর্থিক বোঝা, কিন্তু পুঁজিপতিদের জন্য ছিল একটি সোনার খনি। বিশাল বাজার, বিশাল খনিজ সম্পদ, বিশাল কৃষি সম্পদ, নীল, তামাক, চা, আফিম, চিনি, যোগাযোগ, বনজ সম্পদ সবই ছিল বৃটিশ পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে। ভারতকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বৃটিশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি খাতে বৃটিশ সরকার যে ব্যয় বহন করত তা কর আকারে কখনো ফিরে আসেনি। তবুও ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে শুধু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে।

সবশেষে, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদী শ্রেণী বিভাজন ও পুঁজিপতি সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে মার্কস ও এঙ্গেলস তাত্ত্বিকভাবে যে সিদ্ধান্ত টানেন, হবসনের দলিল ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক Imperialism তাই প্রমাণ করল। ডাকার্ত ও তাঁর অনুসারীরা যখন 'ব্যক্তিবাদ' দর্শন প্রচার করেন তখনকার প্রেক্ষাপটে তত্ত্বটি ছিল একটি মুক্তির সনদ: চার্চ, সামন্ত মূল্যবোধ ও স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তির মুক্তি। I think, therefore, I am ঘোষণাটি ছিল বিদ্যমান সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সোজা উল্টিয়ে দেওয়ার একটি ঘোষণা। চার্চ ও সামন্তচিন্তায় ব্যক্তির নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। ব্যক্তি হল চার্চ ও সামন্তসমাজের অধীস্থ একটি আজ্ঞাবহ জীব। এটাই ভগবানের ইচ্ছা। ব্যক্তিকে স্বীকার করা মানে চার্চকে অস্বীকার করা, সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা। চার্চের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিবাদ তত্ত্ব দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং এর প্রথম এবং প্রধান ফসল হিসেবে দেখতে পাই আঠারো শতকের Enlightenment Movement। Enlightenment Movement-এর প্রভাবে ব্যক্তিবাদ একটি শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নেয় আঠারো শতকে। বিধিবদ্ধ সমাজ থেকে ব্যক্তি বেরিয়ে এল পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে। এর প্রভাবে দেখতে পাই সামন্তবাদের অবক্ষয়, চার্চের আধিপত্য হ্রাস এবং মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎরিয়ে আধুনিক উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উন্মেষ, শিল্পের বিকাশ, নগরায়ণের প্রসার ইত্যাদি, এক কথায় আধুনিক ইউরোপের উদ্ভব। সামাজিক বন্ধন-বিধিনিষেধ থেকে ব্যক্তির মুক্তি মানুষের ইতিহাসে একটি মস্তবড় ঘটনা। সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধনমুক্ত হতে পেরেই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হল জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার, নতুন নতুন সৃষ্টির। এরই আন্তঃপ্রক্রিয়ায় দেখতে পাই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জয়যাত্রা, যার ফসল শিল্প-বিপ্লব। তবে ব্যক্তি একদিকে যেমন সৃষ্টিশীল, অপরদিকে স্বার্থপরও। ঐ স্বার্থপরতার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদ ছিল ধর্ম ও আনুগত্যভিত্তিক, এবং সাম্রাজ্য ছিল এক ধরনের স্থানীয় রাজন্যশ্রেণীর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ফেডারেশন। এ ফেডারেশনে স্থানীয় ধর্ম, বর্ণ, সমাজব্যবস্থা থাকত অক্ষত। যেমন হলি রোমান সাম্রাজ্য, মুসলিম সুলতানাত, মুগল সাম্রাজ্য, চীনা সাম্রাজ্য ইত্যাদি। কিন্তু শিল্পবিপ্লবোত্তর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ছিল পুঁজি ও মুনাফা যা সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

আঠারো ও উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়া এবং মানবতার ওপর এর প্রভাব বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাই মার্কস-এঙ্গেলস থেকে। তাঁদের বিশ্লেষণেই দেখতে পাই কিভাবে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুনাফামুখিতা, আবার মুনাফা থেকে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ। ডারউইনসহ উনিশ শতকের অনেক মনীষী মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বার্থকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পুঁজিপতি শ্রেণী নেপথ্য থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে এতটুকু এগুতে পারত না। অস্তিত্বের লড়াইয়ে বড় ছোটকে এবং সবল দুর্বলকে গ্রাস করা প্রকৃতির নিয়ম। তবে তাঁদের মতে সুখী সমৃদ্ধ মানবসভ্যতা গড়ে তুলতে হলে এই প্রাকৃতিক নিয়মকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকতে হবে সকল নাগরিকের জন্য মেধা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানুষের মেধাকে বিকশিত করার জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির প্রসারের জন্য ব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকল্প নেই, তবে এ স্বাধীনতা থেকে যেন কোনো ধ্বংসাত্মক শ্রেণী-স্বার্থপরতা সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। রাষ্ট্র সে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

প্র ব ন্ধ

জন-ইতিহাস কী এবং কেন?

আ হ মে দ কা মা ল

দুটো বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে *দ্য প্র্যাকটিস অব হিস্টরি* গ্রন্থে ঐতিহাসিক জি. আর এলটনের একটি উক্তি, যার বাংলা করলে অনেকটা এরকম অর্থ দাঁড়ায়– 'মানুষ এ যাবৎকাল যা করেছে, বলেছে, ভেবেছে এবং সর্বোপরি যত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে তার সবটাই ইতিহাস-চর্চার অন্তর্গত।' তারপরও কথা থাকে। পুরো অতীতটা কিন্তু কোনোভাবেই পুনরুদ্ধার হয় না। কারণ যেটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণ টিকে আছে অথবা যুক্তি খাটিয়ে যতটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করা যায়, তার ভিত্তিতে ঐটুকু অতীতই কেবল উদ্ধার করা সম্ভব। আসলে ইতিহাস-চর্চা হচ্ছে বর্তমানের গায়ে অতীতের যে ছাপ তাকেই বোধগম্য করা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেজেন্ট এভিডেন্স। অর্থাৎ আজ এই মুহূর্তে যে এভিডেন্সগুলো হাতের কাছে তাই দিয়েই অতীতের পুনর্গঠন চলছে। মনে রাখতে হবে এভিডেন্স শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাশে রাজনীতিও নিরন্তর কাজ করে চলছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় ক্ষমতার সম্পর্ক দ্বারা। হেরোডোটাস থেকে শুরু করে *দ্য এন্ড অব হিস্টরি এন্ড দ্য লাস্ট ম্যান*-এর লেখক ফুকুয়ামার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত, মানবসমাজ প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও এর চেহারা ও বৈশিষ্ট্য নানারকম হতে পারে। ফোকাসটা আরো কাছে নিয়ে আসলে দেখা যাবে যে, ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ইতিহাস জাতিরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে। ইতিহাস-চর্চা অনেকখানি আটকা পড়েছে জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা শ্রেণীটির জীবনী রচনার মধ্যে। এই শ্রেণীটি উপনিবেশগুলোর ভাগ্যনিয়ন্তাও বটে। এই ইতিহাসের রাজনীতি তো খুবই স্পষ্ট। জন-ইতিহাসকে এই দুই বেড়া ভেঙে বের হবার আশ্বাস দিতে হয়। কাজটি মূলত রাজনৈতিক।

এবার জন-ইতিহাসের ইতিহাসটা একটু খোঁজ করা যাক। ঐতিহাসিক কারণেই এই ইতিহাস-চর্চার আদিভূমি ইউরোপ। পিটার বার্ক জন-ইতিহাস চর্চার সূচনাকে আখ্যায়িত করেছেন 'ডিসকভারি অব দ্য পিপল' নামে। সুইডেনের ঐতিহাসিক এরিক গিজারের (১৭৮৩-১৮৪৭) হিস্টরি অব দ্য সুইডিশ পিপল, চেক ঐতিহাসিক ফ্রানটিসেক পালাকির (১৭৮৩-১৮৭৬) হিস্টরি অব চেক পিপল, ম্যাকলির ১৮৪৮ সালের হিস্টরি অব ইংল্যান্ড এসবই ইতিহাসে জনগণ আবিষ্কারের পথিকৃৎ। জনগণ আবিষ্কারের এই কাজটিতে পর্যটকরা অনেকখানি সাহায্য করেছে। ১৭৭০ সালে ইতালির পাদ্রি আলবার্তো ফরতিস ডালমাশিয়া ভ্রমণে যেয়ে মোরলাচিদের জীবনপদ্ধতি, সংস্কৃতি, ধর্ম-আচার ইত্যাদি দর্শন করেন। প্রথম পর্যায়ে জন-ইতিহাসের একটি প্রধান উপাদান কিন্তু লোকসঙ্গীত। জার্মান কবি ও ফোকলরিস্ট আসিম ভন আরনিমের (১৭৮১-১৮৩১) মতে, লোকসঙ্গীত ইউরোপের অনেক দেশের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। জাতির কল্পনাটা যদিও বুদ্ধিজীবীদের কাছে থেকেই এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইতিহাস-চর্চা এক নতুন বাঁক নেয়। ইতিহাস এবার 'পলিটিক্স এন্ড প্রোডাকশন অব আইডেন্টিটি'তে জড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে উঠতি দেশীয় ক্ষমতাধরদের নির্ভরযোগ্য মিত্র হয় ইতিহাস। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয় জাতিরাষ্ট্রের। ৬০-এর দশকে এসে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই জাতীয় ইতিহাস যেসব গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে লেখা হচ্ছিল সেইসব অবহেলিত গোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকের এই তালিকায় প্রাক্তন ক্রীতদাস, শ্রমিক শ্রেণী, দাগী আসামি, নারী, শিশু, বৃদ্ধ এরা স্থান পেতে থাকে।' ৭০-এর দশকে এই ইতিহাসকেই বলা হত হিস্টরি ফ্রম বিলো।

'৭০ ও '৮০-এর দশকে সদ্য উল্লিখিত তালিকাটি আরো একটু বড় হয়। এবার ছোটখাটো জাতিসত্তা, নারী ও পুরুষ সমকামী এরাও ইতিহাসে স্থান পেতে শুরু করে। এদের ইতিহাস 'মাইনরিটি হিস্ট্রি' নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রমনা ঐতিহাসিকরা জাতির ইতিহাসের মূলধারা থেকে বাদ যাওয়া এইসব জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসের ধারায় ফিরিয়ে আনতে শুরু করেন। যে মাইনরিটির কথা উল্লেখ করা হল, তালিকাটা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে তারা শুধু সংখ্যায় নয়, গুরুত্বেও মাইনরিটি। গত দশকের শুরু থেকে মাইনরিটি হিস্টরির কাছ থেকে সরকারি অথবা সরকারি সমর্থনপুষ্ট জাতীয় ইতিহাস দেশে দেশে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। দীনেশ চক্রবর্তীর মতে, উত্তর-আধুনিকদের 'মহাআখ্যান' বা 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ'-এর সমালোচনা ব্যবহার করে জাতির একটি মাত্র সত্যায়িত ইতিহাসের ধারণাকে পরিত্যাগ করছে। প্রমাণ করা হচ্ছে জাতি আসলে অনেকগুলো প্রতিযোগী আখ্যানের সৃষ্টি। মাইনরিটি হিস্টরির লড়াইটা আসলে এই জাতির কাহিনীতে জায়গা করে নেবার লক্ষ্যে পরিচালিত। আমরা যে জন-ইতিহাসের কথা বলছি তা আসলে ঐ মাইনরিটি হিস্টরি। প্রথমে তা প্রতিবাদী ইতিহাস হিসেবে মাথা তোলে,

তারপর ধীরে ধীরে তা মহা-আখ্যানের মিছিলে শরিক হয়। প্রতিবাদী চরিত্রটা তখন বাড়তি একটা খোলসে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাস যেহেতু একটি সাক্ষ্য-প্রমাণভিত্তিক যুক্তিনির্ভর আখ্যান তৈরির কৌশল, সেহেতু জন-ইতিহাস চর্চা একটু আয়াসসাধ্যও বটে। আমি প্রথমেই স্মরণ করিয়েছি সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া ইতিহাস তৈরি হয় না। সমাজে আমরা যাদের জনগণ, ছোটলোক বা নিম্নবর্গ বলি তারা কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের দলিল রেখে যায় না, তাদের কীর্তির বেশিরভাগই ধরা থাকে স্মৃতিতে। এই স্মৃতিকে ইতিহাস করার প্রক্রিয়াকে সম্প্রতি 'মুখের কথায় ইতিহাস' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানেই জন-ইতিহাসের উপাদান নিয়ে দু'একটা কথা সেরে নেয়া ভালো। জন-ইতিহাসের উপাদান কী? লিখিত সূত্রের অভাবে মৌখিক সূত্র নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান উপাদান। তাছাড়া, গুজব, গান, কৌতুক, লৌকিক উৎসব, অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের রচিত পথুয়া সাহিত্য যাতে ৮ থেকে ১৬ পাতার কবিতা, তবে এর কোনোটাই নির্ভেজাল লৌকিক সূত্র নয়। একে দক্ষতার সাথে ও সঠিক তাত্ত্বিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ধীরে ধীরে– ইংরেজিতে যাকে বলা হয় আনপ্যাক করা, সেই কাজটিই করতে হয়। জনস্মৃতির সমস্যা নিয়ে বর্তমানকালের ফরাসি দার্শনিক ফুকো কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে জনস্মৃতি মিশেলহীন নয়। জনস্মৃতি 'unified, fully achieved and therefore capable of sustaining a memory wholly apart from the dominant construction of the past' এ কথাটি ফুকো স্বীকার করেননি। আসলে প্রায়শই জনস্মৃতিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে আবদ্ধ মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। এই বিষয়ে সচেতন না হলে জন-ইতিহাসের সত্যিকার অবস্থানটা শনাক্ত করা সম্ভব হবে না। জন-ইতিহাসের পক্ষের রাজনীতি ও গভীর সৃজনশীলতা দ্বারাই জন-ইতিহাস তৈরি সম্ভব।

আমি এরকম তিনটি রচনার উদাহরণ দিতে চাই। বার্কলের অধ্যাপক দিলীপ বসু ও তাঁর সহযোগীর লেখা *মল্লবীর*। এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। মল্লবীর কলকাতার অপরাধ জগতের এক উড়িয়া গুণ্ডা। দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে সে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছিল। দাঙ্গার রাজনীতিতেই উচ্চবর্গের সঙ্গে এই সাধারণ গুণ্ডার সম্পর্ক, তার চৈতন্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অবয়ব এই সকল জটিল দিকগুলো তার জবানীতেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। মল্লবীরের স্মৃতিকে ইতিহাস করার এই পদ্ধতি আয়ত্তের মধ্যেই জন-ইতিহাস তৈরির ক্ষেত্রটি বড় হতে পারে।

দ্বিতীয় নিবন্ধটি ইউরোপের ইতিহাস থেকে পাওয়া। নিবন্ধটির শিরোনাম 'ওয়ার্কারস রিভোল্ট: দ্য গ্রেট ক্যাট ম্যাসাকার অব দ্য রু সেইন্ট-সেভেরিন' ১৭৩০-এর দশকের শেষ দিকে প্যারিসের একটি ছাপাখানার শ্রমিকেরা মালিকের অনেকগুলো বেড়াল নির্মমভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিশ বছর পর এই ঘটনার একটি বিবরণ হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী একজন শ্রমিকের জবানীতে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সেই বিবরণকে ভিত্তি করে রর্বাট ডার্নটন বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের প্যারি নগরীর এক অসাধারণ সামাজিক আখ্যান তৈরি করেন। প্যারির অন্ধকার ছোট ছাপাখানার জগতটাকে তিনি উদ্ভাসিত করেন তার সৃষ্টিশীল ইতিহাস-চর্চার আলোকচ্ছটায়। আমাদের সামনে তুলে ধরেন তৎকালীন প্যারির শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ছাপাখানার শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের সংস্কার ও চেতনার জগৎ–সর্বোপরি শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের এক অসাধারণ কাহিনী। এই ইতিহাসের নায়ক বিপ্লবপূর্ব প্যারি নগরীর ছাপাখানার শ্রমিকেরা। এখানেও ইতিহাস তৈরির প্রাথমিক উপাদানে ঐ একটি ছোট্ট বিবরণ।

তৃতীয় নিবন্ধটির রচয়িতা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গের অবস্থানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্থপতি রণজিৎ গুহ। নিবন্ধটির নাম 'চন্দ্রা'স ডেথ'। রণজিৎ গুহ চন্দ্রার মৃত্যু সম্পর্কিত মামলার একটি ছেঁড়া অসম্পূর্ণ বিবরণকে অপূর্ব দক্ষতায় এক অসাধারণ ইতিহাস তৈরি করেন। ১৯ শতকের ভারতবর্ষের অন্ত্যজ সমাজের লাঞ্ছিত মহিলাদের এক অসাধারণ উপাখ্যান এই নিবন্ধটি। নারীবাদী ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রেও এই নিবন্ধটি একটি অমূল্য দলিল। অথচ অন্ত্যজ সমাজের নারীদের এই ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে একটি অসম্পূর্ণ ছেঁড়া দলিলের ওপর। রণজিৎ গুহ জন-ইতিহাসকে, যে ইতিহাসের নামকরণ তিনি নিম্নবর্গের ইতিহাস করেছেন, উদ্ধার করার আরো সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। আপনারা যারা তাঁর 'আ প্রোজ অব কাউন্টার ইনসারজেন্সি' পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন উচ্চবর্গের দলিলের ভিতরেই কীভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ যারা তাদের কীর্তির দলিল তৈরি করছে– অর্থাৎ উচ্চবর্গের সদস্যরা– তারা ক্ষমতার বিস্তার আর রক্ষার স্বার্থেই নিম্নবর্গকে তাদের দলিলে জায়গা করে দিচ্ছে। উচ্চবর্গের দলিল পাঠের এই পদ্ধতি শুধু অভিনবই নয়, জন-ইতিহাস উদ্ধারের এক সৃজনশীল পথও বটে। উপরে শুধুমাত্র তিনটি নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের নিবন্ধ আরো অনেক লেখা হচ্ছে। জন-ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্ররা সেগুলোর সাথে পরিচিত হলে জন-ইতিহাস চর্চা বিকশিত হবে।

রণজিৎ গুহর একটি বক্তব্য জন-ইতিহাস চর্চার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণীগোষ্ঠী, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বক্তব্যের বিষয় বলে স্বীকার করতে হবে সচেতনভাবে। এই সচেতনতার জন্য জনগণের পক্ষের রাজনীতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-উত্তর সমাজের প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট, গ্রাম-শহরের গরিব জনতা ও স্ত্রীলোকের ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে ও লিখতে হবে। এই দিকে এগুতে গেলেই বোঝা যাবে উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি তার বাহন প্রচলিত

ইতিহাস-বিদ্যা আমাদের জুড়ে আছে। ১৯১৮ সালের আমেদাবাদের সূতাকল ধর্মঘটের ইতিহাস যখন লিখতে হবে, তখন যেন মনে রাখা হয় যে সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা গান্ধী, শংকরলাল ব্যাংকার ও অনুসূয়া সারাভাইয়ের জীবনীর অধ্যায় মাত্র নয়। তার মধ্যে ধর্মঘটীদের চৈতন্যের শ্রেণীচেতনা যার অন্যতম উপাদান, একটি মূল্যবান ইতিহাস আছে। যে ইতিহাস মহাদেব দেশাই ও তেণ্ডুলকারের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়নি, তা আমাদেরই লিখতে হবে। যখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হবে তখন যেন মনে রাখা হয় এ আন্দোলন ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনই শুধু নয়; যখন ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হবে তখন যেন মনে রাখা হয়, এ আন্দোলন শুধুমাত্র জাতীয় নেতাদের আর ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনই নয়। এই ইতিহাস লিখতে হবে একেবারে আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমরা এমন ইতিহাস চাই যার মধ্যে মেয়েরা বা সাধারণ লোকেরা অতীত সমাজের তথ্যকণিকা মাত্র নয়, যার মধ্যে তারা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত।

রণজিৎ গুহ আরো বলেন, 'উচ্চবর্গের পক্ষপাতী ইতিহাসবিদ্যাকে সমালোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে।' সমালোচনাই নতুন পথ খোঁজার উপায়, তিনি খোঁজার কথা বলেছেন, পৌঁছানোর কথা নয়। কারণ পৌঁছানো যাবে তখনই যখন একেবারে নতুন কোনো আদিকল্পকে বসানো যাবে পুরনোটির জায়গায়। এ ধরনের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ শুধু নয়; অনেক এগোনো-পেছনো, হারিয়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া তার স্বভাবসিদ্ধ। ইতিহাসবিদ্যাকে ঢেলে সাজাতে হলে সাধারণ মানুষের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং সবকিছুর ওপর রাজনীতিতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা কী ছিল তা নির্ণয় করতে হবে।' সেই উদ্দেশ্যেই নতুন তথ্য খুঁজতে পুরনো তথ্যকে নতুন ভাবে পড়তে হবে, দরকার হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরি করে নিতে হবে। আর এই সবকিছুকে সম্ভব করার জন্যই তথ্যাশ্রিত অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির। এই ইচ্ছার প্রকাশটা যত সহজ, কাজটা ততখানি সহজ নয়।

এখানে জন-ইতিহাস চর্চার কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, যদিও এ পর্যায়ে আলোচনাটা কিছুটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। সেটা এড়াবার কোনো উপায় নেই। তবে ক্রমাগত মতবিনিময়ের মধ্য দিয়েই ভাবনার জটিলতা অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে।

জন-ইতিহাস কি উচ্চবর্গের আখ্যানে ধস নামাতে পারে? এক সাম্প্রতিক লেখায় দীপেশ চক্রবর্তী এই প্রশ্নটি তুলেছেন। ইতিহাস-চর্চায় যে মৌলিক শর্ত অর্থাৎ মানুষের কোনো বিশেষ কর্মকাণ্ডে একটা আখ্যানের সম্ভাবনা এবং সেই আখ্যানটি যদি জনজীবনের যুক্তিগ্রাহ্যতার অবস্থান থেকে তৈরি হয়, তখনই তা ইতিহাস হয়ে ওঠে। এই যুক্তিগ্রাহ্যতা আদর্শিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, দর্শনভিত্তিক হতে পারে। সেই কারণেই কোনো উন্মাদের কাহিনী ইতিহাস হয় না, অথবা নেহাতই ব্যক্তিগত কোনো বিবরণ ইতিহাস হয় না; ওগুলো ইতিহাসের উপাদান হতে পারে যদিও। উপযুক্ত দুটি শর্ত মেনে যে ইতিহাস লেখা হয় তা একসময় ইতিহাসের মূলধারায় মিশে যায় অথবা নিজেই একসময় প্রান্তিক অবস্থান থেকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে চলে আসতে পারে। গত দুই দশকে রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা নিম্নবর্গের ইতিহাস তেমনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চার কেন্দ্রে হাজির হয়েছে। ইতিহাস-চর্চা এ ধরনের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে চলে। জন-ইতিহাসের এই গ্রাহ্যতা জনজীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা সৃষ্ট। জন-ইতিহাসের প্রয়োজন ঐতিহাসিকদের গণতান্ত্রিক চেতনাপুষ্ট প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত। সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক চেতনা, যা কি না ইউরোপের উদার রাজনীতি ও মার্কসবাদ থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি, আমাদের প্রেরণা জোগায় সমাজের অবহেলিত মানুষের কাহিনীকে মূলধারার পাশে স্থান দিতে। জন-ইতিহাস চর্চা আসলে সামাজিক স্মৃতির গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে একটি নিরন্তর সংগ্রাম। এটাই জন-ইতিহাস চর্চার রাজনীতি। জন-ইতিহাস চর্চার কি কোনো লক্ষ্য আছে? বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার। তবে ঐতিহাসিক জে.এইচ. প্লাম্বের 'ক্রাইসিস ইন হিউম্যানিটিজ'-এর একটি উক্তি ইতিহাস-চর্চায় মানবিক লক্ষ্য নির্ধারণে ইঙ্গিত দেয়। তিনি বলেছেন, 'Historian's explanations of the past should lead to an explanation of it their time and generation, so that by explaining man's control over his future may be increased.

এই উদ্বেগ অনেক বড় মাপের। মানবজাতির ভবিষ্যতকে ঘিরে জন-ইতিহাস চর্চাও এই উদ্বেগের অংশীদার।

ইতিহাসচেতনা : অতীতের মোহ ও ভবিষ্যতের কল্পস্বর্গ

আবুল কাসেম ফজলুল হক

We may insist as often as we like that man's intellect is powerless in comparison with his instinctual life, and we may be right in this. Nevertheless, there is something peculiar about this weakness. The voice of the intellect is a soft one, but it does not rest till it has gained a hearing. Finally, after a countless succession of rebuffs, it succeeds. This is one of the few points on which one may be optimistic about the future of mankind, but it is itself a point of no small importance. And from it one can derive yet other hopes. The primacy of the intellect lies, it is true, in a distant, distant future, but probably not in an infinitely distant one.

- Sigmund Freud[1]

'বর্তমান' অতীত হয়ে যায়, এবং 'ভবিষ্যত' বর্তমান হয়ে আসে। এই চলমানতা বিরামহীন। সময়ের এই গতির মধ্যে আমাদের জীবন। মহাশূন্য নিরবধি, মহাকাল অনাদ্যন্ত। স্থান-কালের অতি সামান্য অংশ জুড়েই আমাদের জীবন।

জীবনে সুখ-দুঃখের কোনো মুহূর্তই স্থায়ী হয় না। এই অস্থায়িত্ব স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষকে ভাবিয়ে আসছে। কোনো-এক প্রাচীন ভারতীয় ঋষির উক্তিতে আছে– জীবন মৃত্যুর সমষ্টি। প্রাচীন কালের এক গ্রীক দার্শনিকের বক্তব্যের মধ্যেও হুবহু একই উক্তির সাক্ষাত মেলে। তাছাড়া বলা হয়েছে যে, এক নদীতে দুই বার সাঁতার কাটা যায় না। হয়তো অন্যত্রও মানুষ এমনটি ভেবেছে। জীবনের অস্থায়িত্ব চিরকাল মানুষকে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করেছে।

গতির মধ্যে মানুষ স্থিতি কামনা করেছে, এখনও করে। আবার স্থিতির মধ্যে কামনা করে গতি। স্থিতি ও গতির আকাঙ্ক্ষায় মানুষের ভাবনা-চিন্তার ও উদ্যম-উদ্যোগের অন্ত নেই। জীবনে দুঃখের মুহূর্তগুলোতে আমরা বিগত দিনের সুখের অভিজ্ঞতা স্মরণ করি। 'স্মরণ করি' বললে ঠিক বলা হয় না, ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, 'স্মৃতিতে ভেসে ওঠে'। সুখের স্মৃতিকে আমরা ধরে রাখতে চাই। দুঃখের অভিজ্ঞতা সাধারণত সুখের মুহূর্তে তেমনভাবে স্মরণ হয় না, আর দুঃখের স্মৃতিকে আমরা ধরেও রাখতে চাই না।

অবশ্য দুঃখের পাখিও কারও কারও মাথায় বাসা বাঁধে : কেবল সাধারণ মানুষদের মধ্যে নয়, অসাধারণদের মধ্যেও। দুঃখবিলাসী কেউ কেউ ছিলেন, আছেন, হয়তো থাকবেনও। শক্তিমান লোকদের জীবনেও দুর্বল মুহূর্ত আসে। যিনি মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামে নিবেদিত, মানুষকে যিনি স্মরণ করিয়ে দেন তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার কথা, উচ্চারণ করেন মহিমার কথা– এই বলে : 'বল বীর বল উন্নত মম শির', তাঁকেও ভাবতে দেখি : 'নিশ্চল নিশ্চুপ, আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধাবধুর ধূপ।' ফরাসি বিপ্লব যাঁর চেতনাকে বিরাটভাবে উদ্দীপ্ত করে সেই শেলির উক্তি:

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

বায়রনের উক্তিও অবিদিত নয়:

Sorrow is knowledge : they who know the most
Must mourn the deepest o'er the fatal truth,
The Tree of knowledge is not that of life.

কিন্তু সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়।

জীবনে কেউই দুঃখ কামনা করে না অথচ নাটকে দুঃখের দৃশ্য দেখতে সকলেই উৎসুক হয়। এর কারণ কী?– এই প্রশ্নের উত্তরে এ্যারিস্টটল যে কথা বলেছিলেন, তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে– cathersis of pent up passions. দুঃখের প্রতি মানুষের কৌতূহলের কারণ এর চেয়ে ভালোভাবে পরে আর কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন?

সংসার দুঃখময়– এই উপলব্ধি, মনে হয়, সাংখ্যদর্শনের এবং গৌতম বুদ্ধেরও চিন্তাধারার ভিত্তি। প্রাচীন হিন্দুধর্মের মূলেও সাংখ্যদর্শন-প্রবলতা ক্রিয়াশীল ছিল। শতাধিক বছর আগে 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন–'যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন।' [২] আমাদের ভুললে চলবে না যে, কপিলের উক্তিতে– সাংখ্যবচনে, গৌতম বুদ্ধের চিন্তাধারায়– জাতকে মানবমনীষার যে পরিচয় পাই, তাতে দেখি– 'মনুষ্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন'। হয়তো দুঃখ-বিলাসও দুঃখ-মোচনেরই তাড়না থেকে

জাত। হয়তো নজরুল ও শেলির উক্তি সম্পর্কেও এ কথা সত্য। শোপেনহাওয়ার, বায়রন, বোদলের, ক্রুচের জীবনদর্শন সম্পর্কেও সত্য হতে পারে এ কথা।

সে যাই হোক, দুঃখবাদ ভিন্ন বিবেচনার বিষয়। আমরা সুখবাদী, যৌক্তিক কিংবা নৈতিক সুখবাদ। 'নিজেকে দুঃখী ভেবে গর্ব বোধ করার মধ্যে কোনো প্রকার উন্নত ধরনের যৌক্তিকতা আছে বলে' আমরা মনে করি না। সাংখ্যদর্শনে এবং গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শে সুখবাদের উপাদানগুলোই আমাদের মনকে কৌতূহলী করে– যদিও আমরা ভালোভাবেই জানি যে, পাশ্চাত্যে নির্বাণতত্ত্ব দুঃখবাদীদেরই প্রিয়। অবশ্য সুখবাদের উপাদান নির্বাণতত্ত্বে আদৌ আছে কি-না, কেউ ইচ্ছা করলে সে প্রশ্নও তুলতে পারেন।

মহাকাল অনাদ্যন্ত, কিন্তু জীবন সান্ত; মহাশূন্য নিরবধি, কিন্তু জীবনের বিচরণ স্বল্প পরিসরে।

জীবনের যে দিনগুলো অতীতে বিলীন হয়, সেসব দিনকে কোনো অবস্থাতেই একবারের জন্যও ফিরে পাওয়া যায় না। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য অতিক্রম করে ক্রমাগত আমরা মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে থাকি। আর যৌবনের পরে ক্রমেই আমাদের চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি কমতে থাকে। এ অবস্থায় জীবনের বিগত দিনগুলোর কথা ভেবে আমরা আনন্দ পাই। এই আনন্দ অবশ্য বুদ্ধিগত নয়, অনুভূতিগত– স্বতঃস্ফূর্ত। যাঁদের জীবনে ব্যর্থতা আছে, হতাশার গ্লানি আছে, জানি না কেন, তাঁরা নিজ নিজ জীবনের অতীতে বিচরণ করে সান্ত্বনা খোঁজেন– শান্তি পেতে চান।

জীবন যতই দুঃখময় হোক, সুখের সম্ভাবনাও অনন্ত। মানবজাতির জীবনের অন্তহীন সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার তুলনায় ব্যক্তিজীবনের দুঃখ নগণ্যই। এই অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে জীবন নিতান্ত স্বল্পকাল-স্থায়ী বলেও মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়, কল্পতরু কল্পনা করে। হয়তো স্বর্গের কল্পনাও মানুষ করেছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাবশেই। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন যে, যে ভূখণ্ডে যে ধর্মের উদ্ভব, সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থার ও সেখানকার মানুষের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থের স্বর্গের বর্ণনা সম্পূর্ণ মিলে যায়। দৃষ্টান্ত, কোরানের বেহেশত আরব-মরুর প্রাকৃতিক অবস্থার ও সেখানকার মানুষের জীবনসংগ্রামের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যত নিবিড়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, অন্য কোনো-স্থানের সঙ্গে ততটা নয়। মানুষের আদিমতম, প্রবলতম, সুন্দরতম, মহত্তম, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে ভাষা পেয়েছে :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

এই অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই মানুষের অনন্ত সৃষ্টিশক্তির রহস্য নিহিত। মানুষ কাজ করে প্রবৃত্তির ও আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়। বেঁচে থাকার জন্য– আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য– মানুষের আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে অনুভব ও লালন করে আসছে। কিন্তু রক্তমাংসের দেহ নিয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায় না। আর মানুষের কল্পনা ছাড়া অন্য কোথাও দেহনিরপেক্ষ আত্মার কিংবা বস্তুনিরপেক্ষ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না। অনাদ্যন্ত মহাকালে নিরবধি মহাশূন্যে জীবন নশ্বর। তবু মানুষের রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা, অন্যায়-অবিচার, কুৎসিত ও মৃত্যুকে পরাজিত করে অমরত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা অপরাজেয়– ধ্বংসাতীত– অবিনশ্বর।

'দেহনিরপেক্ষ আত্মা'র ধারণা, সেই সঙ্গে 'আত্মার অমরত্বে'র ধারণা, মানুষের সমাজে কোনো-না-কোনোভাবে আদিকাল থেকেই চলে আসছে বটে কিন্তু প্রমাণের অভাবে তার ওপর আস্থা কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'আত্মার অমরত্বে'র ধারণা, সব যুগে সব দেশেই, শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে অক্ষমের সান্ত্বনার ব্যাপারে। নিজের সন্তানদের এবং ভবিষ্যত-বংশধরদের মধ্যদিয়ে বেঁচে থাকার কল্পনাও মানুষ করেছে, কিন্তু তাতেও তৃপ্তির কারণ ঘটেনি। সন্তান-সন্ততির মধ্যদিয়ে কি নিজে বেঁচে থাকা যায়? রবীন্দ্রনাথের নিজেকে চিরজীবী ভাববার চেষ্টা সুবিদিত, তবু তা উল্লেখ করা যায়; তাঁর একটি গানের কথা :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ...
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায় ...

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে গো দিন যেমন আজও দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সেদিন উঠবে ভরি,
চরবে গোরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে ...
তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি?
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।

কিন্তু পেরেছেন কি তিনি নিশ্চিত হতে যে, 'এই আমি' 'চিরদিনের'? গানের ধ্বনির মধ্যদিয়ে যে সুর ভেসে আসে তা বেদনার, দুঃখের, অপ্রাপ্তির, আশাভঙ্গের, ব্যর্থতার, বুকভরা কান্নার– শব্দার্থের প্রাচীর ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে বুকভাঙা হতাশার মর্মার্থ। যাঁরা নিতান্ত শব্দার্থের সিঁড়ি বেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের-কবিতার মর্মোদ্ধার করেন, তাঁদের রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও বলতে আমরা বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বোঝেন না, বুঝবার চেষ্টাও করেন না– তঁদের ভক্তি অন্ধ– মন পূর্বধারণায় আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁদের উপলব্ধির কথা নাই-বা তুললাম।

অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা মানবজাতির সবচেয়ে মৌলিক, প্রবলতম আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি। স্বাভাবিক, সুস্থ, প্রতিটি মানুষই হয়তো ভেবে থাকে– মানুষ মরণশীল হলেও কোনো -না-কোনোভাবে 'আমি' বোধ হয় মৃত্যুকে এড়িয়ে বেঁচে থাকব। সুস্থ সমাজে শক্তিমান, ক্ষমতাবান, সৃষ্টিশীল, প্রবল মানুষদের মধ্যে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা-যে অত্যন্ত প্রবল, এর সমর্থনে মনোবিজ্ঞান অনেক প্রমাণ হাজির করে। অসুস্থ সমাজের অসুস্থ মানুষের কথা অবশ্য ভিন্ন। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, সহজেই নিজের মৃত্যু কামনা করে বসে। এই মৃত্যুকামনা কি আন্তরিক? যারা আত্মহত্যা করে, জীবনের প্রতি তাদের কি কোনো ভালোবাসা থাকে না? অবশ্য অসুস্থ সমাজেও সুস্থ মানুষ থাকেন, সুস্থ চিন্তা-চেতনাও থাকে। অসুস্থ সমাজ আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। সুস্থ সমাজ অসুস্থ হতে পারে। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিকল্পে নিদেনপক্ষে মানুষ মানুষের স্মৃতিতে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়। যেহেতু শারীরিকভাবে চিরজীবী হওয়ার উপায় আজও বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে পারেননি, তাই মানবজাতির স্মৃতিতে অনন্তকাল বেঁচে থাকার চেষ্টার মধ্যদিয়ে আজও মানুষ অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খোঁজে। মানুষ চায় তার সৃষ্টিকে, তার কর্মকে, মানুষের জন্য তার ভালোবাসার উপঢৌকনকে সকলে সযত্নে গ্রহণ করুক– রক্ষা করুক, অবলম্বন করুক এবং সেই সঙ্গে অনন্তকাল তাকে স্মরণ রাখুক। হয়তো মানুষের স্মৃতিতে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাবশেই মানুষ মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। মরণোত্তর খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায়, মানবজাতির স্মৃতিতে অনন্তকাল বেঁচে থাকার আশায় ভাবুক ও কর্মীরা, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-সমাজসংগঠকেরা জীবনকালের সুখ ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

পরিবেশের পীড়নে অনেক সময়েই মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। তবু পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মানুষের চেতনার মধ্যে একটা-কিছু আছে, যার ফলে সে এমন কিছু করতে চায়, যাতে যুগ যুগ ধরে কীর্তিত হতে পারে তার নাম। মানুষ তার ক্ষণকালের জীবনকে ভাসাতে চায় অনন্তকালের ভেলায়– আশ্রয় নিতে চায় চিরকালের 'সোনার তরী'-তে। সকলেই যে সমভাবে চায়, তা নয়– বিপুল অধিকাংশেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা অকালে মরে যায়, বিশেষভাবে চায় ক্ষমতাবানেরা, শক্তিমানেরা, প্রতিভাবানেরা, সৃষ্টিশীলেরা।

মানুষ প্রেমময় এবং প্রেমের ভিখারী। মানুষ নিজের জন্য স্বাধীনতা চায় এবং অন্যকে নিজের অধীনে রাখতে চায়। মানুষ সমাজে বাস করেও নিজের জন্য স্বাতন্ত্র্য কামনা করে। মানুষ পরিবর্তনকামী এবং রক্ষণশীল।

ক্ষমতালিপ্সা ও খ্যাতিলিপ্সা দ্বারা যাঁরা চালিত, তাঁরা উপস্থিত কালে খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশীল হয়েই পরিতৃপ্ত থাকেন, উত্তরকালের কথা অল্পই চিন্তা করেন। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা খ্যাতিলিপ্সা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। অমরত্ব-আকাঙ্ক্ষীরা ক্ষমতা ও খ্যাতির সুযোগকে ত্যাগও করতে পারেন। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রবলভাবে তাড়িত লোকেরাই ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে– মরণোত্তর কালের জন্য জীবনকালকে ত্যাগ করতে এবং প্রবলতম প্রতিকূলতার মধ্যেও অপরাজেয় মনোবল নিয়ে কাজ করে যেতে পারেন। মানবজাতির স্মৃতিতে যাঁরা অমর আছেন, তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী এ-কথার প্রমাণ দেয়।

অতীতচারী প্রবণতার কারণে, খ্যাতিলিপ্সা ও ক্ষমতালিপ্সাকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনে প্রাচীনকাল থেকেই ক্ষমতাবানেরা, শক্তিমানেরা, প্রতিভাবানেরা, সৃষ্টিশীলেরা নিজেদের কীর্তিগাথা রচনার, সংরক্ষণের ও প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। নিজের ব্যক্তিগত ও বংশগত প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য পিতৃপুরুষের মহিমাকীর্তনের আয়োজন করেছে। 'আভিজাত্যবোধে'র ধারণাও হয়তো এমনি ধরনের প্রয়াসের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছিল; এবং মধ্যযুগে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক ব্যবস্থার রূপই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল 'আভিজাত্যবাদী'। ভারতীয় উপমহাদেশে 'জাতিভেদ প্রথা'র ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদ জনসাধারণের ওপর নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের সুযোগ

করে দিয়েছিল অভিজাতদের– ব্রাহ্মণদের। 'রাজতন্ত্র' ও 'অভিজাততন্ত্র' দ্বারা কি মানবজাতির কোনো মঙ্গল হয়েছে? ধর্ম, দর্শন, কাব্য– এমনকি বিজ্ঞান– ইত্যাদি সৃষ্টির পেছনেও হয়তো পূর্বোক্ত প্রবণতা ও লিপ্সা, কোনো-না-কোনোভাবে, কাজ করেছে। রাজা-বাদশাদের, ধনপতি-সমাজপতিদের, কায়েমি- স্বার্থবাদীদের, আভিজাত্যবাদীদের, জ্ঞানানুরাগী ও জীবনরসিকদের এই ধরনের প্রয়াসই হয়তো, আজ আমরা যাকে ইতিহাস বলি তার পূর্বসূত্র।

পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দুঃসময়েও মানুষ পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা স্মরণ করে– স্মরণ ও প্রচার করে– তাতে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু অতীতকে এভাবে স্মরণ করা দ্বারা, অতীতের বা পূর্বপুরুষের গৌরবে গর্বিত হয়ে, অতীতকে মহিমান্বিত করে– ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, জাতির– অকল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ কি হয়? মানুষকে বাঁচতে হয় নিজের উপস্থিতকালের শক্তি, সম্পদ, মিত্র ও সম্ভাবনা নিয়ে। বর্তমান বাস্তবতার অস্বীকৃতি আছে যে অতীতচারিতায়, তাকেই আমরা বলি 'অতীতের মোহ'। অতীতচারিতা মানুষকে নিদ্রার দিকে ঠেলে দেয়– মোহনিদ্রা, dogmatic slumber. ক্রমাগত অতীতচারিতার ফলে মানুষের মনের জাগ্রত সত্তা কেবল ঘুমিয়ে পড়ে না, মরে যায়। অতীতচারিতা মানুষকে করে তোলে গোঁড়া, একরোখা, একচোখা– তার ফলে মানুষের মনের দরজা-জানালা হয়ে যায় বন্ধ। 'অতীতের মোহ' অবক্ষয়কর– বিধ্বংসী। অতীতচারিতার আনন্দ মানুষকে শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, নিষ্কর্মা করে দেয়।

যাঁরা নতুনের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, যাঁরা বিপ্লবী (দার্শনিক অর্থে) ও সংস্কারক, সমাজমানসে বিরাজিত 'অতীতের মোহ' চিরকাল তাঁদের মহৎ কর্মধারায় বাধা সৃষ্টি করেছে। অতীতের গর্ভ থেকে বর্তমানকে মুক্ত করার সমস্যার মুখোমুখী তাঁদেরকে হতে হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, আবুল হুসেন– প্রমুখ মনীষীর কর্মধারা স্মরণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসা, যিশু, মুহম্মদ, মার্কস প্রমুখ মহামানবের কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করতে গেলেও আমরা বুঝতে পারি সমাজমনকে 'অতীতের মোহ' থেকে মুক্ত করার জন্য কত মূল্য তাঁদেরকে দিতে হয়েছে।

অনেকে বলতে পারেন যে, 'অতীতের মোহ' নয়, এসব ক্ষেত্রে বিপত্তির কারণ কায়েমি স্বার্থ। প্রশ্ন হল কায়েমি-স্বার্থবাদীর সংখ্যা কয় জন? কায়েমি-স্বার্থবাদীরা যে সংখ্যায় নগণ্য হয়েও শক্তিমান থাকতে পারে তার নানা কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ, সমাজমনের 'অতীতের মোহ'কে তারা কায়েমি স্বার্থের প্রয়োজনে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে– নানা উপায়ে তারা তাদের সহযোগী ও অনুসারী তৈরি করতে পারে। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করতে গেলেও বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায়, 'অতীতের মোহ' থেকে 'নিজেদের' ও 'অন্যদের' মনকে মুক্ত করার জন্য কী কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম তাঁদেরকে করতে হয়েছে। একদিক থেকে দেখলে বলা যায়, যুগ-যুগান্তর ধরে মানবজাতির প্রগতি আসলে একটির পর একটি 'অতীতের মোহ' থেকে মুক্ত হয়ে উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ার ধারাবাহিক প্রয়াস মাত্র।

মুসলমান বাঙালি সমাজে প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র অন্যতম প্রবক্তা ও প্রচারক, চিন্তানায়ক আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) এ ব্যাপারটি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। 'অতীতের মোহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর পরিচ্ছন্ন প্রকাশ রয়েছে। সে প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

"কবি তাঁর কাব্যে অমর হতে চান; পয়গাম্বর তাঁর প্রচারিত ধর্মে চিরজীবী চিরপূজ্য হয়ে থাকতে ইচ্ছা করেন; আইনকর্তা তাঁর আইন চিরকালের জন্য প্রচলিত রাখতে চান; চিত্রকর তাঁর চিত্রের রঙ-ছায়া অটুট করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণপণ চেষ্টার ফল একত্র হয়ে সভ্যতার সৃষ্টি করে। সে সভ্যতা তখন গোটা সমাজের গৌরবের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত জীবনের সৃষ্টির সমষ্টি সমাজজীবনের সভ্যতায় পরিণত হয়। ব্যক্তি যখন আপনার সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ, সমাজ তখন গোটা সভ্যতার গর্বে গর্বিত।"

"বর্তমানের দুঃখ-দৈন্য, মান-অপমান, সুখ আনন্দ নিঙড়ে মানুষ তার সৃষ্টি খাড়া করে তোলে। সেই সৃষ্টির প্রতি তার দরদ ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তারপর তার জীবনের সন্ধ্যায় বা তার কিঞ্চিৎ পূর্বে এমন একটা অবস্থা তার হয়, যখন সে তার নবসৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না-দিয়ে পুরাতন সৃষ্টিতে অক্ষয় প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। সেই চিন্তার ফলে ঐ সৃষ্টির প্রতি তার এমন একটা মোহ জন্মে যায় যে, সে সেই মোহ মৃত্যুর সময় তার বংশধর বা পরবর্তীগণের অন্তরে সংক্রমিত করে যায়। এইরূপ সংক্রমিক হওয়ার ফলে বংশধরের মৌলিক সৃষ্টির ক্ষমতা অনেকখানি শিথিল বা লুপ্ত হয়ে যায়।"[৩] আবুল হুসেন উল্লেখ করেছেন যে, নিজের সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার ব্যক্তিগত মোহ 'অতীতের মোহ' রূপে এসে পরবর্তী বংশধরদের অনেকখানি বিড়ম্বিত করে। তখন নবপ্রভাতের নবপ্রয়োজনের নবসৃষ্টি তার পক্ষে অনেকখানি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ... পূর্ববর্তী সৃষ্টির প্রভাবে পরবর্তী Potential স্রষ্টা মাথা নত করে দাঁড়ায়। তার সাহস অনেক কমে যায়। অতীতের সৃষ্টি অতীতের প্রয়োজনে হয়েছিল, আর আজ বর্তমানের প্রয়োজনে তাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে– একথা সে ধরতে পারে না। ... 'অতীতের মোহ'-গ্রস্ত মানুষ তার বর্তমান সৃষ্টি ফেলে অতীতের সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য দুরবিন দিয়ে দেখে, আর বর্তমানের ত্রুটি, আলস্য, অপচেষ্টার অপরাধকে ঢেকে রাখে। তখন অতীতের গৌরব-কাহিনী, অতীতের সত্যযুগ, অতীতের সুবর্ণ সভ্যতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে

আত্মবিশ্বাস ও আপনার সৃষ্টির ক্ষমতা হতে ক্রমশ সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। 'অতীতের মোহ' এমনই বিশাল-বিপুল শক্তি যে, মানুষের সৃষ্টির প্রবৃত্তিও তার কাছে মাথা নত করে।"[৪]

ধর্মান্ধ ও মতান্ধ লোকদের দিকে তাকালেই আবুল হুসেনের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

আমাদের দেশের 'মতান্ধ মার্কসবাদী'দের চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না, 'অতীতের মোহ' কী ভয়াবহ শক্তিতে তাঁদেরকে মুক্তির পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যে-ধারায় অনুসন্ধান চালালে এবং কাজ করলে মুক্তির পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তাঁরা চলেন ঠিক তার বিপরীত পথে। এর একটা কারণ, তাঁদের ভিতরে ইতিহাসচেতনার বিকাশ ঘটেনি– তাঁদের মন-মানসিকতা 'অতীতের মোহে' আচ্ছন্ন। এদেশে যাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন তাঁদের মনও আচ্ছন্ন, অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, 'ক্ষমতার মোহে' আচ্ছন্ন। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান 'শোনা কথা ভিত্তিক'– পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনে যদি কখনও কিছু পড়ার দরকার হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর ভিত্তিশীল। ফজলুল হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দি, শেখ মুজিব– এঁরা কেউ কি কখনও গণতান্ত্রিক আদর্শ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং স্বদেশোপযোগী সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বুদ্ধিগতভাবে, যৌক্তিকভাবে, গভীরভাবে, ব্যাপকভাবে, সূক্ষ্মভাবে কিছু চিন্তা করেছেন? মানবস্বভাবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পর্ক বুঝতে চেয়েছেন? সমাজের স্তরে স্তরে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অঙ্গে অঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রমাণ কোথায়? যাঁরা 'বুদ্ধিজীবী' বলে সমাজে পরিচিতি অর্জন করেন এবং নিজেদের অবস্থানে থেকে যথাসম্ভব রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিচয় দেন, পত্রিকায় ঘন ঘন বিবৃতি দেন, সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী নানা রকম কমিটি গঠন করেন, কখনও কখনও জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন, মিছিলে যান– কেউ কেউ মন্ত্রিত্বও অর্জন করেন, এক্ষেত্রে তাঁদেরই-বা দান কী? আমাদের তো মনে হয়, এদেশে যাঁরা 'গণতন্ত্রী' বলে আত্মপরিচয় দেন, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা 'জড়ধর্মে'র অনুসারী। জড়ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হল নিষ্ক্রিয়তা, নিশ্চেষ্টতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, গতানুগতিক ও অভ্যাসের দাসত্ব, অমার্জিত স্বভাবধর্মের– অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাসত্ব।

ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু উজ্জ্বল রচনার সন্ধান আমাদের জানা আছে, এবং অনুসন্ধান করলে হয়তো আরও কিছু উৎকৃষ্ট রচনার সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু সেগুলোর প্রচার কোথায়? কোন্ রাজনৈতিক দল, অথবা কোন্ বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী সেগুলো খুঁজে দেখতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচার করতে আগ্রহী? যাঁরা ধর্মপন্থী– ইসলামের কথা বলেন, ইসলাম 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন, বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান, তাঁদেরও মন নিঃসন্দেহে 'অতীতের মোহে' দারুণভাবে আচ্ছন্ন। তবে এই ধারায়, ধার্মিক নন, ধর্মব্যবসায়ী মাত্র– এমন লোক, মনে হয়, অনেক আছেন। এই ধারায়, কর্মীদের মধ্যে জ্ঞানগত প্রস্তুতিকে অবহেলা করে বাহুবল– তথা অস্ত্রবলের দ্বারা সমস্যা সমাধানের প্রবণতা এখন ক্রমবর্ধমান। এদেশের সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, ধর্মপন্থী কায়েমি শক্তিসমূহের প্রচলিত গতানুগতিক চিন্তাধারা ও কর্মধারা মানুষের কোনো মঙ্গল করতে পারবে কি? চিন্তার জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন কি অভিপ্রেত নয়? আর চিন্তার জগতে শুভকর পরিবর্তন এলে কর্মের জগতেও শুভকর পরিবর্তন আসতে বাধ্য। ইতিহাসচেতনার প্রকৃতি 'অতীতের মোহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতিহাসচেতনা অতীতকে ভালোবাসতে শেখায় না। ইতিহাসচেতনা মানুষকে 'অতীতের মোহ' থেকে মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে– অন্ধকার বর্তমানকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করতে– তাড়না দেয়। ইতিহাসচেতনা মানুষকে তাড়িত করে নতুন সৃষ্টির প্রয়াসে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণে, বর্তমান সমস্যাবলীর শিকড় খুঁজে বের করে সেগুলোর মূলোৎপাটনে। শরৎচন্দ্রের নিম্নোক্ত বক্তব্যে সহজ-সরল-পাণ্ডিত্যমুক্ত ইতিহাসচেতনার সুন্দর প্রকাশ আছে :

"যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে পাথর খুঁড়ে বার করছেন আর বলছেন– এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল, আমি তাঁদের কথায় খুশী হই না। আমার বুক তাতে ফুলে ওঠে না। আমি বলি, আমাদের কিছুই ছিল না। আমাদের যা দরকার, আমরা তা গড়ে নেব। মানুষ এখন এগিয়ে যাচ্ছে, নিজের জোরে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। দু হাজার বৎসর আগে আমাদের কি ছিল, পাথর খুঁড়ে বার করে তা শুনিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। নিজের গৌরব কিসে হয়, তাই ভালো করে গড়ে তোল। ... আমাদের সবই ছিল যদি, সকলই জেনেছিলুম যদি, তবে আমাদের এ দশা হল কেন? যাদের সব ছিল, একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরছি কেন?... তবে হ্যাঁ, আমাদের এ দশা কেন, যদি কেউ বার করতে পারেন, দেশের মহাউপকার হবে।"[৫]

প্লেটোর রিপাবলিক-এ, স্পিনোজার এথিক্স্-এ, রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট্-এ, টমাস ম্যুরের ইউটোপিয়া-য়, ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বে, মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীতে ইতিহাসচেতনা অত্যন্ত প্রবলভাবে কাজ করেছে। এঁদের সকলেরই দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, আবুল হোসেন– এঁদের চিন্তাধারায়ও প্রবল ইতিহাসচেতনার উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু, যাঁরা বাইবেলের, কোরানের, ডারউইনের, মার্কসের অনুসারী হয়েছেন, তাঁদের বিপুল অধিকাংশের মধ্যেই 'অতীতের মোহে'র বিস্ময়কর উপস্থিতি এবং ইতিহাসচেতনায় বেদনাদায়ক অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবজাতির মধ্যে ইতিহাসচেতনা যখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয় তখন অধঃপতিত সমাজ, অনুন্নত রাষ্ট্র, বিপর্যস্ত মনুষ্যত্ব উন্নতির সোপানে দাঁড়ায়, প্রগতির ও উৎকর্ষের সাধনা করে। সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবজাতির মধ্যে 'অতীতের মোহ' যখন প্রবল হয়, তখন অবক্ষয়ের কাল চলে, উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়, উৎকর্ষের আয়োজন অগ্রগতির পথ পায় না। তবে মানবীয় ঘটনাবলীর মূলে মানুষ; মানুষেরই সচেতন প্রয়াসের ফলে অবক্ষয়ের কাল অতিক্রান্ত হয়– জাগরণের কাল দেখা দেয়; আবার মানুষেরই আত্মবিস্মৃতির ও ঔদাসীন্যের ফলে জাগরণের অবসান ঘটে– অবক্ষয় দেখা দেয়। মানুষেরই কর্মফলে 'স্বর্ণযুগ' ও 'অন্ধকার যুগ' সৃষ্টি হয়।

'অতীতের মোহ' যে কী ভয়াবহ দুর্দশার কারণ ঘটিয়ে থাকে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই রয়েছে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে নিকট অতীতে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের কালে, অর্ধ শতাব্দীব্যাপী 'হিন্দু' মুসলমানের রক্ত এবং 'মুসলমান' হিন্দুর রক্তে বাঙলার–ভারতের মাটিকে রঞ্জিত করেছে। 'অতীতের মোহ' সেদিন বাঙালিকে আত্মঘাতী করেছিল– ভারতবাসীকে আত্মঘাতী উন্মাদনায় মাতিয়েছিল। তবে সেই উন্মাদনার মধ্যেও ভিন্ন চরিত্রের মানুষও ছিলেন, উন্নততর ইতিহাসচেতনার উপস্থিতিও ছিল– যদিও সেই মানুষদেরকে, সেই উন্নত চেতনাকে বৃহত্তর সমাজ সেদিন মূল্য দেয়নি। 'অতীতের মোহ' (*সাহিত্যিক*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৪) প্রবন্ধে আবুল হুসেন লিখেছিলেন :

"আজ সমস্ত ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষী, হিংসা-কোলাহল, সংঘর্ষ-বিগ্রহ দেখে এই মনে হয়, 'আহ্! উভয় সম্প্রদায় কি নিদারুণ অতীতের মোহে বিড়ম্বিত।' হিন্দু দু হাজার বছর পূর্বের আর্যশক্তির স্বপ্ন দেখছে, আর মুসলমান আরবী সাম্রাজ্যের কথা ভেবে ক্ষোভে ক্ষুব্ধ বলছে, 'আমরা মুসলমান, ভারতে আমরা মুসলমান হয়েই থাকব। হিন্দু আমাদের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠা, বিলুপ্ত করতে যদি চায় তবে আমরা হিন্দুর সহিত সন্ধি করতে রাজী নই।' এই উভয় মনোভাবের উৎস একই, মুসলমান চায়– তাদের প্রাচীন প্রাধান্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না হয়। ফলে আজ হিন্দু-মুসলমান এই ভারতের বুকের ওপর একই উপকরণে গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়েও উভয়েই অতীতের গর্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত– বর্তমানের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি যেন ঘুলিয়ে গেছে। সমস্ত ফেলে এই অতীতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে দ্বন্দ্ব-হিংসায় সমস্ত শক্তি, অর্থ তারা অকাতরে ধ্বংস করে চলছে।[৬]

সেদিন স্বদেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আবুল হুসেন আরও লিখেছেন :

আজকাল হিন্দু নেতৃবর্গের অনেকেই মুসলমানকে তিরস্কার করেন এই বলে যে, 'তারা ভারতের দিকে না তাকিয়ে তাকায় ইরান, তুরান, তুরস্কের দিকে; সেইজন্য হিন্দুর সহিত মুসলমানের মিলন হচ্ছে না।' কিন্তু আমার যতদূর জানাশোনা আছে, তাতে মনে হয়, মুসলমানের এই মনোভাবের জন্মদাতা হিন্দুর ঐ আর্যশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ... হিন্দুর এই মনোভাবের ফলে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মুসলমান স্বভাবতঃই প্রমাদ গণে, তার আপনার বন্ধুর খোঁজ করতে চায়। তাই সে বৃথা ইরান, তুরান, আফগানিস্তানের দিকে তাকায়। কিন্তু এই 'তাকানো'র পূর্বে হিন্দুর অহঙ্কার, আস্ফালন ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিক রচিত মুসলমানের ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধা ভারতে আকাশ-বাতাস সব গরম করে তুলেছিল। সে ইতিহাস চেপে রেখে আজ মুসলমানকে চধহ-ওংষধস -এর অজুহাতে গালি ও তিরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ, হিন্দুসমাজ অতীতের মোহে বর্তমান ভারতের দুঃখ-সমস্যার প্রতি পরিষ্কার দৃষ্টি দিতে সক্ষম হচ্ছে না। মুসলমানও এজন্য দায়ী। মুসলমানকে আপনার তপস্যা ও সাধনার দ্বারা বলতে হবে, 'হিন্দু! তুমি অতীতের মোহে যতই পাক খাবে, ততই তোমার সর্বনাশ হবে। তুমি পুরাতন চশমাটি খুলে ফেলে ভারতের বর্তমান মানুষকে দেখ– তার দুঃখদৈন্য দেখ– তার জন্য নবসৃষ্টিতে লাগো। মুসলমানের মনে গোপন কোণে যে বেদনা জমেছে, তোমার কথা, ব্যবহার, ভাষার ভিতর দিয়ে তা বুঝবার চেষ্টা করতে তুমি পরাঙমুখ হয়ো না। তবেই মঙ্গলপথ উন্মুক্ত হবে।'[৭]

অনাচ্ছন্ন মন নিয়ে, ইতিহাসচেতনায় তাড়িত হয়ে, স্বদেশের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ছবি, চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ভেবে নিয়ে, আবুল হুসেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেদিন লিখেছিলেন:

"আজ আর শুধু 'আর্য'-অধ্যুষিত ভারতের স্বপ্ন দেখলে চলবে না! আজ চোখ খুলে দেখতে হবে 'মানুষ'-অধ্যুষিত ভারতবর্ষ। সে আর্য আর এই মানুষ– দুই-এর পার্থক্য বুঝতে হবে। সে আর্যের সমস্যা আর এই মানুষের সমস্যা এক নয়। সে আর্য-সংস্কার মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আজ অহিতকর হয়ে পড়েছে– সে কথা তুমি অন্তর দিয়ে স্বীকার করবে কি? পক্ষান্তরে প্রাণের রসে মুসলমান বা অন্যান্য অহিন্দু মানুষকে অভিষিক্ত করে হিন্দুও বলবে, 'মুসলমান! তুমি যতই আরব-মরুর খোরমা বা খেজুরের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে, ততই তোমার বৃথা সময় নষ্ট হবে। ইরান, তুরান, তুর্কি– সবাই তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য হাসবে...। তুমি এই দেশের রসে পুষ্ট হয়ে এই দেশের প্রকৃতি লাভ করছে– তা অস্বীকার করে তুমি কেমন করে মঙ্গল লাভ করতে পারবে?"

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুকে তার প্রাচীনের মোহ ও সংস্কার ত্যাগ করতে হবে এবং মুসলমানকে তার সংস্কার ও ধারণার মোহ ত্যাগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে দৃঢ়রূপে ধারণা করতে হবে, 'হাঁ, আমরা মানুষ– আমাদের কল্যাণ এক, আমাদের জীবনের সমস্যা এক, আর সেজন্য আমাদের তপস্যা ও সাধনা এক পথে চলবে। তুল্যরূপে আমরা এই দেশের অধিকারী। প্রাচীন ইতিহাস আমাদের গর্ব ও আস্ফালনের প্রশ্রয় না দিয়ে সে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত

আমাদের বর্তমানের সৃষ্টির জন্য অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করুক, কিন্তু যেন স্তম্ভিত-বিড়ম্বিত না করে। সে সৃষ্টির চেয়ে আরও বৃহত্তর সৃষ্টির ক্ষমতা আমাদের হয়েছে, এ বিশ্বাস যেন আমাদের কর্মে উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ইতিহাস আমাদের জন্য, আমরা ইতিহাসের জন্য নই। আমরা আরও যেন প্রাচীন হিন্দুর সৃষ্টি ও প্রাচীন মুসলমানদের সৃষ্টিকে সমানভাবে মানুষের সৃষ্টি মনে করি ও অন্তরের সহিত তাতে গৌরব অনুভব করি। এ যেন আমাদের মনে তিল-বিন্দু স্থান না পায় যে, ওটি হিন্দুর আর এটি মুসলমানের। আমরা যেন মনে করি– 'ওসব মানুষের।' ... নব-ভারতবাসীর এই হবে মনোভাব। 'প্রতি মানুষ আমার ভাই, অতীতের প্রত্যেক সৃষ্টিই আমার প্রাণের বস্তু'– নবভারতবাসীর বাণী হোক।'[৮]

আবুল হুসেন যে–ধারায় চিন্তা করেছিলেন, সেদিন সেই ধারায় আরও কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সেকালে এদেশে ইতিহাসচেতনা জয়ী হয়নি, জয়ী হয়েছিল অতীতের মোহ, তারই ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তারপর পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাঙলা বিচ্ছিন্ন হল– স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, এত ঘটনার পর আজও এদেশে মানুষের মন দুঃখজনকভাবে অতীতের মোহে আচ্ছন্ন। দুর্বল মানুষদের এই মোহাচ্ছন্নতার সুযোগ গ্রহণ করছে নয়া–উপনিবেশবাদীরা, ধনপতি-সমাজপতিরা, গতানুগতিক ধারার রাজনীতিবিদেরা ও প্রতিপত্তি-অভিলাষী বুদ্ধিজীবীরা; বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের সুফল এদেশে সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারছে না। ১৯৪৭ সনের পর জনসভায় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায় শোনা যেত, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ভারতবর্ষের এক কোটি মানুষ নিহত হয়েছে; ১৯৭১ সনে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে জনসভায় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায় শোনা যাচ্ছে, ১৯৭১ সনের যুদ্ধে এই ভূখণ্ডে তিরিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে। রক্তপাতের পরিমাণ যাই হোক, প্রশ্ন হল– এই রক্তপাতের পেছনে ইতিহাসচেতনা কি আদৌ কাজ করছে?

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' –এই মহান বাক্যটি এদেশে ১৯২০-এর দশকে রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল 'অতীতের মোহে' আচ্ছন্ন লোকদের মুগ্ধতার ঘোর থেকে জাগাবার উদ্দেশ্যে। "কোন ধর্ম সর্বকাল সর্বদেশ ও সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ-ধারণা যে জাতির আছে সে জাতি নিতান্ত হতভাগ্য, এবং বলতে হবে তার মন সভ্যতার নিম্ন স্তরে পড়ে নীরস ধর্মাদেশের মরুবালুকায় আপনার জীবনস্রোত হারিয়ে ফেলেছে।"[৯]– আবুল হুসেনের এই মহান উক্তিটি শুধু ধর্মান্ধদের সম্পর্কে কেন, আমাদের দেশের এবং পৃথিবীর যে-কোনো দেশের 'বিচার-বিবেচনাহীন সৃষ্টি-বিমুখ হুজুগমত্ত গণতন্ত্রীদের' এবং 'মতান্ধ মার্কসবাদীদের' বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের দেশে কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এবং কায়েমি স্বার্থের অনুকূল 'বুদ্ধিজীবী'দের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে চেতনা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তা ইতিহাসচেতনা নয়, সে চেতনাকে সঠিকভাবে নির্দেশ করতে হলে বলতে হবে সুবিধাবাদ, 'অতীতের মোহ', গড্ডলবৃত্তি, স্বতঃস্ফূর্ততা। এই রকম পরিস্থিতিতে জ্ঞানের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বুদ্ধিতে আড়ষ্টতা দেখা দেয়, 'বিবেক ও যুক্তি'র প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি হয়– মানুষ হয়ে পড়ে হীনচেতা, বৃহৎ মহৎ ও সুন্দরের প্রকৃতি বুঝবার সামর্থ্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। বিপুল পরিমাণে পঠনসামগ্রী প্রকাশিত হলেও সেগুলোতে জ্ঞানানুশীলনের কিংবা প্রজ্ঞার পরিচয় থাকে না।

ইতিহাসচেতনা, আর যাই হোক, অতীতকে ভালোবাসা নয়, অতীতচারিতা নয়, অতীতের গর্বে গর্বিত হয়ে বর্তমানের কর্তব্যকে ভুলে থাকা নয়। ইতিহাসচেতনা মানুষের মনে কর্তব্যস্পৃহা জাগায়। আমাদের দেশে ইতিহাস লিখেছেন এবং লিখছেন, এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রাজবংশের ইতিহাস, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস, অর্থনীতির ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস, আরও বহু বিষয়ের ইতিহাস তো লেখা হয়েছে, আজও হচ্ছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে অসাধারণ গ্রন্থও এখানে লিখিত হয়েছে দু-একটি। কিন্তু এসবের মধ্যে কোনো একটি গ্রন্থ কি বৃহত্তর শিক্ষিতসমাজের ভাবনাচিন্তার জগতে কোনো কার্যকর সুগভীর মহৎ প্রভাব ফেলতে পেরেছে? পারেনি। কেন পারেনি? এ প্রশ্নের মুখোমুখি কাউকেই হতে দেখা যায় না।

ইতিহাস কী– এই প্রশ্নটি শান্ত মস্তিষ্কে, পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখবার, কিছুটা খোঁজ-খবর করবার চেষ্টা করেছেন, এমন ব্যক্তিই-বা কে এদেশে?

'ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না'– একথা এদেশে শিক্ষিত লোকদের মুখে খুবই উচ্চারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল– ইতিহাস কী, তা বুঝবার এবং বৃহত্তর সমাজে উন্নততর ধারণাগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের ইতিহাসচেতনাকে কার্যকরভাবে, দীর্ঘস্থায়িত্ব দিয়ে জাগাবার চেষ্টাই-বা কে করেছেন? কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান?

নগদ টাকার বিনিময়ে দেশী-বিদেশী নানা প্রতিষ্ঠানের-ফরমায়েশি-আয়োজন ও লেখা ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু সেসব আয়োজন নয়া-উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার এবং কায়েমি স্বার্থের অনুকূলে– সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার জন্যই প্রায়শ করা হয়।[১০] সর্বত্র বলা হয়ে থাকে যে, বহু বছর ধরে আমরা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছি। এই উপলব্ধিতে সত্য আছে বলে মনে করি। কিন্তু উপলব্ধিটা বহু বছর ধরেই নিতান্ত ভাসাভাসা রূপে আছে। তা না-হলে আমাদের দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে ইতিহাসচেতনার জাগরণ ঘটত– পরিণতিতে সমাজ এক দীর্ঘস্থায়ী জাগরণের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারত, তার ফলে

হয়তো যথার্থ জাতীয় মুক্তির পথ পাওয়া যেত। পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাঙলাকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হল, অথচ ওই কালের ইতিহাসচর্চার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আমাদের প্রতিপত্তিশালী ইতিহাসবিদেরা প্রায়শ ব্যস্ত ছিলেন 'পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি'র ইতিহাস রচনার সমস্যাবলী নিয়ে।

স্কুল পর্যায়ে ছাত্রদের মনে 'পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি'র ধারণাকে প্রোথিতমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ভাঙার মাত্র বছর দুই আগে টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশ করেছিল *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি*। এ বইয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য সারা পূর্ব বাঙলাব্যাপী আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল নেগেটিভ– ইতিহাসচর্চার পজিটিভ কাজের দিকে আন্দোলনকারীদের মনোযোগ ছিল না। তার পরিণতি যা হবার হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গত দশ বছরের মধ্যে তো বিরাট সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে– তাতে প্রকৃত অর্থে জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে কি? জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটছে কি?

ইতিহাস কী, এ প্রশ্নের বেশ কয়েক রকম উত্তর পাওয়া যায় দার্শনিকদের ও ইতিহাসবিদদের রচনাবলিতে। আমাদের দেশে জাতীয় উত্থানের প্রয়োজনে এ বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও অনুসন্ধান দরকার। চিন্তার ক্ষেত্রে জড়ধর্মের ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিপত্তি দেখা যাচ্ছে, এবং তার যে প্রভাব পড়ছে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কর্মধারায়, বিশেষ করে রাজনীতিতে, তাতে সন্দেহ পোষণের কোনো কারণ নেই যে, জাতীয়ভাবে আজও আমরা অধোগামী। ইতিহাসচেতনার জাগরণ ঘটলে হয়তো আমরা উত্থানের সোপান খুঁজে পেতে পারি। ইতিহাস বলতে আমি বুঝি 'প্রক্রিয়া'-র সূচনা বিকাশ ও পরিণতির বিবরণ। স্থান ও কালব্যাপী যার অস্তিত্ব, উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতির ধারা বেয়ে যার অগ্রগতি, তাই প্রক্রিয়া। বস্তু, ভাব, ঘটনা– সবই প্রক্রিয়া। বাস্তবে দেখা যায়, এক প্রক্রিয়ার বিলয়ে তারই মধ্য থেকে নতুন করে আর এক প্রক্রিয়া সূচিত হয়, অথবা এক প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হয় অন্য প্রক্রিয়ায়। বস্তু, ভাব, ঘটনা– সকল ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে। ভৌত বিজ্ঞানীদের 'বস্তুর অবিনাশিতা তত্ত্ব'র মতোই ইতিহাসে 'প্রক্রিয়ার অবিনাশিতা তত্ত্ব' দাঁড় করানো সম্ভব। ইতিহাসের গতিধারায় পুরাতন থেকেই জন্ম হয় নতুনের এবং পুরাতনকে পেছনে ফেলে নতুন এগিয়ে যায়। ইতিহাস মৃত অতীতের বিবরণ নয়, জীবন্ত বর্তমানের অন্যতম প্রাণশক্তি। ইতিহাসকে বলা যায় পরিবর্তনের– তথা বিবর্তনের– রহস্য-উদঘাটনের আর বিপরীতমুখী সম্ভাবনার চিত্র-অঙ্কনের প্রয়াস। শুধু অতীতের নয়, চলমান কালেরও, এমনকি কিছু পরিমাণে ভবিষ্যৎ কালেরও, ইতিহাস রচনা করা যায়। ক্রমবিকাশের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে যুগান্তরের অস্ফুট মহৎ সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলাও ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য।

ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ইতিহাসই ফুটে উঠেছে। ডারউইনের বর্ণনা মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হতে বলে, আশাবাদীও হতে বলে। 'দি ওরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থে প্রাণীজগতে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'-এর যে বর্ণনা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে 'ডায়ালেকটিস অব নেচার' গ্রন্থের সূচনায় এঙ্গেলস লিখেছেন :

"ডারউইন যখন দেখিয়েছেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতা ও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম– অর্থনীতিবিদেরা যাকে সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে ঘোষণা করে থাকেন – তা 'প্রাণীজগতের'রই স্বাভাবিক অবস্থা, তখন তিনি জানতেন না, মানবজাতিকে নিয়ে– বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীকে নিয়ে– কী তিক্ত ব্যঙ্গ তিনি রচনা করেছেন। সাধারণভাবে উৎপাদন ক্রিয়া যেমন মানুষের প্রজাতিকে অবশিষ্ট জীবজগত থেকে আলাদা করে দিয়েছে, তেমনি সামাজিকভাবে মানবপ্রজাতিকে অবশিষ্ট জীবজগত থেকে উচ্চতর সমতলে উন্নীত করতে পারে কেবলমাত্র সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন, যে সংগঠনে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পিত উপায়ে। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই রকম সংগঠন অপরিহার্য ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। এ থেকেই শুরু হবে ইতিহাসের এক নতুন যুগ– যে যুগে মানবজাতির এবং সেই সঙ্গে তার কার্যকলাপেরও সকল শাখায়, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানে, এমন অগ্রগতি ঘটবে যে তার সামনে অতীতের সকল অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।"[১১]

মানুষের চেতনা এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, সে সচেতনভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, এবং নিজের চিন্তাশক্তি দ্বারা সে তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে। কাজ করার আগেই সে কাজের পরিকল্পনা, ছক, নকশা ইত্যাদি তৈরি করে নিতে পারে। সে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে পারে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী। বাবুই পাখির নৈপুণ্য যতই অসাধারণ হোক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে বাসা বাঁধে একইভাবে, তার কাজে নতুনত্ব দেখা যায় না, বাসা বাঁধার আগে ব্লুপ্রিন্টের মতো কিছু তৈরি করে নেয়ার সামর্থ্য তার নেই। মৌমাছির কিংবা মাকড়সারও সে শক্তি নেই। পশু-পাখির, কীট-পতঙ্গেরও সমাজ আছে, তবে তাদের সমাজ স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তারা কোনো আদর্শ বা কল্পস্বর্গ বা ইউটোপিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের সমাজে ইউটোপিয়া জন্ম লাভ করে। পুরাতন ইউটোপিয়াকে নাকচ করে দিয়ে নতুন ইউটোপিয়া সৃষ্টি হয়। কার্ল মার্কস সিন্ডিকালিজম নামক এক ইউটোপিয়াকে নাকচ করে দিয়ে কমিউনিজম নামে আর এক ইউটোপিয়ার জন্ম দিয়েছেন। মানুষের সমাজে ইউটোপিয়ার প্রয়োজন থাকে। এঙ্গেলস লিখেছেন :

"জীবজন্তুরও ইতিহাস আছে– তাদের উৎপত্তির ও বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। তবে এ ইতিহাস তাদের হয়ে অন্যের করে দেওয়া ইতিহাস, এতে তারা নিজেরা যেটুকু অংশ নেয় তা ঘটে তাদের অজ্ঞাতে ও ইচ্ছা-অনিচ্ছানিরপেক্ষভাবে। অপর দিকে, জীবজন্তুর পর্যায় থেকে মানুষ যতই পৃথক হয়ে ওঠে, ততই তারা

সচেতনভাবে নিজেদের ইতিহাস নিজেরা সৃষ্টি করে, এ ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় অ-পূর্বজ্ঞাত ফলাফলের ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রভাবও সেই অনুপাতে কমতে থাকে, এবং পূর্ব-পরিকল্পিত লক্ষ্যের সঙ্গে ইতিহাসের ফলাফলও ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে মিলে যেতে থাকে।"[১২]

মানুষের সমাজে এবং সকল মানবীয় কর্মকাণ্ডেই পূর্ব-পরিকল্পনার, কল্পচিত্র রচনার, ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রয়োজন থাকে। বর্তমানে আমাদের সমাজেও আছে। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ও জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রতিটি জাতিরই জাতীয় উন্নতির কল্পচিত্র ও সেই কল্পচিত্রকে বাস্তবায়িত করার কার্যক্রম দরকার। পরিবর্তনের ধারায় মানুষ শুধুই প্রাকৃতিক নিয়মের, সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থার দাস নয়। প্রকৃতির নিয়ম জেনে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করে, অতীতের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বহুলাংশে তার ইচ্ছা অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যতকে গড়ে তুলতে পারে। প্রকৃতিতে ও সমাজে চলমান প্রক্রিয়াকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণের, পরিচালনার ও গড়ে তোলার এই ক্ষমতাই মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা। প্রাণিজগতে কেবল মানুষই পারে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা যৌথভাবে এই ক্ষমতার পরিচয় দিতে, অন্য কোনো প্রাণী পারে না। এজন্য মানুষ ইতিহাসের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা বলে অভিহিত হয়। ইতিহাসের স্রষ্টা হওয়ার জন্য ইতিহাস অনুশীলনের, অর্থাৎ প্রক্রিয়ার উদ্ভব-বিকাশ-বিলয় সম্পর্কে জ্ঞানাহরণের এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের সমাজে আজ সকল কর্মের ক্ষেত্রেই ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা দরকার। সেই সঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে, "মানব-প্রকৃতির ওপর যখনই জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তখনই দেখা দেয় তার বিকৃতির সম্ভাবনা।" আর "একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত হতে গেলে বন্য থেকে যাবার ভয় আছে।"

তথ্যনির্দেশ

১. Sigmund Freud, The Future of an Illusion (X)
২. 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬১), পৃ.২২২
৩. আবদুল কাদির সম্পাদিত, আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৭৬), পৃ.৩৯
৪. ঐ, পৃ. ৩৯-৪০
৫. উদ্ধৃত: শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, (কলিকাতা, ১৮৮০ শকাব্দ), পৃ. ১০৬-১০৭
৬. আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১
৭. ঐ, পৃ. ৪১-৪২
৮. ঐ, পৃ. ৪২-৪৩
৯. ঐ, পৃ. ৬১
১০. সৃষ্টির তাড়না, সৃষ্টির সম্ভাবনা ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে Leo Tolstoy- Gi Aylmer Maude অনূদিত What is Art and Essays on Art Ges Aylmer Maude সঙ্কলিত ও অনূদিত Tolstoy on Art গ্রন্থে। বর্তমান লেখকের 'কালের যাত্রার ধ্বনি' (ঢাকা ১৯৭৩) বইতে এ-বিষয়ে টলস্টয়ের একটি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ আছে, আর 'মানুষ ও তার পরিবেশ' (ঢাকা, ১৯৮৮) বইয়ের 'সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও সাহিত্যস্রষ্টার ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধেও এ-বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশে বিরাজিত সাহিত্য পরিস্থিতিতে এবং বৃহত্তর অর্থে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, টলস্টয়ের চিন্তাধারা হয়তো আজ আলোর সন্ধান দিতে পারে, অন্তত জাগরণের সহায়ক হতে পারে– যেভাবে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক দর্শন সহায়ক হয়েছিল রেনেসাঁসের। উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের চিন্তাধারাও আজ আমাদের নবজাগরণের সহায়ক হতে পারে।
১১. K. Marx, F. Engles, V. Lenin, On Historical Materialism, Moscow, 1976, Pp. 226-27
১২. ঐ, পৃ. ২২৬

ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি?

কালী প্রসন্ন দাস

ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি? –এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যখন বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করছি তখন একটি ফোন এল। পরিচিত নম্বর। ফোন ধরলাম, ফোনকর্তা জানতে চাইলেন, আমি কী করছি? তিনি আমার কাজে বিঘ্ন ঘটালেন না তো! এ রকম প্রশ্ন সাধারণত সৌজন্যের খাতিরেই করা হয়। তাই এর অতি পরিচিত উত্তর হল, "না না, কোনো অসুবিধা নেই, বলুন, বলুন..." ইত্যাদি। কিন্তু কেন জানি একই সাথে আমি যথার্থ উত্তরটাই দিলাম। বললাম, 'ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি' –এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। ওপাশ থেকে আবার প্রশ্ন, "এবার বুঝি দর্শনের ইতিহাস লিখছেন?" প্রশ্নটি সাধারণ। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে। 'দর্শনের ইতিহাস' কথাটা যত পরিচিত ও সহজবোধ্য, 'ইতিহাসের দর্শন' কথাটা তত পরিচিত ও সহজবোধ্য নয়। কারণ, দর্শনের ইতিহাস হল ইতিহাসের বিষয়। অন্যদিকে ইতিহাসের দর্শন হল দর্শনের বিষয়। 'ইতিহাস' সহজেই যতটা বোধগম্য, 'দর্শন' সহজেই ততটা জটিল। দর্শনের কথা শুনতে গেলেই কিছুটা যেন প্রস্তুতি নিতে হয়। সুতরাং বলাই বাহুল্য, 'ইতিহাসের দর্শন' কথাটা আরো বেশি জটিল। সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে 'ইতিহাসের দর্শন'-এর চেয়ে 'দর্শনের ইতিহাস'-এর সঙ্গে নিঃসন্দেহে অধিকতর মানুষের পরিচয় রয়েছে। কারণ, ইতিহাসেরও যে দর্শন থাকতে পারে এ চিন্তা সাধারণ বর্ণনামূলক চিন্তা নয়, বরং প্রতিফলনমূলক বা মূল্যায়নমূলক চিন্তা। গভীর পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া ইতিহাসের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ 'ইতিহাস'-এর সঙ্গে পরিচিতি নেই এমন লোকের পরিচয় পাওয়াই হয়তো দুঃসাধ্য হবে। তবে এ-কথা বলা বোধহয় বেঠিক হবে না যে, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস পাঠ না-করলে সে পাঠ পাঠককে তথ্যসমৃদ্ধ করে, কিন্তু প্রাজ্ঞ করে না বা দিকনির্দেশনা দেয় না।

ইতিহাসকে যখন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা হয়, বিচার-বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন করা হয় তখনই তা ইতিহাসের দর্শন হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজন দর্শন কী তা বোঝা, ইতিহাস কী তা বোঝা, এরপর দর্শনের চোখে ইতিহাসকে দেখলে ইতিহাসের চেহারা কেমন দেখাবে তা বোঝা। এককথায়, ইতিহাসের দার্শনিক মূল্যায়নকে বোঝা।

মুশকিল হল, এই তিনটি বিষয়ের কোনোটিই খুব সহজে বুঝে ফেলার বিষয় নয়। কারণ, প্রাচ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দেরও পূর্বে, এবং পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত। সুতরাং হিসাব অনুসারে দর্শনের ইতিহাসের বয়স ২,৭০০ বছরেরও বেশি। অন্যদিকে 'ইতিহাস', Historic, Historia মূলত গ্রিক শব্দ। এর অর্থ হল সত্য জানার জন্য সযত্ন অনুসন্ধান। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডটাস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২০ অব্দে) সর্বপ্রথম এ শব্দটি দ্বারা তাঁর গবেষণাগ্রন্থের নামকরণ করে প্রচলিত অর্থে শব্দটির ব্যবহার করেন। তাঁর বইয়ের নাম ছিল History of Gracco Persian War । তবে হেরোডটাসের প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ বছর আগে হোমার (Homeros) তাঁর ইলিয়াদ মহাকাব্যে 'Histor' শব্দটি সালিস/আইন কানুনে অভিজ্ঞ/জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেন। সুতরাং 'ইতিহাস'-শব্দটির বয়স প্রায় ২৪০০ থেকে ২৮০০ বছর।

'দর্শন' ও 'ইতিহাস' শব্দ দুটির তুলনায় 'ইতিহাসের দর্শন' শব্দটির বয়স অনেক কম। মাত্র ৩০০ বছর। ইতিহাসের দর্শন রয়েছে, এ তত্ত্বের কথা আধুনিক যুগে ফরাসি নবজাগরণের নেতা ভলতেয়ার (Francois Arouet জনপ্রিয় নাম Voltaire, ১৬৯৭-১৭৭৮) প্রথম উচ্চারণ করেন। তিনি ইতিহাসের দর্শন বলতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসকে বুঝিয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ভলতেয়ারের সময় থেকেই ইতিহাসের দর্শনচিন্তার সূচনা হয়। বরং ইতিহাস দর্শনের প্রণেতা হিসেবে আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থের রচয়িতা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ইবনে খালদুন (Abu Zayd Abdur-Rahman Ibn Khaldun, ১৩৩২-১৪০৬)-এর নাম সর্বজনস্বীকৃত, যদিও তাঁর সময়ে 'ইতিহাস দর্শন'-এর ধারণা অপরিচিত ছিল। ইবনে খালদুনের সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাস দর্শনের বয়স প্রায় ৭০০ বছর।

সুতরাং মূল প্রসঙ্গের কথা স্মরণ করে বলা যায়, 'দর্শন', 'ইতিহাস' ও 'ইতিহাসের দর্শন'-এর এত দীর্ঘ ইতিহাস থাকার কারণে 'ইতিহাসের দর্শন বলতে কী বুঝি'–এ প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য তো নয়ই, অসাধ্যও হতে পারে। তবে সর্বজনস্বীকৃত উত্তর দেওয়া না গেলেও, ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে যিনি লিখছেন তাঁর উপলব্ধি এ লেখা যিনি পড়ছেন তাঁর সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। এটাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই দর্শন বলতে কী বুঝি, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। এর উত্তর নিয়েও মতপার্থক্য থাকবে। তবে একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং এসব প্রশ্নের সমাধান খোঁজা করাই হল দর্শনের কাজ। দর্শনের প্রধান জিজ্ঞাসা হল 'কেন', 'কোথা থেকে' ও 'কীভাবে'? এই

প্রশ্নগুলো প্রতিফলনমূলক চিন্তা বা বিশ্লেষণী চিন্তার ফসল। তাই মানুষ তার উদ্ভবকাল থেকেই এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম ছিল না। বরং চেতনার বিকাশের একটি পর্যায়ে মানুষের মধ্যে দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। নিজের অস্তিত্বকে অধিকতর নিশ্চিতভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন থেকেই মানুষ প্রকৃতি-জগতের রহস্য জানতে চেয়েছে। নিজের দেহ ও চেতনা, প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক, অস্তিত্বের উৎস, জানার পরিধি, সত্য-মিথ্যা, নিজের ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং নানাবিধ প্রশ্ন তুলেছে। এসব প্রশ্নের মধ্যে যেগুলো মৌলিক সেগুলোই দার্শনিক প্রশ্ন।

এবার প্রশ্ন ওঠে, কোন প্রশ্নগুলো মৌলিক? এর উত্তরে বলা যায়, যেসব প্রশ্ন অধিবিদ্যা (গবঃধঢ়যুংরপং) বিষয়ক, জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) বিষয়ক ও নীতিবিদ্যা (Axiology) বিষয়ক সে সব প্রশ্নই দার্শনিক প্রশ্ন। অধিবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন হল, জগতের মূলতত্ত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্ন। অর্থাৎ মূলতত্ত্ব কী? তা বস্তুগত না চিন্তাগত? অন্যকথায়, বস্তু থেকে জগতের উৎপত্তি না-কি ভাব বা চিন্তা থেকে জগতের উৎপত্তি? বস্তু ও চিন্তার সম্পর্ক কী? চিন্তা বস্তু-নির্ভর, বস্তু চিন্তা-নির্ভর, না-কি বস্তু ও চিন্তা পরস্পর স্বতন্ত্র? যদি স্বতন্ত্র হয় তবে এরা সম্পর্কিত হয় কীভাবে? কারণ, মানুষসহ সকল প্রাণীর দেহেই আমরা বস্তু ও চিন্তাকে একত্রে থাকতে দেখি। এসব প্রশ্ন হল অধিবিদ্যাগত প্রশ্ন।

জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্ন হল, জ্ঞানের উৎস, সীমা, বৈধতা, নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত প্রশ্ন। অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস কী? বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, স্বজ্ঞা, না-কি অন্য কিছু? মানুষ কতটুকু জানতে পারে? কোন জ্ঞান বৈধ, কোন জ্ঞান অবৈধ, কোন জ্ঞান নিশ্চিত, কোন জ্ঞান অনিশ্চিত? জ্ঞানের বৈধতা বা নিশ্চয়তার মানদণ্ড কী? নিশ্চয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী?

নীতিবিদ্যা বা মূল্যসম্পর্কিত প্রশ্ন হল, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত প্রশ্ন। ভালো কী? মন্দ কী? উচিত বা অনুচিত বলতে কী বোঝায়? ভালো ও মন্দের মানদণ্ড কী? এই মানদণ্ড আপেক্ষিক না-কি অনপেক্ষ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও মূল্যবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নগুলোই হল দার্শনিক প্রশ্ন। দর্শন বলতে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং এগুলোর উত্তর খোঁজ করাকেই বোঝানো হয়।

এবারে জিজ্ঞাস্য হল, ইতিহাস বলতে কী বুঝি? এর সাদামাটা উত্তর, অতীত ঘটনার সংরক্ষিত বা লিপিবদ্ধ রূপকেই ইতিহাস বলা হয়। মানুষ অতীতকে জানতে চায়। এই চাওয়া থেকে মানুষ ইতিহাসের মাধ্যমে অতীতকালের পুনর্গঠন করে এবং অতীতের সত্যের অনুসন্ধান করে।

ইতিহাস দুভাবে লেখা যায়। অতীত ঘটনার বিশুদ্ধ বর্ণনা। স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী ইত্যাদি, যা ঘটেছে তার চিত্র। অর্থাৎ তথ্য বা উপাদান লিপিবদ্ধকরণ। এ পদ্ধতি ইতিহাস রচনার প্রাচীন পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঘটনা কেন ঘটলো, কীভাবে ঘটলো, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করা। ঘটনার পেছনের ঘটনা কী, তা বোঝা। ঘটনার শৃংখল বা ঘটনার পরম্পরা আবিষ্কার করা। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করতে হলে যে তথ্যাবলি বা উপাদান প্রয়োজন হয় প্রথমোক্ত পদ্ধতির বা প্রাচীন পদ্ধতির ইতিহাস সেইসব উপাদান সরবরাহ করে।

শেষোক্ত পদ্ধতির ইতিহাস রচনার সঙ্গে ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই পদ্ধতি পরবর্তীকালের উদ্ভাবন। তাই ইতিহাসের দর্শনও পরবর্তীকালের বিষয়। আগেই বলেছি, বয়সের দিক থেকে ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাসের দর্শনের বয়স অনেক কম। তবে বয়স কম হলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজ, সভ্যতা বা প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাসের দর্শনের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এর দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রাচীন পদ্ধতির ইতিহাস কেবল ঘটনা লিপিবদ্ধ করেই দায়িত্ব শেষ করে। আধুনিক ইতিহাস ঘটনাবলির মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এতে ইতিহাসের ঘটনা কেবল স্বতন্ত্র ঘটনামাত্র থাকে না, বরং প্রতিটি ঘটনা জটিল ও বহুমুখী ঘটনাজালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মানুষের সমাজ, সভ্যতা বা প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ইতিহাস ও ইতিহাসের দর্শন কখনও কখনও অভিন্ন হয়ে যায়। তখন একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা, দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা অসম্ভব হয়।

প্রশ্ন হল, কীভাবে এই একত্রিকরণ ঘটে? এর উত্তরে বলা যায়, আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার জন্য, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের মূল্যায়ন, এদের কর্মকাণ্ড যে উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে তার বিশ্লেষণ এবং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এসব ঐতিহাসিক চরিত্র কাজ করছে সে অবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। এ কাজ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ প্রথমে ঘটনাবলির একটি মানসিক পুনর্গঠন বা চিত্র তৈরি করেন। এই চিত্র ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা, মানসিক গঠন, চিন্তা-কাঠামো ইত্যাদি দ্বারাই নির্মিত হয়। তাই ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কোনো-না-কোনো অর্থে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। এই ব্যক্তিসাপেক্ষতা চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যক্তির আধিবিদ্যক গঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা যখন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বুঝি তা নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব যে, এই অধিবিদ্যাগত গঠন ভাববাদী না হয় বস্তুবাদী হয়ে থাকে। ফলে ইতিহাস দর্শনের ব্যাখ্যাও ভাববাদী না হয় বস্তুবাদী কাঠামোতে আবদ্ধ হয়ে যায়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। ইতিহাস দর্শনের প্রণেতা ইবনে খালদুন উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের ইতিহাস কিতাব-আল-ইবার রচনা করতে গিয়ে এর 'মুখবন্ধ' (আরবিতে 'মুকাদ্দিমা') হিসেবে আল-মুকাদ্দিমা রচনা করেন। ১৩৭৫ থেকে ১৩৭৯ সাল পর্যন্ত চার বছর তিনি আলজিরিয়ার 'কালাত ইবনে সালামাহ' নামক দুর্গে নিরিবিলি পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আল-মুকাদ্দিমা রচনা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থ মানব ইতিহাসের কার্যকার বিশ্লেষণের প্রথম অনন্য অবদান। এ গ্রন্থকে ইতিহাস-দর্শনের প্রথম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা হয়। তাই তাঁর লেখায় 'ইতিহাস' ও 'ইতিহাসের দর্শন' অভিন্ন হয়ে পড়ে।

ইতিহাস সম্পর্কে ইবনে খালদুনের ধারণা প্রচলিত ইতিহাস রচনার ধারার ব্যতিক্রম। ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর ধারণাই হল ইতিহাসের দর্শন। সাধারণত বিভিন্ন যুগে মানুষের ও রাজবংশসমূহের অভিজ্ঞতায় যে সকল ঘটনা ঘটে এর বিবরণকে ইতিহাস বলা হয়। কিন্তু ইবনে খালদুনের মতে, যথার্থ অর্থে ইতিহাস ঘটনার বিবরণমাত্র নয়। বরং তা মানুষের চিন্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এর কাজ হল সত্যের আবিষ্কার করা। পরিদৃশ্যমান ঘটনাসমূহের কারণ ও উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা এবং ঘটনাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পরিবেশন করাই ইতিহাসের কাজ। এই অর্থে ইতিহাসের ভিত্তিমূল দর্শনের গভীরে প্রোথিত। তাই ইবনে খালদুন যখন ইতিহাস রচনা করেন তখন প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের দর্শন রচিত হয়।

কী লিখেছেন ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায়? মানুষ ও মানবসভ্যতা ইবনে খালদুনের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝামাঝি জায়গা মানুষের জীবনযাত্রার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পরিবেশগত পার্থক্যের জন্যই মানুষের স্বভাব-চরিত্রে, আচার-আচরণে এমনকি দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য ঘটে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক বা যৌথ জীবনযাত্রা শুরু করে। যৌথ জীবনে মানুষ সম্মিলিতভাবে পরস্পরের প্রয়োজন মেটায় এবং এভাবে সভ্যতা বা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। এই বিবর্তনের এক জটিল স্তর হল 'শহর' বা 'নগর', গ্রিক 'টাউন', আরবি 'তমদ্দুন'। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে লোকসংখ্যার প্রসারের মাধ্যমে সভ্যতার প্রসার এবং সভ্যতার প্রসারের মাধ্যমে বৃহত্তর ও জটিলতর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। 'আসাবিয়াহ্' বা 'দল-চেতনা' বা 'সংহতি'র মাধ্যমে 'দওলাহ্' বা রাজবংশ বা রাষ্ট্র-চেতনা গড়ে ওঠে। দৃঢ়তর দল-চেতনা থেকে রাজবংশ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ও তা পরিচালনা করে। এভাবে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বড় বড় শহর, নগর ও বন্দরের জন্ম হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে স্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রাজবংশ বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশে মনোযোগ দেয় এবং অন্যান্যদের তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও বিলাস সামগ্রী তৈরির কাজে নিয়োজিত করে। এই স্তরে কারুশিল্প, কলাকৌশল ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু অতি-বিলাসিতার কারণে রাজবংশের সংহতি বা দল-চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে মূল ক্ষমতা চলে যায় যারা প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর যোগান দেয় তাদের হাতে। এই যোগানদাতারা দলের ভেতরের বা বাইরেরও হতে পারে। তখন দ্বন্দ্ব হয় এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে শাসকবংশ পরাজিত হয়, নতুন বংশ ক্ষমতা দখল করে। এই প্রক্রিয়ায় এক রাজবংশ বা রাষ্ট্রের পতন ঘটে, অন্য রাজবংশ বা রাষ্ট্রের উন্মেষ হয়। একই নিয়মে ও চক্রে সেই রাজবংশেরও পতন ঘটে। এ যেন এক প্রকারের চক্রাকার আবর্তন। উত্থান, পরিবর্তন, বিপর্যয় ও পতন। ইবনে খালদুনের এই তত্ত্ব রাষ্ট্রের বা রাজবংশের উত্থান-পতনের সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, ধর্মীয়, স্বভাবগত, অভ্যাসগত, কারণ নির্দেশ করে। এই তত্ত্ব উপস্থাপন করার পর তিনি এর আলোকে উত্তর আফ্রিকার আরব ও বারবারদের ইতিহাস কিতাব-আল-ইবার রচনা করেন।

এ থেকে দেখা যায় ইবনে খালদুন পরিপ্রেক্ষিতগত ঘটনাবলির আলোকে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করেন। এই পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। কারণ, এতে ঘটনার প্রেক্ষাপটের কার্যকারণিক বিশ্লেষণ দ্বারা ঘটনা সংঘটনের নিয়ম আবিষ্কারের প্রয়াস গৃহীত হয়।

কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। কারণ, রাজবংশ বা রাষ্ট্রের উত্থান, পরিবর্তন, বিপর্যয় ও পতনের এই আবর্তনচক্রকে ইবনে খালদুন পূর্বনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট ও আল্লাহর নির্দেশে চালিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, রাজবংশ ঐশী বিধান অনুযায়ী শাসক পেয়ে থাকে। তাই শাসককে ঐশী বিধান অনুসারেই চলতে হয়। কিন্তু শাসক যখন তা অবজ্ঞা করেন অর্থাৎ আরাম আয়েশে দিন যাপন করতে গিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন তখনই দুর্নীতি, হানাহানি, বিবাদ দেখা দেয়। এই অবস্থায় আবার ঐশ্বরিক নির্দেশ জারি হয় এবং পুরনো রাজবংশের পতন ও নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে। সবই ঘটে ঐশী নিয়মে, পূর্বনির্ধারিতভাবে। তাই তিনি প্রাকৃতিক রাজতন্ত্রের চেয়ে ধর্মীয় রাজতন্ত্রকে উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেন। কারণ, প্রাকৃতিক রাজতন্ত্র মানুষের কেবল ইহলৌকিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় রাজতন্ত্র ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রয়োজন মেটায়। প্রাকৃতিক রাজতন্ত্র বৌদ্ধিক আইনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ধর্মীয় রাজতন্ত্র ঐশ্বরিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নবী কিংবা তার উত্তরসূরি খলিফা দ্বারা এসব আইন বলবৎ হয়।

সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই ইবনে খালদুনের ইতিহাসের দর্শনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তাঁর ইতিহাসের দর্শন ভাববাদী।

এই আলোচনার পর ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্ভবত কিছুটা স্পষ্টতর হয়। বলা যায়, ইতিহাসের ঘটনাবলির পেছনে যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করা হয় তখন এই অনুসন্ধানের পেছনে যদি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তবে এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়াই ইতিহাসের দর্শন নামে পরিচিত হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক? দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অ-দার্শনিক বা দর্শন-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি। যে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক বা মূল্যবিষয়ক দিক রয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক। এ অর্থে যে ইতিহাসের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক সে ইতিহাসের যেমন দর্শন থাকতে পারে তেমনি যে ইতিহাসের পদ্ধতি ধর্মতাত্ত্বিক সে ইতিহাসেরও দর্শন থাকতে পারে।

দার্শনিক বিচারে অধিবিদ্যাগত দিক থেকে যে কোনো বিশ্ববীক্ষা বা জগৎদৃষ্টিকে আমরা হয় ভাববাদী না-হয় বস্তুবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। ভাববাদী বিশ্ববীক্ষা অনুসারে জগতের মূলতত্ত্ব হল ভাব বা চিন্তা বা চেতনা। এর অর্থ হল, চিন্তা বা ভাব থেকে বিশ্বজগতের উৎপত্তি। ভাব বা চিন্তা যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। ভাব আগে, বস্তু পরে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা বিপরীত কথা বলে। এ মত অনুসারে, বস্তু থেকে জগতের সবকিছুর সৃষ্টি। বস্তু আগে, চেতনা পরে। বিবর্তনের একটি পর্যায়ে বস্তুর মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের ফলে চেতনার সৃষ্টি হয়। ভাববাদী জগৎদৃষ্টি অবরোহী পদ্ধতির অনুসারী। এ পদ্ধতি অনুসারে সার্বজনীন নিয়ম অনুসরণ করে বিশেষ বস্তুর সৃষ্টি হয়। বিশেষ বস্তুর নিয়ম সার্বজনীন নিয়মের অন্তর্গত এবং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, ইবনে খালদুনের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে, স্রষ্টার তৈরি নিয়ম অনুসারে ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনার আবর্তন ঘটে। অন্যদিকে বস্তুবাদী জগৎদৃষ্টি আরোহ পদ্ধতির সমর্থক। এ পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ বস্তুর নিয়মের পঠন-পাঠন থেকেই সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে যা সাধারণ তা-ই সাধারণ নিয়ম তৈরি করে। যেমন, বিশেষ বিশেষ জড় দ্রব্য পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হওয়ার পঠন-পাঠন থেকেই আবিষ্কৃত হয় মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম।

ভাববাদ চূড়ান্ত অর্থে উদ্দেশ্যবাদী। এতে উদ্দেশ্যই অতীত ঘটনাসমূহকে ভবিষ্যতের বা পরিণতির দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদ কার্যকারণ নির্ভর। বস্তুগত কার্যকারণই ঘটনাসমূহকে ঘটতে সহায়তা করে। ভাববাদ কোনো-না-কোনো অর্থে নির্ধারণবাদী। বস্তুবাদ অ-নির্ধারণবাদী। ভাববাদ ধর্ম দ্বারা সমর্থিত। বস্তুবাদ বিজ্ঞান দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত। ভাববাদের রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদে। পক্ষান্তরে বস্তুবাদের রাজনৈতিক বিকাশ সমাজতন্ত্রে।

ভাববাদ ও বস্তুবাদের এ পার্থক্য মোটাদাগে করা। এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা খুব সহজ নয়। তবে মোটাদাগে ভাববাদী জগৎদৃষ্টি থেকে বস্তুবাদী জগৎ-দৃষ্টিকে আলাদা করাও খুব কঠিন নয়।

জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১) পরম ভাববাদে (Absolute Idealism) জার্মান ভাববাদের বিকশিত রূপ এবং কার্ল মার্কসের (Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বস্তুবাদের বিকশিত রূপ দেখা যায়।

ইতিহাসেরও ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। হেগেল ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা এবং মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করেছেন।

হেগেলের মতে ইতিহাস হল পরম সত্তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। ইতিহাসের মহাপুরুষেরা পরম সত্তার বাহন। পরম সত্তা হল পরম ভাব। মানুষের সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরম সত্তা তার আত্মপ্রকাশ ঘটায়। এরই এক পর্যায়ে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং এর পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরম সত্তার পর্যায়ক্রমিক প্রকাশকে হেগেল প্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।

হেগেলের ব্যাখ্যায়, ইতিহাসের পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক। নয়-প্রতিনয়-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় ইতিহাস এগিয়ে যায়। এ হল প্রগতির তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপ বা 'নয়' thesis হল একটি বিমূর্ত সার্বিক ধারণা। এই ধারণা থেকে একটি স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয় যা প্রতিনয় (antithesis)। এটি দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় ঘটে 'সমন্বয়' (synthesis)। এটি উচ্চতর পর্যায়। এখানেই ঘটে প্রগতি। এরপর সমন্বয়ের মধ্যে আবার স্ববিরোধিতা শুরু হয়। অর্থাৎ সমন্বয় 'নয়'-তে পরিণত হয় এবং এর মধ্যেকার স্ববিরোধিতা হল, 'প্রতিনয়'। আবার জন্ম নেয় 'সমন্বয়'। এভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ইতিহাসের এই প্রগতি হল পরম সত্তার আত্মপ্রকাশেরই প্রগতি। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত ভাবগত পরম সত্তার আত্মপ্রকাশেরই ইতিহাস।

ইতোপূর্বে ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সে অনুসারে হেগেলের ইতিহাসের ব্যাখ্যা ভাববাদী। এর পদ্ধতি অবরোহাত্মক। এর জ্ঞানতত্ত্ব স্বজ্ঞাবাদী। কারণ, পরম ভাবকে স্বজ্ঞার মাধ্যমেই যথার্থ অর্থে জানা যায়। এর মূল্যতত্ত্ব অনপেক্ষ। কারণ, পরম সত্তার দ্বারা তৈরি অপরিবর্তনশীল নিয়মই হল মূল্যের অনপেক্ষ মানদণ্ড। অন্যদিকে, কার্ল মার্কসের ইতিহাস ব্যাখ্যাকে বস্তুবাদী ইতিহাস দর্শনের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে

পারি। মার্কস হেগেলের মতোই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সমর্থক। তিনিও এই একই পদ্ধতি দ্বারা প্রাকৃতিক জগৎ ও মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেন। তবে তিনি হেগেলের মতো মানুষের সমাজকে ভাবগত পরম সত্তার প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেননি। বরং তাঁর ব্যাখ্যা বস্তুবাদী। তাঁর মতে, বস্তু থেকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ভাবগত পরম সত্তার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয় না, বরং বস্তুর মধ্যেকার প্রাকৃতিক কার্যকারণে সংগঠিত হয়। বস্তু দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়। এই বিবর্তন তিনটি নিয়ম মেনে চলে। তা হল, ১. বিপরীতের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। ২. পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে গুণগত রূপান্তর। ৩. নিরাকরণের নিরাকরণ। এই নিয়মে জড়জগৎ ও মানব-ইতিহাস উভয়কে ব্যাখ্যা করা যায়।

এই তিনটি নিয়মের মূল বক্তব্য হল, প্রতিটি বস্তু বা সমাজ হল বিপরীতের সমন্বয়। যেমন, পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু, পুঁজিবাদী সমাজে মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। তাই বস্তু বা সমাজে দ্বন্দ্ব থাকে। এই দ্বন্দ্বের ফলে বস্তু বা মানবসমাজের মধ্যে পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের এক পর্যায়ে বস্তু বা সমাজ গুণগতভাবে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনের দুটি অগ্রবর্তী স্তরে পূর্ববর্তী অবস্থা নিরাকৃত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন বস্তু বা সমাজ তৈরি হয়। যেমন, ধানের নিরাকরণ থেকে চারার জন্ম, চারার নিরাকরণ থেকে আবার বহু বহু ধানের জন্ম। তেমনি আদিম সাম্যবাদের নিরাকরণে সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের জন্ম, আবার পুঁজিবাদ নিরাকৃত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব যার মূল চরিত্র সাম্যবাদী। এটা এক প্রকারের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তির মধ্যে বিকাশ বা প্রগতি রয়েছে।

এই নিয়মেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজ, দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়। তাই এই প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক নয়, কার্যকারণিক।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির এই তিনটি নিয়ম দ্বারা মার্কস যখন বস্তুজগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তখন এর নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। অন্যদিকে যখন এই পদ্ধতি দ্বারা তিনি মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তখন এর নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। যথার্থ অর্থে কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদই হল ইতিহাসের বিশুদ্ধ বস্তুবাদী দার্শনিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার পদ্ধতি আরোহাত্মক, এর জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী, এর মূল্যতত্ত্ব আপেক্ষিক। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পরম, অপরিবর্তনীয় নৈতিক নিয়ম স্বীকার করে না। ইতিহাসের বিবর্তনের পর্যায়সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মানুষ নৈতিক মূল্য বা নিয়ম প্রবর্তন করে। মূল্যের পরম কোনো উৎস নেই, বরং সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বে নিয়ম তৈরি হয়। তাই মূল্যতত্ত্ব আপেক্ষিক।

বস্তুত অর্থে ইতিহাসের বিশুদ্ধ বস্তুবাদী ধারণা কার্ল মার্কসের ইতিহাস ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সমাজ বিকাশের মূলে পরম সত্তার ইচ্ছা বা প্রকাশ নয় বরং উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক সক্রিয় এবং সামাজিক দ্বান্দ্বিকতার মৌলিক কারণ আর্থনীতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। ইতিহাসের এই বস্তুবাদী তত্ত্ব ১৮৫৯ সালে মার্কসের লেখা (A Contribution to the Critique of Political Economy) গ্রন্থে প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে তাঁর Capital গ্রন্থে সম্প্রসারিত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে যুগ বিভাজনের কারণ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া, প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তনকে সম্পর্কিত করে দেখা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে আর্থনীতিক সূত্রের ব্যবহার করা, রাজনৈতিক ইতিহাসের তুলনায় সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাসের প্রতি অধিকমাত্রায় গুরুত্বপ্রদান, এসব হল বস্তুবাদী ইতিহাস দর্শনের বৈশিষ্ট্য। কার্ল মার্কসের প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অধিকতর মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে উৎপাদকের সম্পর্কই হল উৎপাদন-সম্পর্ক। এই সম্পর্কই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা অবকাঠামো নির্মাণ করে। এর উপর নির্ভর করে আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজ, ধর্ম, দর্শন, আইন, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক সম্পর্কের উপর উৎপাদনের উপকরণের প্রভাব পড়ে। উৎপাদনের উপায় পরিবর্তিত হলে সামাজিক সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। নেত্রকোনার একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামের মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন এবং ঢাকা শহরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন একই রকম নয়। এর কারণ উৎপাদনের উপকরণের ভিন্নতা।

ভাববাদী ইতিহাস ব্যাখ্যা সব সময় আইনকে ঐশ্বরিক বা সার্বজনীন ধারণার প্রকাশ হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদে আইনকে উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে গোত্র ও রাষ্ট্র গঠিত হয়। শাসকরা তাদের সুবিধাজনক উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন তৈরি করে। উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের দ্বারাই ইতিহাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এ অর্থে মানব-ইতিহাসের অগ্রগতির ইতিহাস বস্তুত অর্থে উৎপাদনী শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস।

কার্ল মার্কসের ইতিহাস দর্শন উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা সামগ্রিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই ব্যাখ্যা কার্যকারণিক ও আরোহী পদ্ধতির। এতে

উদ্দেশ্যবাদ বা ঐশী ভাবের প্রকাশ অনুপস্থিত। ইতিহাসের প্রত্যক্ষযোগ্য উপাদান দ্বারাই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হয়। তাই এই প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

ইবনে খালদুনের হাতে যদি ইতিহাস দর্শনের সূচনা হয় তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কার্ল মার্কসের-পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস দর্শনের ইতিহাসও দীর্ঘকালীন। কিন্তু সেখানে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী ইতিহাস দর্শন অনুপস্থিত। বেশির ভাগ ইতিহাসই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত। সে সব ইতিহাস প্রধানত রাজ-রাজড়ার ইতিহাস, গোষ্ঠীর ইতিহাস, ব্যক্তির ইতিহাস। অবকাঠামো বা সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়, বরং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই সেখানে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক। কারণ, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ঐশী ভাবের ইচ্ছার বাহন বা বাস্তবায়নকারী হিসেবে দেখতে চায়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভাবগত সত্তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়েই ইতিহাসের সৃষ্টি করে থাকে। তাই সেখানে স্বজ্ঞা হল জ্ঞানের প্রধান উৎস, স্বর্গীয় আইন হল মূল্যের অপরিবর্তনশীল বা অনপেক্ষ মানদণ্ড। কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এর জ্ঞানতত্ত্ব অভিজ্ঞতাবাদী, মূল্যতত্ত্ব বা নৈতিকতা অর্থনৈতিক-সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, তাই পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক।

কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী কোনো কোনো ইতিহাস দার্শনিকের চিন্তায় ব্যাপক বস্তুবাদী উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে চূড়ান্ত অর্থে এসব ইতিহাস বিশুদ্ধ বস্তুবাদী নয়, বরং ভাববাদী। যেমন, ইতিহাস দর্শনের প্রণেতা খোদ ইবনে খালদুনের কথাই বিবেচনা করা যাক। আমরা দেখেছি, ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমা-তে উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের ইতিহাসের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাখ্যায় সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ভৌত কারণ প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-প্রাকৃতিক এই কার্যকারণকে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট এবং ঐশী নির্দেশে চালিত বলে ব্যাখা করেছেন। রাজবংশ ঐশী বিধান অনুযায়ী শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং আরাম-আয়েশে মত্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে ঐশী বিধান অনুযায়ীই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইবনে খালদুন কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেন : "আল্লাহ বলেন, আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন সে স্থানের বিলাস-প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যায় আচরণের অনুমতি দান করি। এইরূপে বাণী সত্যে পরিণত হয় এবং আমি অবশ্যই সেই জনপদ ধ্বংস করি।" (কুরআন ১৭, ১৬ (১৭))।

ইবনে খালদুন ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যকারণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে ব্যবহার করায় তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত ইতিহাস ব্যাখ্যার নতুন ধারা তৈরি করে। কিন্তু উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতির পর এর ভাববাদী পরিণতি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এভাবে, মার্কস-পূর্ববর্তী আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁদের ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হলেও চূড়ান্ত বিচারে তাঁদের ইতিহাস ব্যাখ্যা ভাববাদী।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমরা ইতিহাস দর্শন বলতে যা বুঝি তা একটি ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি:

ইতিহাস

অতীত ঘটনার বর্ণনা — অতীত ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত (ইতিহাসের দর্শন) — দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি-নিরপেক্ষ

ভাববাদী (ইবনে খালদুন, হেগেল প্রমুখ) — বস্তুবাদী (কার্ল মার্কস)

যে ফোনালাপের উল্লেখ করে এই রচনা শুরু করেছি সে প্রসঙ্গে আবারও ফিরে আসি। এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমার প্রশ্নকর্তা এখন নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবেন যে, 'দর্শনের ইতিহাস' আর 'ইতিহাসের দর্শন' এক বিষয় নয়। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। প্রথমটি ইতিহাসের বিষয় এবং শেষোক্তটি দর্শনের বিষয়। তবে এ দুয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। তা হল, দর্শনের যেমন ইতিহাস থাকে ইতিহাসেরও তেমনি দর্শন থাকতে পারে।

তাই দর্শনের ইতিহাসেরও দর্শন থাকতে পারে। অর্থাৎ দর্শনের ইতিহাস বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত হতে পারে, আবার ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও রচিত হতে পারে।

এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত দুখানা দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থকে ইতিহাসের দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়নের ইঙ্গিত করে এ রচনা সমাপ্ত করব। এই উভয় গ্রন্থই ইংরেজি গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত। এর একখানা গ্রন্থের নাম 'গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার'। অন্যখানা 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন'। প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রধান অধ্যায় বিভাজন হল :

প্রথম অধ্যায় : গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাক্-সোফিস্ট যুগ
তৃতীয় অধ্যায় : সোফিস্ট যুগ বা তার্কিক সম্প্রদায়
চতুর্থ অধ্যায় : সক্রেটিস
পঞ্চম অধ্যায় : প্লেটো চিন্তার প্রাধান্য (ভাববাদ)
ষষ্ঠ অধ্যায় : এরিস্টটল
ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের প্রধান অধ্যায় বিভাজন নিম্নরূপ :

১. দর্শন ও দর্শনের ইতিহাসের প্রকৃতি
২. দাস যুগে দর্শন
৩. সামন্ত যুগে দর্শন
৪. পুঁজিবাদী যুগে দর্শন
৫. সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে দর্শন
৬. দর্শনের ভবিষ্যৎ

এই দুটি গ্রন্থের অধ্যায় বিভাজন থেকে মোটা-দাগে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রথমোক্ত দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থখানা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের সময় এগিয়ে গেছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এখানে ইতিহাসের নিয়ামক। অন্যদিকে শেষোক্ত গ্রন্থে ইতিহাসের নিয়ামক কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, বরং সমাজব্যবস্থা বা উৎপাদন সম্পর্ক। একই রকমের উৎপাদন সম্পর্কগত অবকাঠামো এর উপরিকাঠামো হিসেবে কীরকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-নৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার সৃষ্টি করেছে সমস্ত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা সংক্ষেপে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

আমার ফোনকর্তার পক্ষে নিশ্চয়ই এখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে অন্য যে কোনো বিষয়ের ইতিহাসের মতো দর্শনের ইতিহাসেরও দর্শন থাকে এবং রচনার আঙ্গিক পর্যবেক্ষণ থেকেও দুজন দর্শনের ইতিহাস রচয়িতার দার্শনিক অবস্থানগত পার্থক্য সনাক্ত করা যায়।

প্র ব ন্ধ

ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে– একটি মার্কসীয় অবতারণা

আ বু ল বা র কা ত

আমাদের দেশে ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি[১] এখনও পর্যন্ত স্বল্পালোচিত ক্ষেত্র হিসাবেই বিরাজ করছে। অথচ পদ্ধতিতত্ত্বের মতো বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া পর্যন্ত, ইতিহাস শাস্ত্র যে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে আমাদের দেশে ইতিহাস গবেষণায় পদ্ধতিতাত্ত্বিক উপাচার যতটুকু প্রয়োগ করা হয় তার অধিকাংশই পশ্চিমী বুর্জোয়া দর্শনাশ্রয়ী ও বিতর্কিত। আর সে ক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণায় প্রযোজ্য মার্কসীয়

পদ্ধতিতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত, অথবা নেই বললেই চলে। সুতরাং উপস্থাপিত প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হল ইতিহাস শাস্ত্রে প্রয়োগকৃত অমার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করার পাশাপাশি মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের "গুরুত্বপূর্ণ" বিষয়াদি অবতারণা করা। এখানে "গুরুত্বপূর্ণ" বিষয় বলতে এমন সব উপাদানকে বুঝানো হচ্ছে যেগুলোর অনুপস্থিতিতে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের অস্তিত্ব থাকে না, এবং সেইসাথে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের তুলনামূলক অধিকতর বিতর্কিত বিষয়াদি (পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রশ্নে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বির্তক বিদ্যমান)।

ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদির প্রতি গভীর মনোযোগ ছাড়া ইতিহাস তত্ত্বের পর্যায়ানুক্রমিক বিকাশ সম্ভব নয়। একাধারে ইতিহাস বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, অন্যদিকে সমাজের বাহ্যিক মনোযোগ ও গবেষণার উল্লিখিত দিকটির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত কয়েক দশকে ঐতিহাসিকেরা যে বিপুল পরিমাণ নবতর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার যথাযোগ্য সারসংকলন ও সাধারণীকরণ এখনও সম্ভব হয়নি বললেই চলে। আর এই বিপুল ও বহুমাত্রিক তথ্যাবলীর উপস্থিতিই তার বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধকরণ, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কাল-বিভাজন, সমাজ বিকাশের সাধারণ গতিসূত্রের বিভিন্ন রূপ ও নমুনা নির্ধারণ, জনগণের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন রূপ উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণা অনিবার্য করে তোলে। উপরন্তু, আধুনিক যুগে সচেতন জন-সাধারণের কাছেও ইতিহাস চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কারণ "বিকাশের পথ নির্ধারণের" বিষয়টি প্রথম সারির সামাজিক প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নোত্তরে সচেতন সামাজিক জীবমাত্রই অতিক্রান্ত পথ নিয়ে অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানতে চাইবেন সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা, জানতে চাইবেন বর্তমানকে অতীতের প্রিজমিক বিশ্লিষ্ট আলোকে এবং এসবের ভিত্তিতেই ভবিষ্যত বিকাশের ঝোঁক বা প্রবণতা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা পেতে চাইবেন। অথচ মার্কসবাদী ইতিহাস ধারণার বিপরীতে অমার্কসবাদী ধারণাসমূহ সচেতন জনগোষ্ঠির এ সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় (যা পরবর্তীতে দেখানো হয়েছে)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার "বর্ণনামূলক" প্রকাশ বুর্জোয়া ইতিহাস শাস্ত্রে এখনও নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রকাশের বিপরীতে বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ নির্ধারক হয়ে উঠেছে। সেইসাথে সামাজিক বিজ্ঞানের ঐ সকল শাখা-প্রশাখা অধিকমাত্রায় যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিককে ইতিহাস প্রক্রিয়ার বর্ণনামূলক প্রকাশের তুলনায় বিশ্লেষণকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে এমনতর প্রয়োজনীয় সাধারণীকরণের (এবং সংশ্লেষণের) দিকে এগুতে হবে যাতে করে আর্থ-সামাজিক বিকাশের মূর্ত (ঙনলবপঃরাব) সূত্রাদি উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

দুই

ইতিহাসের মার্কসীয় দ্বন্দ্বাত্মক-বস্তুবাদী ধারণার বিপরীতে ইতিহাস চিন্তার অমার্কসীয় ধারা একথা প্রমাণে সচেষ্ট যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বহুমুখীনতা ও বহুমাত্রিকতা উল্লিখিত প্রক্রিয়ার একত্বের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আর তাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গতি-ধর্মের কারণেই ইতিহাসকে কোনো সিস্টেমে বাঁধা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ যুক্তিতে মার্কসবাদীদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা রূপায়ণের ধারণা, যা অনুযায়ী সভ্যতার ইতিহাস হল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও তার রূপান্তরের ইতিহাস– বাস্তবসম্মত নয়। এ যুক্তিতেই অমার্কসবাদী ইতিহাস গবেষক ইতিহাসের গতিকে বক্রাকৃত বিকাশ, ঘটনার আকস্মিক মোড় পরিবর্তন ইত্যাদি নামে অভিহিত করে সাধারণ বিকাশ তত্ত্বের বিপরীতে জাতিগত ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষত্ব এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে অঞ্চলগত ঐতিহাসিক বিকাশের কথা উল্লেখ করে থাকেন। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তা নয়া-কান্টবাদ, নয়া-ধনাত্মকবাদী এগনোস্টিসিজম, অর্থনৈতিক বস্তুবাদ (বিশেষ করে প্রযুক্তিবাদ), যুদ্ধংদেহী অধ্যাত্মবাদিতা, উপাদানতত্ত্বের জগাখিচুড়িবাদ, নেমিরিজম, ক্লিওমেট্রিকস ও ইতিহাসের ধর্মভিত্তিক দর্শনবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য বিস্ফোরণ, মডেলকরণ, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ক্রিয়াবাদ ও আণুবীক্ষণিক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। ইদানিং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মতাদর্শগত সংগ্রামের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে– পরিবৃত্তি-কালপর্বের ইতিহাস। কারণ এ ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক ঐতিহাসিক বিকাশ কালের মধ্যে সীমারেখা টানতে হয়। যেমন, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সীমারেখা টানার মাপকাঠি কী হবে? অথবা, দাস, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে কোন্ মানদণ্ড ব্যবহার করে "ঐতিহাসিক যুগ" নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত? অথবা ইদানিং যে বিষয়ে অর্থনীতির ইতিহাস রচনায় বহুল বিতর্ক চলছে যে, পশ্চিম ইউরোপে কোন্ শতকে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, এবং কেন (এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং তা যথেষ্ট যুক্তিভিত্তিক)? এ সবই হল ইতিহাসতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্যতম, আর তাই মৌলিক পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি।

অমার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক বিকাশের মূর্ত রূপ স্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন না যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব, ঐতিহাসিক বিকাশ-সূত্রও তারা অস্বীকার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের সাধারণীকরণ করেন না, কারণ সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক উপসংহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যৌক্তিক ইতিহাসবাদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণে তাকে একটি সাময়িক ও

উত্তরণক্ষম কাঠামো হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বুর্জোয়া সামাজিক বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে (পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক মাত্রায় সত্য) উত্তরণহীন, অনড় আর্থ-সামাজিক কাঠামো হিসাবে গণ্য করেন।

"ইতিহাসের বিষয়বস্তু" প্রশ্নটি মার্কসবাদী-অমার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্যতম ক্ষেত্র। তবে সংজ্ঞাগত বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় যে, ইতিহাস শাস্ত্র অবশ্যই সমাজ বিকাশকে অনুশীলন করে। আর উৎপাদিকা বল ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল উৎপাদন সম্পর্কই হল শেষ বিচারে ঐ বিকাশের নিয়ামক। অর্থাৎ ইতিহাস শাস্ত্র সেই সমাজ বিকাশকে অধ্যয়ন করে যার প্রধান বিকাশ বাহন হল নির্দিষ্ট উৎপাদক পদ্ধতি (বিস্তারিত দেখুন বারকাত, ২, পৃ. ৬৭-৭১; মাহমুদ, ৯, পৃ. ১৮-৬৩)। উল্লেখ্য যে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক যদিও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও প্রাথমিক কারণ, তথাপি এ দু'টি উপাদানই সমাজ ইতিহাসের সমগ্র গূঢ় অর্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। এ প্রশ্নে মার্কসবাদীদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, আর তা হল "ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। অর্থনৈতিক অবস্থা হল ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণীকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, বিচারব্যবস্থা, এমনকি এসকল ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এই সকল বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলী, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলোর আপ্তবাক্যে পরিণতি, এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলোর গতিকে প্রভাবিত করে (তলদেশ রেখা–আ-বা) এবং বহুক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। এদের সকলের একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যথায়, পছন্দমতো ইতিহাসের যে কোনো আমল সম্পর্কে তত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রথম ঘাতের সরল সমীকরণের সমাধানের চেয়েও সহজতর হত.... (দেখুন এঙ্গেলস ৬, পৃ. ১৭৫)। সুতরাং সমাজের অতীত বিকাশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন অর্থনৈতিক ভিত্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে, তেমনি সামাজিক প্রক্রিয়ার রূপ ও আধেয় আন্তঃসম্পর্কের দ্বন্দ্বাবলীও উপেক্ষা করা যাবে না। উপরিকাঠামোর বিভিন্ন মৌলাদি ঐতিহাসিক বিকাশ নির্ধারণে নিষ্ক্রিয় নয় (মার্কসবাদীদের সমালোচনা ক্ষেত্রে অনেকেই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করে থাকেন)। উপরিকাঠামোর ভূমিকা যেমন নির্ধারিত হয় ভিত্তিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য দ্বারা, তেমনি উপরিকাঠামোও আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক বিকাশে উল্টো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। যেমন অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রশক্তি তিন ধরনের প্রভাব ফেলতে সক্ষম "রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে বিকাশ দ্রুততর হয়। রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অথবা সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে" (দেখুন এঙ্গেলস, ৬ পৃ. ১৮০)। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিকাশে অর্থনৈতিক উপরিকাঠামোর ভূমিকা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী ধারণা আদৌ সরলরৈখিক নয়। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে সমাজ বিকাশের মার্কসীয় ধারণা ও বুর্জোয়া বহুত্ববাদী ধারণা সমার্থক। বহুত্ববাদী ধারণানুযায়ী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিকাশে অন্যান্য উপাদানের মতোই অর্থনৈতিক উপাদানও সমশক্তিমান একটি উপাদান মাত্র। এই ধারণার বাহক ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস বিশ্লেষণে বহু উপাদান থেকে স্বপ্রণোদিতভাবে সেই উপাদানকে বেছে নেন যা তাঁর মতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয় এবং ফলশ্রুতিতে তিনি অধ্যাত্মবাদিতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন (দেখুন জি-ওয়াইজ, ১৮, পৃ. ৩৭)। বহুত্ববাদী পদ্ধতি প্রয়োগে ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, কারণ ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণে কোনো সুস্থিত মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় না। অথচ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অদ্বৈতবাদী দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়া গবেষণালব্ধ বিষয়ের মূর্ত ভিত্তি সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষবাদী প্রয়োগবাদী ঐতিহাসিকরা নির্দিষ্ট কালের ইতিহাসকে কোনো সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ, বিপরীতে ইতিহাস হল বিচ্ছিন্ন ও "পুনরুনুষ্ঠান অক্ষম" ঐতিহাসিক ক্রিয়াকর্মের সমাহার। শেষাবধি যা ঘটে তা হল "ঐতিহাসিকই ইতিহাসের স্রষ্টা" (সে ক্ষেত্রে ইতিহাস– বিজ্ঞান নয়)। এই ধারার ঐতিহাসিকেরা যখন বলেন যে "ইতিহাস শাস্ত্রের অবস্থান–বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির মধ্যবর্তী কোনো একখানে" তখন উক্তিটি অবশ্যই আকস্মিক নয়, তা ইতিহাস রচনার উল্লিখিত দার্শনিক ভিত্তি থেকেই উদ্ভূত। ইতিহাস গবেষণায় ঘটনার মূর্ত বিশ্লেষণের অভাবে প্রায়শ উল্লেখ করা হয় যে "অতীত ঘটনাবলীর হুবহু পুনরুৎপাদন" সম্ভব নয়। 'চরম সমালোচনা' আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাসে বহুলস্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে (দেখুন, নিসবেত, ১৪)। ইতিহাসের এই ধারায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে ছিদ্রান্বেষী সন্দেহ করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক নিদর্শন (যেমন মূর্তি বা পুরানিদর্শন), ঘটনার সন-তারিখ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক সকল উৎসের বস্তুতান্ত্রিক মূল্যায়নের সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা হয়। আর তারই ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে যে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানের সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সামাজিক বিকাশ সূত্রবদ্ধকরণ, কারণ অভিজ্ঞানটি শর্তসাপেক্ষ ও নিরঙ্কুশভাবে আপেক্ষিক। অন্যদিকে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানের "সীমাহীন আপেক্ষিকত্ব" শেষাবধি বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের সম্পর্কই তার অন্যতম পরিচায়ক। মার্কসবাদী তত্ত্বানুযায়ী পুঁজিবাদ চিরন্তন নয়, নয় তা সভ্যতা ও কৃষ্টির চরমাবস্থা। বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্ব সভ্যতার বিকাশকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সৃষ্টি করেছে। যেমন ম্যাক ওয়েবারের "আইডিয়েল টাইপ" অথবা রস্টোর "প্রবৃদ্ধির স্তরায়ন" তত্ত্ব (দেখুন, রস্টো, ১৫)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বিকল্পসূত্র অস্বীকার করা, বিকাশের বিশেষ বা অঞ্চলগত দিকটির নিরঙ্কুশায়ন ইত্যাদি প্রায়শ স্থূল জাতীয়তাবাদী ধারণার বাহক মাত্র, যা স্থূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইদানিংকালে ইতিহাসের "ইউরোপকেন্দ্রিক" আস্থাহীন ধারণাকে "এশিয়াকেন্দ্রিক" ধারণার দ্বারা প্রতিস্থাপনও একই উদ্দেশ্যে ঘটছে (এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বুর্জোয়া বাহকদের উদ্দেশ্যও তাই। দেখুন বারকাত ৪, পৃ. ২, ১৪-১৫)।

গত দুই দশকে ইতিহাসের "ছদ্মবস্তুবাদী ধারণা" বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ধারণামতে ঐতিহাসিক বিকাশ হল সামাজিক উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিকাশ অথবা বস্তুগত কৃষ্টির ক্রমবিকাশ মাত্র (অর্থাৎ "বস্তুসম্পদের ইতিহাস", দেখুন, সেইডার, ৩৮)। ইতিহাসের "ছদ্মবস্তুবাদী" ধারণানুযায়ী "মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা" প্রত্যয়টিকে হয় অস্বীকার করা হয়, অথবা এড়িয়ে চলা হয়। এভাবেই ইতিহাসকে তার সামাজিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সাধারণ বর্ণনামূলক রচনাকে তার উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এভাবেই পরিচালিত হচ্ছে ইতিহাস শাস্ত্রকে "মতাদর্শ-নিরপেক্ষ" করার সংগ্রাম।

সামাজিক বিকাশ সূত্রের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ ইদানিংকালে সমস্যাভিত্তিক সামষ্টিক গবেষণার বিপরীতে আঞ্চলিক, আংশিক, আনুবীক্ষণিক ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন (দেখুন গোর্বেট, ১১)। উল্লেখ্য যে, আনুবীক্ষণিক স্তরের ইতিহাস গবেষণা মূল্যবান, যদি তা সভ্যতার সামাজিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যথায় "ইতিহাসের জন্য ইতিহাস" রচনা "শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টির" সমার্থক। সামাজিক প্রক্রিয়ার সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে শাস্ত্রীয় মান উন্নত করে। কিন্তু পশ্চিমী-ইতিহাস শাস্ত্রে পরিমাণগত বিশ্লেষণে নিয়োজিত "ক্লিওমেট্রিকস" শাস্ত্রীয় মানোন্নয়নের পরিচয়বাহী নয়। কারণ "ক্লিওমেট্রিকস" সর্বজনীন "গণিতায়নের" মাধ্যমে যে কোনো ইতিহাস গবেষণাকে মূর্ত রূপ দিতে সচেষ্ট। বলা যেতে পারে যে, এই পদ্ধতি বুর্জোয়া ইতিহাসকে অধ্যাত্মবাদের কবল থেকে মুক্ত করার "মেকি পদ্ধতি" মাত্র। ইতিহাস শাস্ত্রে গাণিতিক পদ্ধতি ততটুকুই প্রযুক্ত হতে পারে ঐতিহাসিক উৎসের প্রকৃতি যতটুকু তা অনুমোদন করে। এই অনুমোদন বা সম্ভাবনা আদৌ অসীম নয় (দেখুন, উইলি সম্পাদিত, ১৭)। ইতিহাসে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বিধির অভিজ্ঞান ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত।

বর্ণনা অবশ্যই ইতিহাস গবেষণার প্রাথমিক ও অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু এটাও সত্য যে সবচেয়ে সৎ উৎকৃষ্ট বর্ণনাও বর্ণিত ঘটনা বা প্রক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য, তার উৎপত্তি ইতিহাস বা তার অস্তিত্বের গূঢ় অর্থ নির্ণয়ে যথেষ্ট না-ও হতে পারে। শুধুমাত্র বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা, তাদের মিল ও অমিল উদ্‌ঘাটন করা, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পৃথক করা এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার পুনরানুবৃত্তি নির্ধারণ করেই বর্ণনা থেকে সাধারণীকৃত সংশ্লেষণে পৌঁছানো সম্ভব। এটিই ঐতিহাসিক বিকাশকে সূত্রায়নের পথ।

তিন

যে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কাঠামোগত উপাদান মাত্র। উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যকে তত্ত্বগতভাবে যেমন বিকাশ-গতির অবস্থায়, তেমনি স্থির (ঝঃধঃরপ) অবস্থায়ও দেখা সম্ভব। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিময়তার সূত্র বিদ্যমান। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে যদিও বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত নির্ধারক বস্তু, তথাপি "ইতিহাস এমনভাবেই সৃষ্টি হয় যাতে চূড়ান্ত ফলাফল সর্বদা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে উদ্‌ভূত হয় এবং এই ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার জীবনের বেশ কতগুলো বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত। এইভাবে অসংখ্য পরস্পর ছেদনকারী শক্তি রয়েছে, রয়েছে শক্তির অসংখ্য সামন্তরিক ক্ষেত্রের ধারা এবং এদেরই মধ্যে থেকেই উদ্‌ভূত হয় একটি সাধারণ ফল–ঐতিহাসিক ঘটনা (তলদেশে রেখা-আ-বা)। একে আবার এমন একক একটি শক্তির সঞ্জাত ফল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা সামগ্রিক হিসাবে অচেতন ও ইচ্ছাশক্তিহীনভাবে কাজ করে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি যা যা চায় অপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে বাধা দেয় এবং ফলাফল দাঁড়ায় এমন কিছু, যা কেউই চায়নি। এইভাবে অতীত ইতিহাস একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারূপেই চলে এবং মূলত একই গতির নিয়মাবলির অধীন। যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক গঠন এবং বাহিরের, শেষ পর্যন্ত, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা (নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা বা সাধারণভাবে সমাজের অবস্থা) প্রণোদিত হয় এবং নিজ নিজ ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না বরং একটি যৌথ গড়ে, একটি সাধারণ লব্ধিতে পরিণত হয়। যার অর্থ এই নয় যে তাদের মূল্য শূন্য। বরঞ্চ লব্ধ ফলে প্রত্যেকটি ইচ্ছারই অবদান রয়েছে এবং সেই পরিমাণে সেগুলো তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৬, পৃ. ১৭৬)। পরবর্তীতে এঙ্গেলস উল্লিখিত ধারণার বিকাশ সাধন করে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতির অন্ধ ও অসচেতন শক্তির বিপরীতে "সমাজের ইতিহাস হল মানুষের ইতিহাস। যে মানুষ চেতনাসম্পন্ন। তার কর্মকাণ্ড চিন্তাপ্রবণ অথবা আবেগী। সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে সচেষ্ট। এখানে কোনো কিছুই সচেতন ইচ্ছা এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের বাইরে নয়। .....ইতিহাসের গতি তার অভ্যন্তরীণ সাধারণ সূত্রের আওতাভুক্ত" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৩২, পৃ. ৩০৬)। আর মার্কসের মতে "ইতিহাস কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয় যে তার উদ্দেশ্য সাধনে মনুষ্যশক্তিকে ব্যবহার করে। ইতিহাস হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত মানুষের কর্মকাণ্ড" (দেখুন, মার্কস, ৩৩, পৃ. ১০২)। এই কর্মকাণ্ড যৌথ প্রকৃতির। আর এ

দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ইতিহাস প্রক্রিয়ার প্রকৃত সূত্রের উৎস উদ্‌ঘাটনে যদি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করেন (যা অসঙ্গতিতে ভরপুর) সে ক্ষেত্রে তিনি আকস্মিকতার বেড়াজাল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবেন না। সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ অতীতের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করে না। সকল ঐতিহাসিক কালে যে সকল বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয়, বৃহৎ ব্যক্তিসমষ্টিকে অথবা সমগ্র দেশ, জাতিকে পরিবর্তিত করেছে। আর তাই সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক সূত্র উদ্‌ঘাটনে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ও অনুসন্ধান করতে হবে সেই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে যা বৃহৎ জনসমষ্টি ও সমাজকে গতিশীল করে তুলেছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন–এই ধারণাটি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। যেমন, গ্রীক ঐতিহাসিক ফুকিডাড মনে করতেন যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধকরণ সম্ভব, এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গ্রীক ঐতিহাসিক পলিবির মতে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি আকস্মিক নয় (দেখুন, কলিনউড, ২০, পৃ. ২৭-৩৮, বিস্তারিত দেখুন, চেরেপনিন, ২২)। আর আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক কনডোরসে (জর্জ), কোন্ট এবং পরবর্তীতে জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্পেন্সার ইতিহাস শাস্ত্রকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীতকরণে সচেষ্ট হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তা বাস্তবায়িত হয়েছে শুধুমাত্র তখনই যখন মার্কস আবিষ্কার করলেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা, যেখানে সামাজিক অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হল "মূর্ত বিকাশ সূত্র" নামক প্রত্যয়টি। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্টি হল– ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, অর্থাৎ সমাজ বিকাশের সাধারণ সূত্রাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণানুযায়ী অর্থনৈতিক মৌল কাঠামো ও উপরিকাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক, উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক পরিবেশের ওপর সামাজিক চেতনার নির্ভরতা ইত্যাদি সমাজের সমগ্র কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত, আর তাই তারা সামাজিক বিকাশের সাধারণ সূত্রের আওতাভুক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সূত্রসমূহ সকল সামাজিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের ভিত্তি, আর তাই ইতিহাসসহ সকল সামাজিক বিজ্ঞানই ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ভর করে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতো ইতিহাসও সমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয় না, তা সমগ্রের সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়েই পরীক্ষা চালায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তুলনায় ইতিহাস শাস্ত্র সামাজিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত আংশিক সূত্রাবলি অনুসন্ধান করে। এ সকল সূত্রকেই "ঐতিহাসিক সূত্র" আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এঙ্গেরসের মতে "বাহ্যিক জীবনে আকস্মিকতার খেলা চলে। কিন্তু এই আকস্মিকতা সর্বদাই অভ্যন্তরীণ, গোপন সূত্রাধীন। মূল কাজ হল ঐ সূত্রাদি উদ্‌ঘাটন করা" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৩২, পৃ. ৩০৬। ঐসকল সূত্রাদির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন প্লেটনিকভ, দেখুন, ৩১)।

সমাজে বিকাশের সাথে সাথে বিকাশের প্রধান বাহক– অর্থনৈতিক ভূমিকা সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দৃষ্টিতে দাস অথবা সামন্তবাদী সমাজের তুলনায় পুঁজিবাদী সমাজের মূর্ত বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন অপেক্ষাকৃত সহজ। আর তাই বুর্জোয়া সভ্যতায় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক শ্রেণীসমূহের বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন অপেক্ষাকৃত সহজ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কস পূর্ববর্তী বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী, যেমন গিজো, এফ. মিনিত্র এফ এবং টেরি ও ইত্যাদিরাও শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস আরো অগ্রসর হয়ে সৃষ্টি করলেন ঐতিহাসিক বিকাশের অদ্বৈতবাদী নীতি (যা পরবর্তীতে বিকাশ করেন প্লেখানভ "ইতিহাসের অদ্বৈতবাদী নীতি" পুস্তকে)। যেটা এককথায় হল নিম্নরূপ "অন্তত আধুনিক যুগের ইতিহাস গবেষণায় প্রমাণিত যে, সব ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রাম হল শ্রেণীসংগ্রাম এবং সকল ধরনের শ্রেণীসংগ্রামই সংগ্রামরতদের মুক্তির সংগ্রাম.....শেষাবধি অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম" (দেখুন, এঙ্গেলস ৩২, পৃ. ৩০৯-৩১০)। এটিই রাজনৈতিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সংক্রান্ত মার্কসবাদী ধারণার মূল কথা। অর্থাৎ মার্কসবাদী ধারণানুযায়ী রাষ্ট্র, রাজনীতি বা মতাদর্শগত সংগ্রাম কোনোটিরই ইতিহাসকে সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি বা আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয় আবার সমাজে বিকাশমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক পরিবর্তনসমূহকেও একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অমার্কসীয়। আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্বের বাহকেরা বিকাশের উল্লিখিত উপাদানসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই দেখে থাকেন। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক ইতিহাস পৃথকীকৃতভাবেই দেখা হয়, অথবা সেটাকে সামাজিক চেতনার সাথে কেউ কেউ সম্পৃক্ত করলেও অর্থনৈতিক বিকাশগত নিয়ামক মৌলকে বিশ্লেষণ-বহির্ভূত রাখা হয়। আবার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শ দেখা যায় ঐ ইতিহাস সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বহির্ভূত। অন্যদিকে মতাদর্শের ইতিহাসকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বহু দূরে রাখা হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে এসবের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, ইতিহাস-বিজ্ঞানে বাস্তব-ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলীর প্রাচুর্যের কারণে তা হয়ে গেছে অভ্যন্তরীণ অন্তরীকৃত ও বিশেষায়িত। এ যুক্তি সঠিক, কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। প্রশ্ন হল ইতিহাসের সমগ্রতা-ধারণা নিয়ে। ইতিহাসের যে কোনো বিশেষায়িত ক্ষেত্র হল সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতার অংশ, বিশেষ দিক মাত্র, তা আদৌ সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার সমগ্রতার বিশেষ কোনো অংশ বা দিকের পরমীকরণ প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করতে বাধ্য। আর এসবের অর্থ এই নয় যে, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতার কাছে দাবি করা হচ্ছে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার। দাবিটি হল এই যে, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা যেন ঐতিহাসিক সমগ্রতার অন্যান্য উপাদানকে এড়িয়ে না চলেন (বিশেষত অর্থনৈতিক উপাদানের প্রাধান্যের বিষয়টি)। অন্যথায় বিভিন্নতর আংশিক ইতিহাসের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে তার সাধারণীকরণের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ধারণাটিরও সেক্ষেত্রে বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

"পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক" হিসাবে মার্কসকে অভিহিত করে "সমাজ বিকাশের সূত্র" আবিষ্কারকেই এঙ্গেলস তার প্রধান অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। এঙ্গেলসের উক্তি অনুযায়ী "ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম (তলদেশ রেখা–আ-বা), মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আরও বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেইহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৭, পৃ. ১৬৪)।

সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক বিকাশ-সূত্রের সাথে ঐতিহাসিক সূত্রের আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নটি মার্কসবাদীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ বিকাশের সাধারণ সূত্রটি সবর্জনীন এবং তা হল "জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে-মানুষে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নির্দিষ্ট কতগুলো সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলো তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলোর সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বুনিয়াদ, যার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে।.....বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের সাথে..... বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলোর সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃংখলে। তখন শুরু হয় সমাজবিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে" (দেখুন মার্কস, ৮, পৃ. ১৩)। সমাজ বিকাশের সাধারণ সূত্রের বিপরীতে ঐতিহাসিক সূত্রের দায়িত্ব হল সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায় উল্লেখিত সাধারণ সূত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করা। আর তা করা হয়ে থাকে যে ভাবে, তা হল "একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কী চিন্তা করে, তা দিয়ে যেমন সেই ব্যক্তির বিচার কেউ করে না, তেমনি রূপান্তরের এরূপ এক কালপর্বকে তার চৈতন্য দিয়ে বিচার করা যায় না, বরং এই চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ থেকে। কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উন্নততর সম্পর্ক পুরনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলো পরিপক্ক হওয়ার আগে পুরনো সম্পর্কগুলোর স্থান গ্রহণ করে না" (দেখুন, মার্কস, ৮, পৃ. ১৩-১৪)। সোভিয়েত ঐতিহাসিক ফিদোসিয়েভ ও ফ্রান্সভ-এর মতে "সামাজিক জীবনে সংঘটিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদশগর্ত প্রক্রিয়াসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমেই গবেষক ঐতিহাসিক গতির বিশেষ দিকটি উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক সূত্রটি হল সেই ভিত্তি যা ঐতিহাসিক বিকাশে অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের ভূমিকা নির্দেশ করে। তবে ইতিহাস শাস্ত্রের কাজ হল সুনির্দিষ্ট বাস্তবক্ষেত্রে উল্লিখিত পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহের গতিময়তা বিশ্লেষণ করা" (দেখুন, ফিদোসিয়েভ ও ফ্রান্সভ, ৩০, পৃ. ১৬)।

ঐতিহাসিক বিকাশে "সাধারণ" ও "বিশেষের" দ্বন্দ্ব গবেষণার মৌলিক প্রশ্ন। বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় "সাধারণ" সর্বদায় "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য থেকে সে সকল ঐতিহাসিক তথ্য বেছে নেওয়া হয় যেগুলো "সাধারণ" অথবা প্রাকৃতিক সূত্রের আওতাধীন। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক সূত্রের ব্যবহারে অতীতের সকল বিষয়ের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দিতে সক্ষম নন। তিনি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতবেশি উপরতলা থেকে নীচের দিকে ধাবিত হন তথ্যের সাধারণীকরণ ও তাত্ত্বিক মননের ক্ষেত্রে তার স্বকীয়তার মাত্রা ততবেশি বৃদ্ধি পায়। তাই ইতিহাস বিশেষজ্ঞকে গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়েই ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির যাচাইকরণ, সূক্ষ্মতা নির্ণয় ও শ্রেণীবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সেই সাথে ঐতিহাসিককে ইতিহাস তত্ত্বীয় ঐতিহ্যে সুসজ্জিত থাকতে হয়। ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার **তুলনামূলক** বিচারে অভিজ্ঞানকে আনুভূমিক ও ঔল্লম্বিক উভয় দিকেই সমৃদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, তুলনামূলক-ইতিহাস গবেষণা ঘটনার পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনেই সীমিত নয়, তা চিন্তাকে মূর্তে উত্তরণের পদ্ধতিও। আর "সাধারণ", "বিশেষ" ও "একক"-এর দ্বান্দ্বিক সংযোগ "আংশিক" ঘটনায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার স্থানগত অথবা সময়গত বৈশিষ্ট্য এবং "সাধারণ"-এর মাধ্যমে শেষাবধি তার মূর্ত গুণগত প্রকৃতি প্রতিফলিত হয় (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে ২৯, পৃ. ১-১৪২)। "সাধারণ" "বিশেষ" ও "এককের" দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের কারণেই ইতিহাসশাস্ত্র আকস্মিক ঘটনাবলীও বিশ্লেষণ করে, কারণ তা বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অসঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ প্রবণতার অংশ।

ইতিহাসে "বিকল্প" বিকাশের প্রশ্নটি তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। মার্কসবাদী ইতিহাস-ধারণা বিরোধীদের অনেকেই উল্লিখিত "বিকল্প ধারণাটি" ইতিহাস বিকাশের সাধারণ সূত্রের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন (দেখুন, জুকভ, ২৩, পৃ. ২২)। তাদের মতে "বিকল্প" বিকাশ

প্রক্রিয়া প্রমাণ করে যে, ইতিহাস বিকাশে "আকস্মিকতা" নিয়ামকশক্তি। মূল কথা ইতিহাসে "বিকল্প" বিকাশের ধারণার পাশাপাশি আরও একটি ধারণার সংযোজন করতে হবে, তা হল বিকাশের "বহুপদী পরিবর্তীর" ধারণা। সেইসাথে মনে রাখতে হবে যে সভ্যতার বিকাশ সরল রৈখিক প্রক্রিয়া নয়, তা বহুধরনের বক্র রেখার সমাহার। 'বিকল্প' ধারণা যা বলা হয়ে থাকে তা ততবেশি পরিদৃষ্ট হয় গবেষক যতবেশি সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ার তলদেশে আনুবীক্ষণিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হন। অন্যদিকে গবেষণাধীন ইতিহাস প্রক্রিয়া যতবেশি সামষ্টিক রূপ ধারণ করে তা ততবেশি আকস্মিকতামুক্ত এবং ততবেশি সাধারণ বিকাশ সূত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং ইতিহাসের "বিকল্প" বিকাশ প্রক্রিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র সীমিত ও তা শর্তনির্ভর প্রকৃতির।

বিজ্ঞান হিসাবে ইতিহাসের ভবিষ্যত নির্ভর করছে সমাজ বিকাশের গতির সেইক্ষেত্রে যা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত। এই ক্ষেত্রটিতেই অতীত সম্পর্কিত বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারণার বৈপরীত্য প্রতিফলিত হয়। সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে রূপগত বহুত্ব পরিদৃষ্ট হয় মার্কসবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিকেরা তারই ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বিকাশ সূত্র অস্বীকার করে থাকেন। অথচ বাস্তব জগতে ঘটনা ও প্রপঞ্চের অ-পুনরানুষ্ঠান অথবা স্বাতন্ত্র্য সামাজিক বিকাশের বিশেষত্ব নয়। প্রকৃতিতেও প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অ-পুনরানুষ্ঠান আছে, আছে প্রপঞ্চের বহুধর্মিতা ও রূপ বা ধরনের বহুত্ব, অথচ তারা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সূত্রাধীনে বিকাশমান (বিস্তারিত দেখুন, দিয়াকোভ, ২৪, পৃ. ৬৬-৬৭)। মার্কসবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরল রৈখিক বা একপেশে নয়, তার সাথে ঐতিহাসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে, কখনও তার গতিকে মন্থর করতে পারে অথবা সাময়িকভাবে বিকাশের প্রধান প্রবণতা-বিরোধী হতে পারে" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৬, পৃ. ১৮০)। উল্লিখিত গতি স্বয়ংক্রিয় নয়। এ প্রশ্নে স্থূল যান্ত্রিকতাবাদের বিপরীতে মার্কসীয় ধারণানুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে সমাজব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় থাকে না; সমগ্র সমাজকাঠামোর সক্রিয়তা এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমেই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বিকাশ ঝোঁকটি আত্মপ্রকাশ করে এবং এক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে ইতিহাসের সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা–জনগণ। যেহেতু মানুষ তার অস্তিত্বের বস্তুগত শর্ত চয়নে স্বাধীন নয়; তাই তার ইতিহাস সৃষ্টি নিমিত্ত কর্মকাণ্ড যতই ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থ প্রণোদিত হোক না কেন তাই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, মূর্ত অবস্থা দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

ইতিহাসের গতি নির্ধারণকারী শক্তিসমূহ কী কী? এ প্রশ্নেও মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তৃত বিতর্ক বিদ্যমান। এমনকি মার্কসবাদীদের নিজের মধ্যেও এ প্রশ্নে ঐক্যমত নেই। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা এ প্রশ্নে বিভিন্ন সামাজিক প্রপঞ্চের উল্লেখ করে থাকেন। ক্ষেত্রগুলো হল: আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব; উৎপাদিকা শক্তি; উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা; শ্রম বিভাগ; জনগোষ্ঠি; শ্রেণী ও জনগণের দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াকলাপ; শ্রেণীসংগ্রাম; বিপ্লব; জনগণের চাহিদা ও স্বার্থ; আদর্শ ইচ্ছা ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন, ইরেমিন, ৩১, পৃ. ২২৫-২৩৬)। বিস্তৃত বিতর্কে না গিয়ে যা বলা উচিত তা হল এই যে, প্রথমত মূর্ত ও বিমূর্তের দ্বান্দ্বিক ঐক্যই ইতিহাস প্রক্রিয়ার ভিত্তি। দ্বিতীয়ত সমাজবিকাশের মূর্ত সূত্রের সাথে ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা জনগণের সচেতন কর্মকাণ্ডের আন্তঃসম্পর্কটি "স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তা" সমস্যার সাথেও সম্পর্কিত। লেনিনের মতে (নারদনিকদের সমালোচনায় উক্তি) "ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে বিনষ্ট করে না" (দেখুন, লেনিন, ২৬, পৃ. ১৫৯)। নির্দিষ্ট কাল ও স্থানে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তি, যেমন শ্রেণী, সংগঠন এবং ব্যক্তি অর্থাৎ ইতিহাস প্রক্রিয়ার ইচ্ছাধীন বিমূর্ত দিকটি ক্রমান্বয়ে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মূর্তে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ বিকাশের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সূত্রটি প্রগতিবাহী সামাজিক শক্তির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। এই সক্রিয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকে নতুনের সাথে পুরাতনের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে (স্থান ও কাল ভেদে) বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কখনও তা সরাসরি অর্থনৈতিক লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহ করে, আবার কখনও তা রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় রূপের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের "ছদ্মবেশ" ধারণ করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দিকে ধাবমান দেশে উল্লিখিত লড়াইসমূহের রূপ বিভিন্ন স্থান ও কালে যাই হোক না কেন ঐতিহাসিক বিকাশ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বিপরীতধর্মী সামাজিক শক্তির লড়াই কখনও একধাপে তার যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত হয় না। বিকাশের প্রবণতা সূত্রের বিপরীতে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই প্রবণতা-বিরোধী সূত্রও বিদ্যমান যা ঐতিহাসিকভাবে অতীত শক্তির জড়ত্বের বাহক (যে শক্তি স্বেচ্ছায় পুরাতনকে নতুন কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হতে দেয় না)। অন্যদিকে সভ্যতার ইতিহাস, বিশেষত এ শতাব্দীতে পুনঃজন্মগ্রহণকারী (কারণ আদিতে সভ্যতা ছিল আদিম সাম্যবাদের আওতাভুক্ত) ও দ্রুত বিকাশমান সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মার্কসীয় ইতিহাস ধারণার মৌলিক ভিত্তিকে সত্য প্রমাণের মাধ্যমে জগতের ভবিষ্যত বিকাশে ঐতিহাসিক আশাবাদ প্রদর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে সুসংহত করেছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী মার্কসীয় ধারণার ভিত্তিমূলক হল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ধারণানুযায়ী নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ বিচারের প্রধান মানদণ্ড হল ঐ যুগে অর্থনৈতিক বিকাশ স্তর নির্ণয় করা। সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বিকশিত (ও অবিরাম বিকাশমান) উৎপাদিকা শক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নির্ধারক উৎপাদন সম্পর্কের সমন্বয়ে গঠিত উৎপাদন পদ্ধতি আর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ধারণাটি শুধুমাত্র উৎপাদন পদ্ধতিই নয়, সেই সাথে উপরিকাঠামোর সকল উপাদানের দ্বান্দ্বিক সমাহার। সুতরাং শ্রেণীবৈপরীত্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংগঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান– এসব কিছুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ধারণার আওতাভুক্ত। আর তাই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশের অর্থ শুধুমাত্র উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশই

নয়। অন্যদিকে সমাজকাঠামোর অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যবস্থায় (ঋড়ৎসধঃরড়হ অর্থে) উত্তরণ উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলেই ঘটে। আবার ঐতিহাসিক তথ্য এ সত্যও উদ্‌ঘাটন করে যে, কখনও কখনও কোনো কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদেশী আগ্রাসনের ফলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাময়িক মৃত্যু ঘটেছে। ইতিহাসে এ ঘটনা তখনই ঘটেছে যখন বিজয়ীরা অপেক্ষাকৃত নীচুস্তরের পশ্চাদপদ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বাহক। ফলশ্রুতিতে পরাজিতদের দেশে প্রগতির বিপরীতে সাময়িক বিপর্যয় ও প্রত্যাবৃত্তি ঘটে। ঐতিহাসিক বিকাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী আগ্রাসনসহ বহিঃউপাদানের ভূমিকা বহুবিধ এবং সে সম্পর্কে মার্কস সুস্পষ্টভাবেই (উদাহরণসহ) বলেছেন যে, "বিজয়ী বিদেশী পরাজিতদের দেশে তিন ধরনের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। (যেমন বৃটিশরা আয়ারল্যান্ডে ও ভারতে পুঁজিবাদ আমদানি করে) অথবা তারা (বিজয়ীরা) পরাজিতদের বিদ্যমান পশ্চাৎপদ উৎপাদন পদ্ধতিকে অপরিবর্তিত রাখে এবং তাদের (পরাজিতদের) কর, ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদান করে বিজয়ীদের সন্তুষ্ট রাখে (যেমন তুর্কি ও রোমান বিজয়ীদের ইতিহাস), অথবা বিজয়ীরা পরাজিতদের দেশে দু'দেশে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতির একটি সংশ্লেষিত রূপ সৃষ্টি করে (যেমন অংশত জার্মানিক বিজয়ীদের ইতিহাস)" (দেখুন, মার্কস, ৩৪, পৃ. ৭২৩-৭২৪)।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুমুখী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রূপও অতিমাত্রায় ভিন্ন তাই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পঞ্চস্তরীয় তত্ত্ব (অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদ, দাস ব্যবস্থা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদ) আদৌ সন্তোষজনক তত্ত্ব নয়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা যা উল্লেখ করে থাকেন তা হল– বহু ধরনের সামন্তবাদ, বিভিন্ন রূপের দাস ব্যবস্থা ইত্যাদি (দেখুন, হরোউইচ, ১২)। আবার প্রাচ্যবিশারদ ঐতিহাসিকদের অনেকেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রাচ্যের বিশেষত্ব হিসাবে উল্লেখ করেন। যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭০-১৮৯৪ কালপর্বে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটি ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন, তথাপি মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী নির্বিশেষে অনেকেই তাদের মত প্রমাণের জন্য মার্কসের শুরুর দিকের লেখা পুস্তক-প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে থাকেন (এ বিষয়ে বিস্তৃত দেখুন, বারকাত, ৪, পৃ. ১-২৭)। তদুপরি প্রাক-পুঁজিবাদী চীনের (কারণ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সমর্থক সামাজিক বিজ্ঞানীরা চীনকেই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য করেন) গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসের প্রধান উপাদানসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে সেখানে ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো স্তরেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিস্থ উপাদানসমূহ নিয়ামক ভূমিকা পালন করেনি এবং প্রাক-পুঁজিবাদী চীনের ইতিহাস হল দাস ও তৎপরবর্তী সামন্তযুগের ইতিহাস (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, ৫, পৃ. ১১১-১৪০)। মার্কসবাদী আর্থ-সামাজিক বিকাশের পঞ্চস্তরীয় তত্ত্বের বিপরীতে বেশ কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, দাস ও সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির নয় বিধায় উভয়ে মিলে একটি "একক প্রাক-পুঁজিবাদী" আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় (দেখুন বারকাত, ৩, পৃ. ৬৩-৬৪)। উল্লেখ্য যে, সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যাবলি উল্লিখিত ধারণার সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আরো উল্লেখ্য যে "দাস উৎপাদন পদ্ধতির" ধারণাটি প্রায়শ অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে, অন্যদিকে "সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতি"র প্রশ্নে তা অতিমূল্যায়িত হয় (দেখুন নিকিফোরভ, ১৯, পৃ. ৩৫৩)। যেমন প্রাচীন গ্রীস রাজ্যের "হিলোতেস" সম্পর্ক (যার গ্রীক অনুবাদ বন্দীত্বে আবদ্ধ) অথবা পুরাকালীন আধা-দাস নির্ভরতাকে অনেকেই সামন্তবাদের বাহক হিসাবে মনে করেন। প্রকৃত বিচারে "হিলোতেস" অর্থাৎ প্রাচীন স্পার্তার ক্রীতদাস বা ভূমিদাস প্রথা দাস ব্যবস্থার চেয়েও আদিম ব্যবস্থা (দেখুন, করোভকিন, ১০, পৃ. ১৮২-১৮৮)। দাস ব্যবস্থা হল একমাত্র উৎপাদক ব্যবস্থা যেখানে প্রধান উৎপাদন–দাসকে উৎপাদনের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। আর সামন্তবাদ হল শ্রেণীবিভক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সেই স্তর একমাত্র যেখানে সরাসরি উৎপাদককে উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয় দাস ও সামন্তযুগে অর্থ-পণ্য সম্পর্কের বিকাশ অভিন্ন ফল প্রসব করে। সামন্তযুগে প্রধান শোষিত উৎপাদক শ্রেণী– কৃষকের সম্পদের কারণে ব্যবকলন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, এবং তারই ভিত্তিতে ভবিষ্যত পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হলেও তাদের মধ্যে "বিশেষ" পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাস লিখিত ইতিহাসের প্রধান বিষয়। উপরোল্লিখিত দাস ও সামন্তবাদী যুগের ইতিহাস সমস্যাকে কেন্দ্র করে বলা সম্ভব যে, প্রথমত দাস সমাজের পণ্যভিত্তিক খামার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটানোর আগে উক্তসমাজকে বহু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে আর দাস যুগের এই আদিপর্বে রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠিভিত্তিক মালিকানা ও "হিলোতেস" ধরনের আদিম শোষণ তার (দাস যুগের) আদি পর্বে অন্যান্য পর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আর শ্রেণীসমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপজাতির গোষ্ঠির সর্দার ও নেতাদের নিয়ামক সামাজিক শ্রেণীতে রূপান্তরের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সুতরাং উল্লিখিত সকল পরিবর্তনের শেষাবধি ভিত্তি অর্থনৈতিক কারণের মধ্যেই নিহিত। দ্বিতীয়ত প্রাক-পুঁজিবাদী দাস সমাজ থেকে সামন্তবাদী সমাজে উত্তরণ পর্ব উদ্‌ঘাটনে ঐতিহাসিকদের অনেকেই মার্কসবাদী ধারণার যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। যেমন ঐতিহাসিক জানেন যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ স্তরের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে অগ্রগামী। তা জেনেই ঐতিহাসিক সামন্তবাদের শুরুতে দাস যুগ অথবা প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ের তুলনায় অধিকতর বিকশিত উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করে যা উন্নত ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তর বা উত্তরণ ঘটে ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী (যদি প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয়) এবং রূপান্তরকালে সমাপ্তি ঘটে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে, উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা পরবর্তীতে মানুষের চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং তারই প্রক্রিয়ায় মানুষ

তার জীবনকে পুনর্গঠিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বিকাশমান প্রাক-পুঁজিবাদী কাঠামোতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার জীবনকাল যে কয়েকশত বছর হয়ে থাকে– সেটা স্বাভাবিক যেমন, চীনের ক্ষেত্রে দাস যুগ হল খ্রিস্ট পূর্ব ১৫ শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত, আর সামন্তযুগ–খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতক থকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত প্রাক্-পুঁজিবাদী ইতিহাসের বয়সকাল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর (বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখুন, বারকাত ৫, পৃ. ১-৩৫)। কঠোর নির্মম শ্রেণীসংগ্রাম, বর্বর জনগোষ্ঠির আক্রমণ, প্রাচীন উৎপাদন ও সংস্কৃতির শক্তি ও সংস্কৃতির বিকাশ মাত্রা দাস যুগের শেষ পর্বের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষকৃত নীচুস্তরের হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিকাশের সাধারণ সমাজ বিজ্ঞানীয় সূত্রটির বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যদি প্রাচীন যুগের উৎপাদিকা শক্তিকে প্রাচীন হিসেবে গ্রহণ না করে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়। যদি সামন্তবাদের সর্বোচ্চ বিকশিত উৎপাদিকা শক্তিকে প্রাচীন যুগের সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সাথে তুলনা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে প্রথমটির মান দ্বিতীয় অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থান করবে (প্রমাণ স্বরূপ, দেখুন, বার্নাল, ১০)।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অর্ন্তগত বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলের সম্মুখ সংঘর্ষ, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় ঐ সকল দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই। যেমন, সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা অথবা নিজেদের শোষণ পদ্ধতিকে বলপূর্বক অন্যদেশে প্রয়োগ ইত্যাদি শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অনুষঙ্গ। যেমন, যুদ্ধ বিগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের বলপ্রয়োগ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি)। ইত্যাদি হল দাস সমাজের অস্তিত্বেরই পূর্বশর্ত। (বিপরীত ধর্মী) শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাসের অধিকাংশই যুদ্ধের ইতিহাস। আর শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্রসময়টি যুদ্ধের শেষ নয়, তা শক্তির সাময়িক ভারসাম্যের লক্ষণ এবং পরবর্তী যুদ্ধে উত্তরণের প্রস্তুতিপর্ব মাত্র (কংক্রিট ইতিহাস স্মরণ করুন)। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বলপ্রয়োগ নিঃসন্দেহে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকদের স্বার্থ বহন করে এবং শেষাবধি তা অর্থনৈতিক স্বার্থেরই পরিচায়ক।

বিশ্ব ইতিহাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে "আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা" ধারণার অন্ধযান্ত্রিক অনুসরণ কাম্য হয়। কারণ প্রকৃতিতেও যখন "রাসায়নিকভাবে নির্মল" প্রক্রিয়া অনুপস্থিত, তখন সমাজের ক্ষেত্রে সেটা ততোধিক সত্য...। নির্মল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রধান চরিত্র হল সামাজিক বিকাশ বা গতির সাধারণ সূত্র ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমতা ও অসমকালীনত্ব। বহু ধরনের ইচ্ছানির্ভর ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ শক্তির কারণেই তা ঘটে। যেমন, সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের বিকাশে প্রাকৃতিক শক্তির ভূমিকা ছিল মূখ্য অর্থাৎ এ সময় বিকাশ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ অধিকতর হারে প্রকৃতির শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাকে বশ করতে শিখেছে। বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরিসরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে একই জনগোষ্ঠি বিকাশের প্রধান বাহক ছিল না। লক্ষণীয় যে, যে জনগোষ্ঠি সমসাময়িক যুগে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির বাহকের ভূমিকা পালন করছে বিকাশের প্রধান ভূমিকাও তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এমন কোনো জনগণ বা দেশের অস্তিত্ব নেই যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রগতির বাহক। ইতিহাসে জন্মসূত্রে পশ্চাদপদ অথবা জন্মসূত্রে অগ্রগামী জনগণ বা অঞ্চল বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। সভ্যতার ইতিহাসে প্রগতির অগ্নি প্রজ্বলনকারী বহু দেশ ও জাতি আজ পশ্চাদপদ, এর অর্থ এই নয় যে, এই পশ্চাদপদতা "চিরন্তন" অথবা অপূরণযোগ্য। আবার আধুনিক ইতিহাসে এমনও অনেক দেশ ও জাতির নমুনা আছে যারা আজ অগ্রসর, কিন্তু অতীতে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই সাথে তাদের অগ্রসরতার মাত্রাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন । যেমন, আধুনিক কালে হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাস। আবার এটাও সত্য নয় (যা অনেকেই বলে থাকেন) যে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেশ ও জাতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যতার প্রধানতম বাহক। যেমন, সামন্তবাদের অবক্ষয়ের ইতিহাসে প্রমাণিত যে, অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেশে জন্মগ্রহণ করেনি, তা করেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ– হল্যান্ডে। কিন্তু হল্যান্ডের বিপ্লব ইউরোপীয় ভূ-খণ্ডের বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে জয় করতে পারেনি। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু মাত্র বৃটেন ও ফ্রান্সে (শিল্পবিপ্লবের ফলে)। আবার অন্যদিকে, এককালীন বৃহৎ সামন্তবাদ দেশ পরবর্তীতে দুর্বলতম কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন স্পেনের সামন্তবাদ অথবা অটোমান সাম্রাজ্য।

"সর্বজনীনতা" প্রায়শ "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই যখন বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরলরৈখিক নয়, তখন প্রক্রিয়া-অভ্যন্তর "বিশেষ" প্রপঞ্চসমূহ বিশ্লেষণ করতে হবে। আবার যেহেতু অপেক্ষাকৃত "নির্মল" বা "সুস্পষ্ট" উপাদান বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রধান প্রবণতা নির্দেশ করে সুতরাং সেটিকেই ঐতিহাসিক বিকাশ সূত্র উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ শেষাবধি শেষোক্তটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রধান পরিচায়ক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাসে স্ফটিকী বিশুদ্ধ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না। আর তাই দাস ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই দেখা যায় আদিম অথবা সামন্তযুগের উপাদান, অথবা সামন্তবাদে দাস যুগ অথবা পুঁজিবাদের উপাদানসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, আর পুঁজিবাদে– সামন্ত ও দাস যুগের উপাদান। তাই সঙ্গত কারণেই যে কোনো ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাসেও পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে ঐ যুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্বেরই প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাস প্রক্রিয়াও সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নির্ভেজাল, একশতভাগ বিশুদ্ধ প্রতিফলন নয়। অতীত সামাজিক বাস্তবতার একশতভাগ বিশুদ্ধ প্রতিফলন ঘটানোর দায়িত্ব শুধু ইতিহাস কেন সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো শাখারই নয়।

সমাজ-সমগ্রতিক ইতিহাস– বস্তুত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপে বিকশিত হলেও সারার্থের বিচারে ভিন্নতা নেই। প্রত্যেক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই সাধারণ কিছু নির্দেশক আছে। আবার কোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই নির্ভেজাল "বিশুদ্ধ" নয়। বিভিন্ন সময় ও স্থানভেদে একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার 'রূপগত ভিন্নতা' ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত সত্য। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সর্বসাধারণের মালিকানাভিত্তিক শ্রেণী ও শ্রেণীবৈপরীত্যহীন আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে বিকশিত হয়েছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে উক্ত ব্যবস্থা থেকে পরবর্তী স্তর– দাস ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কেউ কেউ আবার দাস ব্যবস্থা না মাড়িয়েই সরাসরি সামন্তবাদে গমন করেছে। পুরাকালীন প্রাচ্যের দাস ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র এবং গ্রীক ও রোমের চিরায়ত দাস ব্যবস্থা যে একই দাস ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ তা তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যের কারণেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সামন্তবাদের ইতিহাস আরো বিচিত্র। বিভিন্ন মহাদেশে সামন্তবাদের জন্ম ও বিকাশে রূপগত ভিন্নতা তো সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি যদি শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায় তাহলেও সে ভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, জার্মান, স্পেন, ইটালি ও বৃটেনে সামন্তবাদী সমাজকাঠামো আদৌ অনুরূপ ছিল না। এমনকি সামন্তবাদী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে অনেকেই সামন্তবাদী বলে মেনে নিতে চান না, বিপরীতে তাকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত বিবেচনা করা হয় (দেখুন, মমজান, ১৩, পৃ. ৬১-৬২)। একই সামন্তবাদী কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্ত্যের কারণ কী? আসলে সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সরাসরি আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত না কি দাস ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সেটাই বহুপদী পরিবর্তীর অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর–পুঁজিবাদী স্তরেও উল্লিখিত রূপগত বহুপদী পরিবর্তীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ যদিও সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও সামন্তপ্রতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের গুরুত্ব হ্রাস করে কিন্তু সামন্তবাদের প্রতিভূ হিসাবে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও হাউস অব লর্ডস বহাল থেকে যায়। অন্যদিকে বৃটেনের তুলনায় ফ্রান্সে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে বুর্জোয়াদের সাথে সামন্ত রাজতন্ত্রের সম্মুখ সংঘর্ষে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে)। আর বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে– সামান্তবাদের অনুপস্থিতিতে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নেই নয় উপরিকাঠামোগতভাবেও একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বিভিন্ন রকমের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি বিরাজমান। যেমন কোথাও তা রাজতন্ত্র, কোথাও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, কোথাও আবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আবার কোথাও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। আবার বুর্জোয়া মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখিত বহুপদী পরিবর্তীর বিস্তৃতি অন্যসবকিছুর তুলনায় অধিকমাত্রায়।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম-বিকাশ-ধ্বংসের ইতিহাস বিভিন্ন। এদিক থেকে প্রথম শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা– দাস ব্যবস্থার জন্ম-ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাধারণভাবে "সামাজিক বিপ্লব" বলতে যা বুঝানো হয়ে থাকে দাস যুগের জন্ম ইতিহাসে তার অস্তিত্ব কতটুকু? দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ায় প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ– দাস সমাজ জন্মগ্রহণ করেছে। আদিম সমাজের ভাঙন ও সামাজিক উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে পদানত করে যে দাস-সমাজ আবির্ভূত হয়েছে সেখানে "বিপ্লবীদের" ভূমিকা কী– এ প্রশ্নে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে। আদিম সমাজের দাস সমাজে রূপান্তরে "সামাজিক বিপ্লবের" ভূমিকা যাই হোক না কেন, উল্লিখিত রূপান্তরের ফলেই ভেঙে পড়েছে লক্ষ কোটি বছরের অনড় অবস্থা। তা সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রযাত্রা, কারণ তা সর্বোপরি মনুষ্য শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে উৎপাদিকা শক্তির অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করেছে। ঠিক এ প্রসঙ্গটিকেই সুস্পষ্ট করে এঙ্গেলসের ভাষ্য হল, "শুধুমাত্র দাস সমাজই কৃষি ও শিল্পের শ্রমবিভাজনের বিস্তৃতি সম্ভব করে প্রাচীন সভ্যতার– গ্রীক সভ্যতার সংস্কৃতি বিকাশের শর্ত সৃষ্টি করেছে। দাস ব্যবস্থা ছাড়া গ্রীক রাষ্ট্র, গ্রীক কৃষ্টি ও গ্রীক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। দাস ব্যবস্থা ছাড়া রোমক সাম্রাজ্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর গ্রীক ও রোম কর্তৃক সৃষ্ট ভিত্তি ছাড়া আধুনিক ইউরোপের অস্তিত্ব নেই" (দেখুন, এঙ্গেলস, ৩৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬)।

একটি শ্রেণীবিভক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে অন্য একটিতে উত্তরণ নিঃসন্দেহে ব্যাপক জনগোষ্ঠির ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-দুদর্শার সাথে সম্পৃক্ত। দাস সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষ শিকারের একটি ব্যাপক সংগঠিত পদ্ধতি ছাড়া কল্পনাতীত। দাস যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক শোষণপদ্ধতিভিত্তিক সামন্তবাদী ব্যবস্থার সমগ্র যুগটিই শ্রেণীসংগ্রামের যুগ এবং সরাসরি উৎপাদকদের যে কোনো বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমনের যুগ। পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের যুগ– অমানবিক শোষণের যুগ (যার ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যাবে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে, প্রথম খণ্ডের, ২৪ তম অধ্যায়ে)। সামাজিক প্রগতির তৎকালীন বাহক পুঁজিবাদ– ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে এবং নাম না-জানা অগণিত মানুষের হাড়গোড়ের বিনিময়ে নির্মাণ করেছে দানবিক উৎপাদিকা শক্তি (ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসও তার সাক্ষ্য, দেখুন- বারকাত, ২, পৃ. ৮৮)।

ঐতিহাসিক যা উদ্‌ঘাটন করেন তা হল সুনির্দিষ্ট বিকাশ গতি ও গতিসূচক উপাদানসমূহ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার তুলনায় ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণাধীন কালপর্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং তা ততদূর বিস্তৃত যতদূর বিস্তৃত হলে উল্লিখিত গতির জন্ম থেকে শুরু করে গতিকে সূত্রবদ্ধকরণ সম্ভব, আর এই গতিসূত্রবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রায়শ

যৌক্তিকভাবেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে, তা হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালের পার্থক্য সূচনাকারী ধারণা "ঐতিহাসিক যুগ।"

"ঐতিহাসিক যুগ" ধারণাটির পদ্ধতিগত মূল্য প্রধানত সেখানেই যে, তা ঐতিহাসিক কাল বিভাজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। আজকের যুগের অধিকাংশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রত্যয়টি ঐতিহাসিক যুগ বিভাজনের ভিত্তি নয়। কারণ, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন প্রকৃতির, একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অন্যটিতে রূপান্তরের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো সময়কালের উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব যখন সারা বিশ্বে একই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিরাজমান ইত্যাদি। "ঐতিহাসিক যুগ" বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে লেনিনের অবদান। লেনিনের মতে "বৃহৎ ঐতিহাসিক যুগে অংশের গতি কখনও বা সম্মুখে, কখনও বা পিছনে, সেই গতি–গতির গড় নমুনা ও গড় হারের সাথে পার্থক্যযুক্ত। নির্দিষ্ট যুগে আংশিক ঐতিহাসিক গতি কত দ্রুত ও কত সাফল্যের সাথে বিকশিত হচ্ছে তা আমরা জানতে পারব না। তবে আমরা অবশ্যই জানতে পারি এবং জানি যে, নির্দিষ্ট যুগের প্রধান বাহক, কোন শ্রেণী ঐ যুগের কেন্দ্রে অবস্থান করছে–বিভিন্ন দেশের খণ্ডিত ইতিহাসের বিপরীতে নির্ধারণ করতে হবে বিভিন্ন "যুগের" পার্থক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই যে কোনো দেশের সুগভীর বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হতে পারে" (দেখুন, লেনিন, ২৭, পৃ. ১৪১-১৪২)। সুতরাং "ঐতিহাসিক যুগ" সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণা শেণীদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং "যুগের" সীমারেখা আন্তর্জাতিক। "ঐতিহাসিক যুগ" সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে লেনিন কর্তৃক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। লেনিনের মতে ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ হল "দুই গ্রুপ বৃহৎ শক্তি কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি চালু রাখার ফলাফল। সাম্রাজীবাদী যুগের সকল সম্পর্ক থেকে তা উদ্‌ভূত ও জীবনীশক্তিপ্রাপ্ত। ঐ একই যুগ আবার জাতিগত নির্যাতন-বিরোধী রাজনীতি ও বুর্জোয়া-বিরোধী সর্বহারা রাজনীতির জন্মদান করে এবং তাতে শক্তি সঞ্চার করে। আর সেখান থেকেই, প্রথমত বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ও গণযুদ্ধ; দ্বিতীয়ত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার যুদ্ধ ও বিদ্রোহ; তৃতীয়ত উভয়বিধ বিপ্লবী যুদ্ধের ঐক্য, ইত্যাদি– সম্ভব ও অনিবার্য হয়ে ওঠে" (দেখুন, লেনিন, ২৮, পৃ. ১৩৪-১৩৫)।

আদিম, দাস, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ– সভ্যতার বিকাশের পাঁচটি বৃহৎ পর্ব। সেইসাথে এগুলোই ইতিহাস শাস্ত্রের গবেষণার বিষয়বস্তু। উল্লিখিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের একটিতে অন্যটির বৈপ্লবিক রূপান্তরই বিকাশের সাধারণ সমাজবিজ্ঞানীয় গতিধারা। বাস্তব ইতিহাস গবেষণার অভিজ্ঞতা তার সাক্ষ্য বহন করে। "কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন-নতুন উন্নততর সম্পর্ক পুরনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলো পরিপক্ক হওয়ার আগে পুরনো সম্পর্কগুলোর স্থান দখল করে না" (দেখুন, মার্কস, ৮, পৃ. ১৩-১৪)। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাসের কথা নয়, বলা হচ্ছে বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যদিও দাস সমাজ ব্যবস্থা– প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থা, তথাপি সকল দেশ ও জনগোষ্ঠিকে এই ব্যবস্থার আওতায় জীবনধারণ করতে হয়নি। ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই দাস সমাজ থেকে নয়, পুরাকালীন গোষ্ঠি-উপজাতিভিত্তিক শ্রেণীহীন সমাজের সরাসরি উত্তরণ ঘটেছে সামন্তবাদে। এসকল উদাহরণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে একটির অপরটিতে রূপান্তরের ঐতিহাসিক সূত্রের সাথে আদৌ অসঙ্গতি-পূর্ণ নয় (অনেকেই উল্টোটা মনে করেন)। সম্ভবত যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দাস আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জীবনশক্তিহীনতা প্রমাণিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সামন্তবাদী সম্পর্কেরও উদ্ভব ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে জার্মান উপজাতিদের সামন্তবাদে গমনের ইতিহাস। দাসভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের পতনে জার্মান উপজাতিদের যথেষ্ট ভূমিকা সত্ত্বেও-বিশ্বপরিসরে দাস ব্যবস্থার জীবনশক্তি নিঃশেষিত হবার কারণেই জার্মানরা দাস ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিকশিত না হয়েই সরাসরি সামন্তবাদে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং পশ্চাদপদ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের কেউ কেউ যে সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের জয়ের বর্তমান ঐতিহাসিক যুগে পুঁজিবাদের সকল যন্ত্রণা এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে সক্ষম সেটা তাত্ত্বিক ও বাস্তব ঐতিহাসিক উদাহরণ উভয় দৃষ্টিতেই প্রমাণিত সত্য।

চার

মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিপরীতে অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিভিন্ন ধারা-উপধারানুযায়ীঃ

– নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সমসাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জটিল প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নয় অর্থাৎ অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রকের ধারণা (ডযড়ষরংঃরপ পড়হপবঢ়ঃ) স্বীকৃত নয়। ইতিহাস হল বিচ্ছিন্ন ও পুনরুনুষ্ঠান অক্ষম ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সমাহার। মাইক্রোপ্রক্রিয়ার ইতিহাসকে ঐতিহাসিক সমগ্রক থেকে বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগহীন প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সে ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তা হল "ঐতিহাসিকই ইতিহাসের স্রষ্টা" যা আদৌ বস্তুতান্ত্রিক বা বিজ্ঞানসম্মত নয়;

– ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ, তাই তাকে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। ইতিহাসকে তার সামাজিক সত্তা "সচেতন মানুষের কর্মকাণ্ড" থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা হয়;
– যেহেতু "অতীত ঘটনার হুবহু পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়" অথবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান "নিরঙ্কুশভাবে আপেক্ষিক" তাই ইতিহাস রচনার উৎস সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষী সন্দেহ প্রকাশ করা হয়;
– ঐতিহাসিক তথ্য, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার প্রধান প্রকাশ বাহন– "সাধারণ বর্ণনা"। সুতরাং উক্ত প্রক্রিয়ার সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, আর তাই ঐতিহাসিক বিকাশের মূর্ত সূত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়;
– যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত সমাজকাঠামো, বিশেষত পুঁজিবাদ– অনড় ও উত্তরণহীন সমাজ কাঠামো, তাই তার ইতিহাসও অনুরূপ– অনড় ও উত্তরণহীন; এবং
– ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো (বা তার সুনির্দিষ্ট উপাদান) হয় সমশক্তিমান উপাদান মাত্র অথবা শেষোক্তটি প্রথমটির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দিকনির্দেশক।

অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিপরীতে মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তায়:
– নির্দিষ্ট কালে নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস হল সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস, যার উত্থান, বিকাশ ও পতন সুনির্দিষ্ট সূত্রাধীনেই ঘটে থাকে এবং সূত্রটির দ্বান্দ্বিক যোগসূত্র হল এই যে তা একাধারে মূর্ত (ঙনলবপঃরাব) এবং অন্যদিকে ইতিহাসের প্রকৃত সামাজিক সত্তা হল "সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত মানুষের যৌথ প্রকৃতির কর্মকাণ্ড"। আর এই ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতিতাত্ত্বিক ভিত্তি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অর্থাৎ সমাজ বিকাশের সাধারণ সূত্রাবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বান্দ্বিক ঐক্য ও সংঘাতই সুনির্দিষ্ট সমাজ ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য;
– বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত নিয়ামক শক্তি। অর্থাৎ রাষ্ট্র, রাজনীতি ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ইতিহাসকে সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি বা আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। এই বিচ্ছিন্নতা আংশিক ইতিহাসের সাধারণীকরণ সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে ইতিহাস বিকাশের সূত্রসৃষ্টিকে অসম্ভব করে তোলে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশ মাত্রাই হল সেই প্রাথমিক ভিত্তি যার উপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা। যেহেতু মানুষ তার অস্তিত্বের বস্তুগত শর্ত চয়নে স্বাধীন নয়, তাই তার ইতিহাস সৃষ্টি নিমিত্ত কর্মকাণ্ড যতই ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থ প্রণোদিত হোক না কেন তা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, মূর্ত অবস্থা দ্বারাই নির্ধারিত হয়;
–উপরিকাঠামোর বিভিন্ন মৌল ঐতিহাসিক বিকাশ নির্ধারণে নিষ্ক্রিয় নয়, তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার রূপ নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা রাখতে সক্ষম;
– ঐতিহাসিক বিকাশের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সূত্রটি প্রগতিবাহক সামাজিক শক্তির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। এই সক্রিয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকে নতুনের সাথে পুরাতনের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এবং তা স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আবার বিকাশের প্রবণতা সূত্রের বিপরীতে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই প্রবণতা-বিরোধী সূত্রও বিদ্যমান যা ঐতিহাসিকভাবে অতীত শক্তির জড়ত্বের বাহক, যে শক্তি স্বেচ্ছায় পুরাতনকে নতুন কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হতে বাধা প্রদান করে;
– বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় "সাধারণ" ও "সর্বজনীন" সর্বদাই "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে "বিশেষ" প্রপঞ্চসমূহ বিশ্লেষিত হয়। আবার অপেক্ষাকৃত "নির্মল" "বিশুদ্ধ" উপাদান যেহেতু বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রধান প্রবণতা নির্দেশ করে সেহেতু সেটাকেই ঐতিহাসিক বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটনে প্রাধান্য দেওয়া হয়; এবং
– ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরলরৈখিক বা একপেশে নয়। আর সামাজিক গতির সাধারণ সূত্র ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমতা ও অসমকালীনত্বই বিশ্ব ইতিহাস প্রক্রিয়ার প্রধান চারিত্র। সভ্যতা বিকাশের পাঁচটি বৃহৎ পর্ব– আদিম, দাস, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানই ইতিহাস শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, কোনো সমাজব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের উন্নততর সম্পর্ক পুরনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলো পরিপক্ক হওয়ার আগে পুরনো সম্পর্কগুলোর স্থান দখল করে না। একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরবর্তী ব্যবস্থায় উত্তরণ অথবা সরাসরি তৎপরবর্তী যে কোনো ব্যবস্থায় গমনের সম্ভাবনাও ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।*

* ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত পঞ্চদশ জাতীয় ইতিহাস সম্মেলনে (২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৭) উপস্থাপিত, এবং সেখানে আলোচনার আলোকে পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত।

টীকাঃ

১. আমরা ইংরেজি "Methodology of History" কথাটির বাংলা রূপান্তর করেছি "ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব।" প্রবন্ধে ব্যবহৃত অন্যান্য পরিভাষা প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা

অদ্বৈতবাদী – monistic
অধিকাঠামো বা উপরিকাঠামো – super-strueture
অধ্যাত্মবাদিতা – subjectivism
আনুবীক্ষণিক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি – microsociological method
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা রূপায়ণ – socio-economic formation
ইতিহাসতত্ত্ব – historiography
ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব – methodology of history
উৎপাদন-পদ্ধতি – mode of production
উৎপাদিকা শক্তি বা বল – production force
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ – historical materialism
ঐতিহাসিক যুগ –historical epoch
কালবিভাজন, কালপর্বায়ন } periodization
ক্রিয়াবাদ – functionalisms
ঘটনা – event
চরম সমালোচনা/অতিসমালোচনা – hyper criticism
ছদ্মবস্তুবাদ – pseudomaterialism
নির্ণেয়বাদ – determinism
নিমিত্তবাদ – fatalism
পরমীকরণ – absolutization
পরিবৃত্তি-কালপর্ব –transitional period
প্রত্যক্ষবাদী প্রয়োগবাদ – positivistic empiricism
প্রপঞ্চ, প্রতিভাস } phenomenon
বহুত্ববাদ – pluralism
বহুপদী পরিবর্তী – multiple variant
বিজ্ঞান-ভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধকরণ – scientific classification
মতাদর্শের ইতিহাস – history of ideology
মূর্ত – objective
যৌক্তিক ইতিহাসবাদ – rational historicism
সমগ্রতা-দৃষ্টিভঙ্গী, সমগ্রতিক-দৃষ্টিভঙ্গী } wholistic view
সম্পদের কারণে ব্যবকলন – differentiation due to wealth
সুস্থিত – stable
স্থূল যান্ত্রিকতাবাদ – vulgar mechanicism

তথ্য নির্দেশ

বাংলাভাষায় রচিত, অনূদিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

১. করোভকিন, ফিওদর; পৃথিবীর ইতিাস : প্রাচীন যুগ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩
২. বারকাত, আবুল; "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি : বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান", সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪
৩. ,, ,, "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্য-গবেষণার দুই পর্ব", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৫
৪. ,, ,, "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ–

একটি মূল্যায়ন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৮৬
৫. ,, ,, প্রাক-পুঁজিবাদী চীনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
৬. মার্কস, ক, এঙ্গেলস, ফ; রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২। (ই ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, পৃ. ১৭৫-১৮০)
৭. ,, ,, রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২ (কার্ল মার্কসের সমাধিপার্শ্বে এঙ্গেলসের বক্তৃতা)
৮. মার্কস, ক; অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩
৯. মাহমুদ, আবু ; মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

১০. Bernal, J.D Science in History, Vol 1, Emergence of Science, London, Penguin Books, 1969
১১. Goubert, P. Local History, Daedalus, Cambrige (Mass), 1971, Vol 100, N.1
১২. Horowitz, J. Three Worlds of Development. The Theory and practice of International Stratification L; N. Y. 1966.
১৩. Momjan, Kh., Landmarks in History. The Marxist doctrine of Socio-economic formations, Moscow, Progress, 1980
১৪. Nisbet, P.A. Social Change and History. Aspects of the Western Theory of Development, N.Y. 1969.
১৫. Rostow W. The Stages of Economic Growth. Cambridge, Mass, 1960.
১৬. Topolski, J. Methodology of History. Warsaw, 1966.
১৭. Wiley, A (Ed). The New Economic History. Recent Papers in Methodology, N.Y. 1970.
১৮.Wise, G. American Historical Explanation. Homewood, 1973.

রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

১৯. ইলিচিয়েভ, j. d; সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক সমস্যাবলী। মস্কো : নাউকা , ১৯৭৯
(Elichev, L. F. Methodologichieskie Problemi Obsectvennikh, Nauk).
২০. কলিঙ্গউড, আর, জ, ইতিহাসের ধারণা। আত্মজীবনী। মস্কো : নাউকা, ১৯৮০
(Collingwood, R. G. Edeia Estory, Avtobeografia)
২১. কোন, ই, স, দর্শন ও ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব। মস্কো, ১৯৭৭
(Kon, E. S. Filosophia-E-Methodologi Estori)
২২. চেরেপনিন, ল, ভ, ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহ। মস্কো, নাউকা , ১৯৮১
(Cherepnin, L. V. Voprosi Methodologi Estorichiskova Essledovania).
২৩. জুকভ, ই, ম; বার্গ, ম, এ ও অন্যান্য– বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক সমস্যাবলী। মস্কো : নাউকা, ১৯৭৯
(Zukov. E. M; Barg. M. A. et-la. Theoretichiskie Problemi-Estorichiskova Processa).
২৪. দিয়াকোভ, ভ, আ, ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব : অতীত ও বর্তমান। মস্কো : নাউকা, ১৯৭৪
(Diakov, V. A. Methodologia Estroi-vi- Proslom-E-Nastaiashem)
২৫. নিকিফোরভ, ভ, ন, প্রাচ্য ও বিশ্ব-ইতিহাস। মস্কো : নাউকা, ১৯৭৭
(Nikiforov, V. N. Vostok-E-Ceomirnaaya Estoria)
২৬. লেনিন, ভ, ই, রচনা সমগ্র, খণ্ড–১ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)
২৭. ,, ,, রচনা সমগ্র, খণ্ড–২৬ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)
২৮. ,, ,, রচনা সমগ্র, খণ্ড–৩০ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)
২৯. লেনিনীয় ইতিহাসবাদ : গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্ব ও পদ্ধতি। কাজান : কাজান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬
(Leninski Estorism : Methodologia E Methodika Essledovania)

৩০. ফিদোসিয়েভ, প, ন; ফ্রানসিয়েভ, ইউ, প, "ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে"। ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান। মস্কো, ১৯৮৬
(Fidosive, P. N. Fransiev, U. P. O Razrabotke Methodologichiskikh Voprosov Estori. Estoria-E-Sociologia)
৩১. প্লেটনিকভ, ইউ, ক, (প্রধান সম্পাদক)– ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মার্কসীয়– লেনিনীয় তত্ত্ব। মস্কো, নাউকা, ১৯৮১
(Pletnikhov, U. K; Ed-Marxistsko-Leninskaya theoria Estorichiskova Processa)
৩২. মার্কস, ক ও এঙ্গেলস, ফ–মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সমগ্র। খণ্ড– ২১ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)
৩৩. ,, ,, ফ–মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সমগ্র। খণ্ড– ২ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)
৩৪. ,, ,, ফ–মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সমগ্র। খণ্ড– ১২ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)
৩৫. ,, ,, ফ–মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সমগ্র। খণ্ড– ২০ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)
৩৬. মমদ্ জিয়ান, খ, ন, (প্রধান সম্পাদক), ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ ও বিশেষের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে। মস্কো : মিস্‌ল, ১৯৭৮
(Momdzian, Kh. N; Ed Dealektia Obsivo-E-Osobinnavo Vi Estorichiskom Processa)
৩৭. মেচেদলভ, ম, প, (প্রধান সম্পাদক) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতকারী আধুনিক বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে। মস্কো : পলিটইজদাট, ১৯৮০
(Mechedlov, M. P; Ed. Kritika Sovremennikh Bourgeiosnik-E-Rerformistskik Falsifikatorov Marxisma-Leninisma)
৩৮. সেইডার, থ, "নয়া-জার্মান ইতিহাসের প্রধান প্রশ্নসমূহ"। ইতিহাস জর্নাল, মস্কো, ১৯৬৯
(Scheider, Th. Osnoviea Voprosi Novoi Nemeskol Estori)

প্র ব ন্ধ

স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা: ইতিহাসের পরিহাস দর্শন

মে স বা হ কা মা ল

বাঙালি জাতির এযাবৎকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বেদনা ও গৌরবের সময়কাল হচ্ছে ১৯৭১ – আমাদের স্বাধীনতার জন্য যে পরিমাণ অশ্রু ও রক্তের ক্ষরণ হয়েছে তা যেমন নিরবধিকাল আমাদের চক্ষুকে বাষ্পাকুল করবে, তেমনি মাঠ-ঘাটের কিষাণ-কুলি তথা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের অমিত তেজ ও অজেয় প্রতিরোধের যেসব কাহিনী বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে তা নিরন্তর আমাদের শোনাবে গণশক্তির বিক্রমের বিবরণ।[১] শ্রেণীবিভক্ত জনসমাজের প্রতিটি অংশকে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল একাত্তর, যেভাবে উথাল-পাথাল করেছিল আশা-নিরাশার দোলাচলে – তেমনটি বাংলার ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ তাই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য মাইলফলক।[২] স্বাধীনতার প্রায় চার দশক অতিক্রান্ত হতে চলল, অথচ একাত্তর সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্নের এখনো নিষ্পত্তি হল না। বাংলাদেশের বুর্জোয়া দলগুলোর প্রধান দুই শরীক এখনো স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর একক স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মত্ত। এটা বাস্তবতা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোভাগে ছিল আওয়ামী লীগ এবং সে যুদ্ধে অনুপস্থিত থেকেও একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।[৩] এ কথাগুলো যেমন ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি এ কথাটিও সত্য যে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি বিশেষত কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, সিরাজ সিকদার, কর্নেল আবু তাহেরসহ অন্যান্য বামপন্থী

নেতৃবৃন্দ পালন করেছিলেন বিশিষ্ট ভূমিকা – যা আজ অস্বীকার করার অপচেষ্টা চলছে জোরেসোরে। দেশের ভেতরে থেকে দীর্ঘ ৯ মাস প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার কাজ জনগণের সাথে থেকে করেছিলেন বামপন্থীরাই, কাজেই তাদের সেই তৎপরতা ছিল সুবিস্তৃত ও ব্যাপক। আজকের বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের মূল যে শক্তি তা সমাবেশিত হয়েছে দু'টি ধারা থেকে–উনিশ'শ বিশের দশক থেকে শুরু হওয়া কমিউনিস্ট রাজনীতির ধারাবাহিকতায় বিকশিত একটি ধারা এবং ডানপন্থী আওয়ামী লীগের মধ্যে ষাট দশক থেকে বেড়ে ওঠা র‍্যাডিক্যাল অংশের বাম রাজনীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিকশিত আরেকটি ধারা। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পৃথক এবং সাংগঠনিক রীতিতে ভিন্নতা সম্পন্ন দু'টি ধারার পরস্পরকে স্বীকৃতি দিতে ও অপপড়সড়ফধঃব করতে সময় লেগেছে ঐতিহাসিক নিয়মেই। একাত্তরে এদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন মেরুতে। তবুও নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে দেখেছেন এবং রণনীতি-রণকৌশল ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করেছেন।

দুই

স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের একাংশের মধ্যে এক ধরনের স্ববিরোধিতা আছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দাবির প্রশ্নে ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু ১৯৪২-এ তারাই আবার জার্মান ফ্যাসিবাদকে বিরোধিতা করতে যেয়ে 'জনযুদ্ধের তত্ত্বায়ন করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে ছিটকে পড়েন।[৪] সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্বযুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে ১৯৩৯ সালে তারা ডাক দিয়েছিলেন 'না এক ভাই না এক পাই'।[৫] তারাই আবার মিত্রপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানকে উপলক্ষ করে যখন বৃটিশ শাসকবর্গকে সহায়তার পথ ধরলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই জনতার কাছে প্রতিভাত হল 'রোটিকে লিয়ে কমিউনিস্ট, আওর আজাদী কী লিয়ে কংগ্রেস', –কেননা কংগ্রেস তখন পরিচালনা করছে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন।[৬] পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনকালে আমরা দেখেছি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যে কমিউনিস্ট-বামপন্থী কর্মীরা নেতৃত্ব দিলেন স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, তাদের একটা বড় অংশই আবার ষাট দশকে চীনের সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্কের জের ধরে গ্রহণ করলেন Do not hit Ayub regime ধরনের পলিসি।[৭] পরবর্তী সময়ে যদিও-বা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা বেরিয়ে এলেন এ অবস্থান থেকে এবং গড়ে তুললেন '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অগ্নিস্রোত[৮], কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে এবং '৪২-এর কংগ্রেসের মতো সে সময়ে জনমানসে নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭০-এর নির্বাচনী অনুমোদন আওয়ামী লীগের সে নেতৃত্বকে কেবলমাত্র সংহত করেছে। উল্টোদিকে, শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের মতো অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাই তখনো ভাবছেন অখণ্ড পাকিস্তানের কথা। তারা তখনো ভাবছেন 'পাকিস্তানের দুই অংশের' শ্রমজীবী মানুষের একযোগে মুক্তির কথা। 'জাতীয় সমস্যার উৎসমূল হচ্ছে উৎপাদনের উপায়গুলোর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক ব্যবস্থা'[৯]– মাও সেতুং-এর এই উদ্ধৃতির আলোকে, 'জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে, শেষ বিশ্লেষণে, শ্রেণী-সংগ্রামেরই সমস্যা'[১০] এ ধরনের তত্ত্বায়নকে যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সিনিয়র অংশটি ১৯৬০ দশকের শেষভাগ এমনকি সত্তরের গোড়াতেও ভেবেছেন 'পাকিস্তানের দুই অংশে' একযোগে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কথা। বারশো মাইলের ব্যবধান, ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুস্তর পার্থক্য এবং পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণকে তারা জাতীয়তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে হিসেবের মধ্যে নেননি। মাও সেতুং-এর মূল্যায়নকে নিজ পরিস্থিতির বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। ফলে, পাকিস্তানের অবিভাজ্যতার ভাবনা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে জাতিসমূহের ঐক্য সাধন এবং সমস্ত জনগণকে এক পরিবারে মিলিত করা, কিন্তু এটা ততক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ না জাতিসমূহের প্রত্যেকে তাদের নিজ পথ বেছে নেয়ার সুযোগ পায়' লেনিনীয় এ শিক্ষাকে তারা ভুলে গেলেন।[১১] এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল আবদুল মতিন-আলাউদ্দীন-আবুল বাসার-দেবেন শিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি) এবং কাজী জাফর আহমেদ-হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেনন-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলার সমন্বয় কমিটি।[১২] তারা ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার শ্লোগান তুলে স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তখন শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যকে অনুসরণ করে বাঙালি উঠতি ধনিক ও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করছে এবং দুই অংশের পাকিস্তানের ফ্রেম-ওয়ার্কের মধ্যেই শ্রমজীবী বাঙালির মুক্তি খুঁজছে। তবে অনিচ্ছুক পায়ে হলেও আওয়ামী লীগ যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ক্রমশ এগিয়েছে, সেভাগে সেইসাথে এগিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যদিকে সুখেন্দু দস্তিদার-মোহাম্মদ তোয়াহা-আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে যেয়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রশ্নে বাঙালির সংগ্রাম যেভাবে ক্রমশ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে পরিণত হচ্ছিল তাকে অবমূল্যায়ন করে। এভাবে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিনিয়র নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়া পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো ও পিকিংপন্থী উভয় ধারাই

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে।[১৩] জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বরং মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল ভিন্নতর। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের সাথে, বিশেষত কৃষক সমাজের সাথে, তার যে নাড়ীর যোগসূত্র ছিল তা দিয়ে মওলানা ভাসানী ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন সমাগত জনজাগরণের কথা। তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন সেই জনজাগরণের পথকে প্রশস্ত করতে–ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, আইয়ুব-পরবর্তী সময়ে দেশের ব্যাপক কৃষককে সমাগত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরী করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি পালন করেন এক অনন্যসাধারণ ও প্রায়-একক ভূমিকা। সত্তরের গোর্কির পরে বিধ্বস্ত উপকূল অঞ্চল থেকে ফিরে এসে তার কণ্ঠে আমরা তাই শুনি স্বাধিকার অর্জনের বাণী। সেই ধারাতেই তিনি ১৯৭১ সালের পহেলা জানুয়ারি টাঙ্গাইলে আয়োজন করেন 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন'।[১৪] চল্লিশের দশকে মওলানা ভাসানী ছিলেন 'পাকিস্তান' আন্দোলনের একজন বড় যোদ্ধা, দেশ বিভাজনকালে তার সংগ্রামের পথ ধরেই সিলেট অন্তর্ভুক্ত হয় 'পাকিস্তানে'। বাংলা-বিভাগোত্তরকালে তার সাধের 'পাকিস্তানে' শাসক মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি গঠন করেছিলেন জনতার (আওয়ামী) মুসলিম লীগ। 'পাকিস্তানের' মোহভঙ্গ হতে তাই তার সময় লেগেছে– পঞ্চাশের দশকে দৃপ্তকণ্ঠে 'আসসালামু আলাইকুম'[১৫] জানানোর হুঙ্কার দিলেও অন্তরে বোধহয় তখনো তা চাননি। তাই ১৯৭০-এর জলোচ্ছাসের পরেও তার কণ্ঠে শুনি 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র কথা, সত্তরে স্বাধীনতা চেয়েছেন 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র, তারপরে অবশ্য দ্রুত এগিয়েছেন স্বাধীন 'পূর্ব বাংলা' হয়ে সার্বভৌম 'বাংলাদেশে'। খেয়াল রাখা দরকার তখনো শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী নেতৃত্ব অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্নে বিভোর। তবে ভাসানী যতদিনে 'বাংলাদেশে' পৌঁছেছেন তাঁর বহু আগেই জন-চেতনায় শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে গেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছেন। তবে একাত্তরের পঁচিশে মার্চে পূর্ব বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতৃত্ব ও কর্মীদের তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধে সামিল করেছে। যারা ১৯৬৭-৬৮ থেকে স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন তারা তো প্রস্তুতই ছিলেন, অপরাপর কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ধারাগুলোও হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে তৎক্ষণাৎ সামিল হয়েছেন।[১৬] পরবর্তী সময়ে আওয়ামী নেতৃত্বের মতো মওলানা ভাসানী, মণি সিংহসহ বামপন্থীদের একাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গেছেন সাহায্য ও সহায়তার আশায়, কিন্তু তাদের বড় অংশটিই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ার কাজে সক্রিয় থেকেছেন।[১৭]

তিন

ড. আহমেদ কামাল তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের বেড়াজাল হতে মুক্তি এবং পাকিস্তান সৃষ্টিকে পূর্ব বাংলার জনগণ 'প্রতিশ্রুতি'র, 'আশা'র এবং 'ইতিহাসের এক নতুন প্রভাত' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যদিও 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অপারেশন' নামের এই দেশবিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল সুস্পষ্ট রূপরেখাবিহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের। সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও ধর্মীয় অনুভূতিকে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে 'মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বাসভূমি' সম্পর্কে এক স্বপ্ন তৈরি করেছিল। কিন্তু দেশভাগ পূর্ববাংলার জনসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অমুসলিমদের হতাশ ও অসহায় করে। অন্যদিকে জমিদারী শোষণে নিপীড়িত দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা একে গ্রহণ করে শ্রেণী ও ধর্মীয় পীড়ন থেকে মুক্তি হিসেবে, যা ছিল অভিজাত সমাজের চিন্তা-চেতনা থেকে ভিন্নতর। '৪৭-পরবর্তী বাস্তবতার রূঢ় কষাঘাত জনসাধারণের সে প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দেয়। পূর্ববাংলার কমিউনিস্টদের কাছে 'এই স্বাধীনতা মিথ্যা' বলে পরিগণিত হয়। "ভাষা-মতিন"-নামে খ্যাত, ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক জনাব আবদুল মতিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নাম। দেশের প্রথম সারির বামপন্থীনেতা ও কৃষক সংগঠক জনাব মতিন ভাষা আন্দোলন নিয়ে তার স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধটির সূচনা করেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে ভারতবর্ষে পুঁজির অনগ্রসরতা ও জাতিসত্তার বিকাশ রুদ্ধ হবার প্রসঙ্গ দিয়ে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বাঙালি জাতির ভাষাকে মুছে দেয়ার চেষ্টা। তিনি দেখিয়েছেন, পাকিস্তান অর্জনে নেতৃত্বকারী দল কিভাবে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তারই প্রেক্ষিতে ভাষা রক্ষার তাগিদে বাঙালি সচেতন ছাত্রসমাজ, জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনের সূচনা করে, যা পূর্ণতা লাভ করেছিল ১৯৫২ সালে। জনগণের এই সচেতনতার আরো বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে।

জনাব আবুল বাসার প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। তার লেখা থেকে তৎকালীন পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নের বিপরীতে ৬-দফাভিত্তিক স্বাধিকারের বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং স্বাধীনতা অর্জনের তাগিদে সংগঠিত হবার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। তিনি লিখেছেন '১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ৬-দফা কর্মসূচি উপস্থাপনের পর রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ৬-দফার আয়নার পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ স্বাধিকারের একটা বিমূর্ত ছবি দেখতে পায়। কার্যত ৬-দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬-দফা হুবহু কার্যকরী করলেও পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের শোষণের কোনও হেরফের ঘটে না। পাক উপনিবেশবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হবার একমাত্র পথ স্বাধীনতা অর্জন। লেখাটি সেই সময়

মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যেও ৬-দফার বিপরীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে মেরুকরণ যে পাক উপনিবেশবাদের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক আপোষের লাইনও ব্যর্থ হয়ে যায়'। জনাব আবুল বাসার তাঁর লেখায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী, শোষণ ইত্যাদিকে তথ্যসমৃদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে '৬-দফা হুবহু কার্যকরী করলেও পূর্ব বাংলার ওপরে পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শোষণের কোনো হেরফের ঘটে না। পাক উপনিবেশবাদের শোষণ হতে মুক্ত হবার একমাত্র পথই হল স্বাধীনতা অর্জন' এবং এই স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নয় বরং সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই অর্জন করার জন্য তিনি আহবান জানান।

মেসবাহ কামাল রচিত 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মওলানা ভাসানী' নিবন্ধটি গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, গতি-প্রবাহ, ও ফলাফল এবং ভাসানীর রাজনৈতিক অবস্থানকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ছাত্র, পেশাজীবী, শ্রমিক ও কৃষকের অংশগ্রহণে গণআন্দোলন রূপ নিয়েছিল 'জালেম ও মজলুমের' সংঘাতে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অস্বীকার, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অস্বীকৃতি, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুতকরণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি পাকিস্তানী শোষণের চিত্রকেই প্রকাশ করে। অন্যদিকে, শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত করে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনগণকে গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে। এক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর জুলুম প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচি, গভর্নর হাউস ঘেরাও এবং পরবর্তী কয়েকটি উপর্যুপরি হরতালের ফলে আন্দোলন শহর-গঞ্জসহ বিভিন্ন কলকারখানা এবং অফিস আদালতে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ শ্রেণীরাজনীতির উপাদানকে প্রভাবিত করে। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ছাত্র জনতার অবস্থান প্রশাসনকে অচল করে দেয়। যদিও শীঘ্রই সামরিক বাহিনী ঘটনাবলির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, তথাপি এই গণঅভ্যুত্থান শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিল সারাদেশে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটানোর কৃতিত্ব মওলানা ভাসানীরই প্রাপ্য।

আহমেদ কামাল তাঁর অন্য আরেকটি নিবন্ধে কৃষক আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭০-৭১) সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক গণশক্তি'র দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের (মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সেতুং চিন্তাধারা) প্রভাবে জন্ম হয়েছিল গণশক্তির। তাই পূর্ব বাংলার কৃষক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ককে গণশক্তি শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ সময়ের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের দৃষ্টি যথেষ্টভাবে আর্কষণ করেনি। সর্বোপরি, এই নিবন্ধে একটি বিপ্লবী সাপ্তাহিকীকে প্রতীকী করে পূর্ব বাংলার মার্কসীয় মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বেশ কিছু আগেই যে বামপন্থীরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ সে সময়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে রয়েছে। এরকম অন্তত ছয়টি দলিলের সন্ধান মেলে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত প্রথম দলিলটি 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচি' নামে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রণনীতি ও কর্মসূচি সংক্রান্ত দলিল। রাষ্ট্রের নাম ও মূলনীতি প্রসঙ্গে দলিলটির প্রথমেই বলা হয়: রাষ্ট্রের নাম হবে পূর্ব বাংলা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এ রাষ্ট্র হবে পিন্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা। এ রাষ্ট্র হবে সকল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বিপ্লবী একনায়কত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে শত্রুশিবিরে অন্তর্ভুক্ত কারও প্রথম দিকে কোনো ভোটাধিকার থাকবে না। এ রাষ্ট্রের একনায়কত্ব খাটবে তিন শত্রুর ওপর, অন্যদিকে জনগণের থাকবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার।' এছাড়াও বৈদেশিক সম্পর্ক, কৃষক ও কৃষিক্ষেত্র, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা, শিল্প-মালিকানা ও শ্রমিকের ক্ষেত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার এবং সামাজিক অনাচার দূরীকরণ, দেশরক্ষা-বিষয়াবলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৮ সালের মধ্যে জনগণের অন্তত একাংশের মনে শুধু স্বাধীনতার চেতনাই পল্লবিত হয়ে ওঠেনি, বরং তার পাশাপাশি শ্রেণী-শোষণ থেকে মুক্ত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় দলিলটি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' কর্তৃক ১৯৬৮ সালে গৃহীত থিসিসের অংশবিশেষ। বিপ্লবী পরিষদের এই থিসিসে ৪টি দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলার বিশাল কৃষক জনতার সাথে সামন্ত বাদের দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সাথে বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে – 'পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদে'র দ্বন্দ্বকে জাতীয় দ্বন্দ্ব' ও 'প্রধান দ্বন্দ্ব' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও এই দলিলে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে মুক্তির সংগ্রামে পরিচালিত করার কথা বলা হয়েছে।

১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত তৃতীয় দলিলটি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর এগার দফা কর্মসূচি তুলে ধরেছে। এই কর্মসূচিতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দী পুঁজির বিরোধিতা করা

হয়েছে এবং জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যাখা করা হয়েছে। এছাড়াও, আঠারো বা তদুর্ধ্ব সকল নর-নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাক-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। 'কৃষকদের হাতে জমি' এই নীতির ভিত্তিতে বৈপ্লবিক কৃষি সংস্কার, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক-বীমাসহ অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসাসমূহ জাতীয়করণ করার পাশাপাশি ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি, বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, ছাত্র ইউনিয়নের এ কর্মসূচিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিপরীতে গণসংস্কৃতিকে লালন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের ধারা প্রতিভাত হয় এই বৈপরীত্য থেকে যে, তারা যখন 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠার দাবি তুলছেন তখনো কিন্তু তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তিত হয়নি– তখনো তারা 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামেই কাজ করছেন। অবশ্য শীঘ্রই, ঐ বছরেই, স্বাধীনতা দাবির ক্ষেত্রে অগ্রণী বামপন্থী ছাত্ররা সংগঠনের নাম পাল্টে 'পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন' করেন। এরপরও অবশ্য 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামে অপর দুটি অংশ সক্রিয় থাকে (একটি পিকিং ও অন্যটি মস্কো সমর্থক)। চতুর্থ ঐতিহাসিক দলিলটি মূলত ১৯৭০ সালের ৩ নভেম্বর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভাষণ। 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন'–এটি ছিল তার ভাষণের মূল দর্শন। অত্যাচার, শোষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য, বহু পূর্বেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে পাকিস্তানের প্রতি 'আচ্ছালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন, সেকথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, দুই যুগ ধরে বাঙালির প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৯৭০ সালে দু-দফা বন্যা এবং দুটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে পূর্ব বাংলায় ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানির প্রেক্ষিতে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা তিনি বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী অপচেষ্টার প্রকাশ বলে অভিহিত করেন। মানবতাবর্জিত এই কর্মকাণ্ড পূর্ব বাংলার সাত কোটি বাঙালির জীবন-মরণ সমস্যাকেই তুলে ধরে। ভাসানী ঐ দুর্দিনে বাঙালির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার আহবান জানিয়েছেন, 'আজাদী' রক্ষার জন্য অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এই বলে যে–'আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করে যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনো চাল চালাইতে চায়, তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই, কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায়, তবে তাহাকেও তল্পি-তল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব। বাঙালি কোনোদিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না'। তাঁর ভাষণ তৎকালীন পূর্ব বাংলার দুরবস্থা চিত্রায়নের পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর এই ভাষণ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। 'ভাসানীর ১-দফা: স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক পঞ্চম দলিলটি ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র। পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই প্রচারপত্রে সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র' গড়ার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার আহবান জানান। ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাবে' ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। সেকথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেন যে, ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ তার পক্ষে রায় দিলেও দুটি রাষ্ট্র জন্ম নেয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার ঐতিহাসিক নির্বাচন এবং ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 'পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী শাসক, আমলাতন্ত্রের শাসন, শোষণ ও চক্রান্ত' থেকে মুক্ত হয়ে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। 'আপোস আলোচনার মাধ্যমে কেবলমাত্র গদি দখল করিয়া মন্ত্রী বানাইবার জন্য নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি বাঙালি জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার একক দাবিই এবারকার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে'– এই কথা উল্লেখ করে প্রচারপত্রে আরো বলা হয়, '৬-দফা ৯-দফার প্রশ্ন নহে – এই দেশের বাঙালি জনগণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চায় কিনা ভোটের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছে'। এরই পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের জন্য প্রচারপত্রটিতে ৯ জানুয়ারি ১৯৭১ টাঙ্গাইলের সন্তোষে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন' আহবান করা হয়। ১০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ' হিসেবে প্রচারপত্রে মওলানা ভাসানী বলেন:

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান– জিন্দাবাদ।
ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ রিলিফের ব্যবস্থা কর।
দুর্গতদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা কর।
গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা কর।
ইংগ মার্কিন বিদেশী সৈন্য– বাংলা ছাড়।
রাজবন্দিদের মুক্ত কর।
গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়– পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন কর।

ষষ্ঠ দলিলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেয়া। 'মওলানা ভাসানীর ১৪-দফা' শীর্ষক ঐতিহাসিক দলিলটিতে ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারি সন্তোষে অনুষ্ঠিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ কর্মসূচিটি ঢাকার পল্টন ময়দানের সমাবেশে মওলানা ভাসানী পুনর্বার উপস্থাপন করেন। এই

দলিলে ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটির পরিবর্তে 'পূর্ব বাংলা' ব্যবহার করেন। স্বাধীন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন।এতে বর্ণিত সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন, গণসংগ্রামকে বিপথে চালিত করার ষড়যন্ত্র রোধ এবং বাংলার মাটিতে গণবিরোধী শাসকদের খেতাব বর্জন, বিদেশী সৈন্য আগমনের সুযোগ না দেয়া প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিরোধ কর্মসূচি জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শেখ মুজিবুর রহমান সকল প্রকার খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করার যে ডাক দিয়েছিলেন তা প্রতিপালন, নিরস্ত্র জনগণকে হত্যার সাথে জড়িত– সামরিক প্রশাসনের নিকট দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় বন্ধ, কালোবাজারীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করতে না দেয়া, পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকে টাকা জমা না রাখা, সীমান্তের অপর পারে দ্রব্যসামগ্রী চোরাচালান না হতে দেয়া– এই বক্তব্যসমূহ অর্থনীতিতে দেশীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল। কৃষক-শ্রমিক রাজ ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বিতরণ প্রভৃতি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাস্বরূপ ছিল বলা চলে। সেদিক থেকে শোষণমুক্ত, স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত হিসেবে, মওলানা ভাসানীর ১৪-দফা প্রতিনিধিত্ব করেছে।

পাঁচ

প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং তাঁর একাধিক নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অবদান তুলে ধরেছেন, যা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৯৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যান-ধারণা, জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করে তোলা– মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেকার এই ভূমিকাগুলো তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রথম বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান, তরুণদের গেরিলা ট্রেনিং দান, স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সুতরাং বর্ষীয়ান নেতা মণি সিং-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ও একযোগে কাজ করেছে, তবুও স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের দলীয়করণের যাঁতাকলে তাদের ভূমিকাও আড়াল পড়ে গেছে।মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, এদেশে ক্ষমতাসীন শ্রেণী গড়ে তুলেছে সত্যকে অস্বীকার ও বিকৃত করার সংস্কৃতি। যথার্থ স্বীকৃতি দানে অনীহা, সংকীর্ণ মানসিকতা, স্বার্থ দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিচার, অন্যের অবদানকে খাটো করার প্রবণতা–এসব সত্যের মুখোমুখি, তিনি পাঠকদের দাঁড় করিয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। এছাড়াও, গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর কোনো কোনো নিবন্ধে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু ঘটনাপ্রবাহ এবং মুক্তিযুদ্ধের অজানা তথ্য বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য জনাব হায়দার আকবর খান রনোও তাঁর নানা নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। '৪৭-পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতির দ্বিমুখী নীতি, কমিউনিস্ট দলগুলোর ভাঙন এবং মত ও পথের দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন দলের যুদ্ধ-প্রস্তুতি, তাঁদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন লড়াইয়ের ঘটনাবলী, জনগণের সহযোগিতা এবং ভারতে অবস্থানকালে কমিউনিস্টদের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি তাঁর এক দীর্ঘ নিবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও, তিনি যেসব কমিউনিস্ট শক্তির নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে– কাজী জাফর আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি', দেবেন সিকদার-আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন 'বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি', নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন 'হাতিয়ার গ্রুপ' নামে পরিচিত মণি সিং-এর নেতৃত্বাধীন পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট গ্রুপ প্রভৃতি। একাত্তরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির অন্যতম নেতা এবং ঢাকার নিকটবর্তী নরসিংদী-শিবপুর এলাকায় প্রতিরোধের নায়ক জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক)-এর ভূমিকার কথাও, অন্যান্যের মধ্যে, তাঁর নিবন্ধে উঠে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) পাবনা শাখার ভূমিকা সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. লেনিন আজাদ। মাও-সেতুং-এর সামরিক প্রবন্ধের আলোকে, জনগণকে সংগঠিত করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এই পাবনা শাখা। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণে জাতীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে কমিউনিস্টরা বহুস্থানেই বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এধরনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা সম্ভব।
একসময়ের বাম রাজনৈতিক সংগঠক, গবেষক মুনীর মোরশেদ 'একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধ ও পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি' নিবন্ধে সর্বহারা পার্টির গঠন প্রক্রিয়ার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একাত্তরে এই পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে

সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছে তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। একই সাথে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে এই পার্টি গঠন, একাত্তরে বামপন্থীদের মধ্যে আলোচিত সমাজে বিরাজিত দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে প্রধান দ্বন্দ্বকে নির্ধারণ, প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ, সর্বোপরি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' পালন করেছে সে সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য ও চিত্র মুনীর মোরশেদ তুলে ধরেছেন।

প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা হেমন্ত সরকার একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইপিসিপি(এম.এল)-এর যশোর জেলা শাখার সশস্ত্র লড়াই-এর ওপর একটি পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরি করেছেন। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'মুক্ত অঞ্চল' সৃষ্টি এবং 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' ও 'জয় বাংলা'র মধ্যকার পার্থক্য বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আঘাত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। একাত্তরে বামপন্থীদের একাংশ যে জনগণের সহযোগিতায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং শ্রেণীশত্রু খতম একযোগে চালাতে থাকে তার বিবরণ বিধৃত হয়েছে তাঁর ঐ নিবন্ধে। মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির বক্তব্য জনগণের নিকট প্রচার, জনগণের বিক্ষোভকে রাজনীতি-সচেতনভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে রূপ দেয়া, বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন, সেনাবাহিনী গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা– এই বিষয়গুলো সহ মুক্তিযুদ্ধে ইপিসিপি (এম.এল)-এর যশোর জেলা শাখার ভূমিকা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহবায়ক জনাব খালেকুজ্জামান তাঁর 'স্বাধীনতা আন্দোলন প্রশ্নে' নিবন্ধটিতে স্বল্প পরিসরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনভাগে বিভক্ত, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীগুলোর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন– বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য, বিডিআর, পুলিশ ইত্যাদি কনভেনশনাল বাহিনীর সদস্যদের সমবায়ে গঠিত বাহিনীকে বলা হত এম.এফ (মুক্তিফৌজ); আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন, মূলত ছাত্রলীগ থেকে আগত ক্যাডারদের নিয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল বি.এল.এফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট); আর সর্বস্তরের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি মিলে যে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তার নাম ছিল এফ.এফ (ফ্রিডম ফাইটার)। এছাড়াও ছিল সিপিবি'র ক্যাডার বাহিনী। এদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জনাব খালেকুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্ন তথা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। বাঙালি উঠতি-বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের স্বার্থ সংরক্ষণকারী দল হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর আহবায়ক জনাব আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক আওয়ামী লীগের যে অংশ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাদের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছিল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বি.এল.এফ বলে উল্লেখ করেছেন; যদিও তারা রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতে পারেননি। তথাপি, বি.এল.এফ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক-আদর্শিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি অর্জনের যে আকাঙ্ক্ষা এদের ছিল, তা ব্যর্থ হয় এর ক্ষুদ্র অংশ প্রতিক্রিয়াশীল লুটেরাদের মধ্যে, ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে থেকে ভূমিকা রাখার কারণে। তারপরেও বি.এল.এফ-এর মূল অংশ বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বাধীনে এখনো জনগণের সঙ্গে একাত্ম। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহবায়ক জনাব আ.ফ.ম মাহবুবুল হক তাঁর নিবন্ধে এভাবেই বি.এল.এফ-এর জন্ম, বিকাশ, অবদান এবং বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করেছেন।

ছয়

একাত্তরে বাংলাদেশের বামপন্থীদের একটা বড় অংশই জাতীয় মুক্তির লড়াই ও শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নিরূপণ ও করণীয় নির্বাচনে সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন– বিশেষত বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের একাংশ নক্সালবাড়ি পথের[১৮] বাম-বিচ্যুতিতে পড়ে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটিকে কিছুটা হলেও উপেক্ষা করেছেন, এবং চীন-এর প্রতি অন্ধ ভক্তি তাদের প্রতারিত করেছে।[১৯] অন্যদিকে কমিউনিস্টদের আরেক অংশ মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়ার প্রতিনিধিদের জাতীয় বুর্জোয়া ভেবে তাদের সাথে সম্পর্ক নিরূপণে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তবে জনগণের জন্য এদের নিখাদ ভালোবাসা এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর বাস্তবতা– পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নির্বিকার হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন– সারা দেশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতা-কর্মীদেরকে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে সামিল করেছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তারা সে লড়াই সর্বাত্মকভাবে অব্যাহত রেখেছেন। যুদ্ধের শেষভাগে পাকিস্তানী বাহিনীর পাশাপাশি, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, এদের একাংশকে কোনো কোনো সময়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর সাথেও লড়তে হয়েছে।[২০] প্রশ্ন হল, কেন তা হল? কেন আওয়ামী লীগের সাথে বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠল না? এই যুক্তফ্রন্ট গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কোনো ভূমিকা ছিল কিনা?

সূত্র

১। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণের জন্য দেখুন মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব:), জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, জুন ২০০০ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ১৭-৫৫, ৬১-৮৮ ।
স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা ও তাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন আতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬০-৮০ ।

২। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে :
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, খণ্ড ১-১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮২ । মঈদুল হাসান, মুলধারা '৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ) ।
Talukdar Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, University Press Limited, Dhaka 1988 (Second Edition).
মেজবাহ কামাল; শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কপোতাক্ষী, ঢাকা ১৯৮৪ ।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮২ ।

৩। আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি', ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৫৮ ।
আহমেদ ছফা, 'শেখ মুজিবুর রহমান : রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তি', সম্ভাবনা, ঢাকা ১৩৯০, পৃষ্ঠা ৪-৫ ।
Md. Abdul Wadud Bhuiyan, Emergence of Bangladesh and Role of Awami League, Vikas Publishing House, New Delhi, 1982, pp 198-199.

৪। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বেশ কয়েকটি নথি রয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম হল- 'Secret Letter from R. Tottenham, Assistant Secretary to the Government of India to All Provincial Governments; ২১ এপ্রিল, ১৯৪২ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, (L/PJ/8/681); Secret Letter from E. Conron Smith, Secretary to the Government of India to All Provincial Governments and Chief Commissioners', ৮ জুন ১৯৪২ (L/PJ/8 681); 'Telegram from the Secretary of State for India to the Government of India', ৭ জুলাই, ১৯৪২, (L/PJ/8/681); and 'Telegram from the Home Department, Government of India to the Secretary of State for India', ১৯ জুলাই, ১৯৪২ (L/I/1/1116) and on 11 & 25 August (L/PJ/8/681);
'জনযুদ্ধে'র সময়কালে উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র ও সিপিআই-এর মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে চমৎকার আলোচনার জন্য দেখুন Sanjoy Bhattacharya, 'The Colonial State and the Communist Party of India, 1942-45 : A Reappraisal', South Asia Research, Volume 15, Number 1; Spring 1995, PP 48-77.

৫। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, যার কপি সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে ।

৬। R.C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Vol.3, Calcutta 1963, PP 688-90.

৭। মেসবাহ কামাল, আসাদ ও ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, বিবর্তন, ঢাকা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৯৯ ।

৮। ঐ । আরো দেখুন লেনিন আজাদ, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫৪৭-৬৫৯ ।

৯। মাও সেতুং, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মার্কিন নিগ্রোদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে বিশ্ব জনগণকে আহবান জানিয়ে বিবৃতি, বিদেশী ভাষার প্রকাশনালয়, পিকিং ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-৫

১০। ঐ ।

১১। V.I. Lenin. 'The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self Determination', Selected Works, Progress Publisher, Moscow 1971, P.160 আরো দেখুন V.G. Kiernan, 'Nationalism' Published in Tom Bottomore (Ed) A Dictionary of Marxist Thought, (Second Edition) Blackwell, Oxford, 1991, P.-396.

১২। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির দলিল 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের কর্মসূচী', পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের (পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি) থিসিস 'পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব' এবং হায়দার আকবর খান রনোর লেখা 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা' দেখুন, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৪৮ এবং ১৭৭-২০১ ।

১৩। আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৫৫৮ ।

১৪। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'ভাসানীর এক দফা, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮ ।

১৫। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা'গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর ডাক' দেখুন পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৫ ।

১৬। বামপন্থী নেতৃবৃন্দের গ্রন্থভুক্ত স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধগুলো। এ সংক্রান্ত প্রচুর তথ্যাবলী রয়েছে। আরও দেখুন মুসা আনসারী; 'বামপন্থী রাজনীতি', ড. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৮।

১৭। ঐ।

১৮। নক্সালবাড়ী পথের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বেশকিছু দলিলের জন্য দেখুন প্রদীপ বসু, "নকশাল বাড়ীর পূর্বক্ষণে : কিছু পোস্ট মডার্ণ ভাবনা", প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা, ১৯৯৮।

১৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন Mizanur Rahaman Shelly, Emergence of a New Nation in a Multipolar World : Bangladesh, University press Limited, Dhaka 1979, PP 97-108.

২০। দেখুন মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), সমাজ চেতনা, সংখ্যা ৪১, জুন ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২৫, আরো দেখুন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দলিল 'একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) যশোর জেলা শাখার ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৩০-২৪৬।

প্র ব ন্ধ

ইতিহাসের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়

য তী ন স র কা র

দুনিয়ার ইতিহাসটি জানার জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন যে-রাজা, এবং সেই রাজাকে তাঁর মন্ত্রী একটি মাত্র বাক্যে কীভাবে সেই ইতিহাস জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কৌতুক গল্পটি তো আমাদের সবারই জানা। সেই-যে রাজা পণ্ডিতদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমি দুনিয়ার ইতিহাস জানতে চাই, তোমরা সেই ইতিহাস লিখে আনো', এবং পণ্ডিতরা দশ বছরের সম্মিলিত চেষ্টায় দশ হাজার পৃষ্ঠার ইতিহাস গ্রন্থ লিখে এনে রাজার সামনে হাজির করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থের এমন বিপুল আয়তন দেখে তো রাজার চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'এত বিশাল গ্রন্থ আমি পড়ব কী করে? তোমরা এর পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে আনো...।' পণ্ডিতরা আরো দশ বছর পরিশ্রম করে যখন কয়েক শো পৃষ্ঠায় দুনিয়ার ইতিহাস লিখে আনলেন, তখন রাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ক্ষীণকণ্ঠে একান্ত দুঃখভারাক্রান্ত রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'আমি জীবনে অনেক সুখ পেয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসটিকে জেনে যেতে পারলাম না, এই দুঃখটি নিয়েই আমাকে মরতে হচ্ছে।' মন্ত্রী তখন রাজাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে,– 'আপনার দুঃখের কোনো কারণ নেই, মহারাজ। আপনার পণ্ডিতরা এতদিন ধরে এতকথা বলেও যা জানাতে পারেন নি, আমি সেই দুনিয়ার ইতিহাস এক কথায় আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। সেই ইতিহাস জেনে আপনি শান্তিতে দু'চোখ বুজতে পারবেন। এক কথায়: মানুষ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে, কিছুদিন সুখদুঃখ ভোগ করেছে, তারপর মরে গেছে– এই হল দুনিয়ার ইতিহাস।'

গল্পটি কৌতুকোদ্দীপক হলেও এর কৌতুকের আড়ালে সত্যের যে-রশ্মিটি ঝিক্‌মিক্ করছে, সেটিও নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়। মানুষের ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক কথাটিই তো বিজ্ঞ মন্ত্রীমোহদয় মৃত্যুপথযাত্রী রাজাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়ে মানুষ যে-রকম জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সংগ্রামে যেভাবে জয়ের সুখ ও পরাজয়ের দুঃখ দুই-ই ভোগ করেছে, এবং জয়ের সার্থকতা ও পরাজয়ের ব্যর্থতা দুই-ই উত্তরসূরিকে অর্পণ করে জীবনমঞ্চ থেকে যেভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে–সে-সবের অনুপুঙ্খ বিবরণই তো ইতিহাস। এভাবেই চলেছে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। সেই প্রবাহের প্রতিটি তরঙ্গ ও সকল শাখা-প্রশাখাকে নিজে চিনে নেয়া এবং অন্যকে চিনিয়ে দেয়া যে কী কঠিন কর্ম, সেটি রাজার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

এতো শুধু ইতিহাসের তথ্যের কথা। তথ্যের অন্তরালবর্তী সত্যের অনুসন্ধান আরো অনেক বেশি কঠিন। শুধু কঠিন নয়, সত্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতারকও। সত্য সকলের কাছে ধরা দেয় না। অন্তত পূর্ণ ও অখণ্ড রূপে তো ধরা দেয়ই না।

সত্য অনুসন্ধানেরই অন্য নাম 'দর্শন'। ইতিহাসের সত্যকে ভালো করে অবলোকন করা বা দেখার যে-পদ্ধতি, তা-ই 'ইতিহাসের দর্শন'। সঠিক দর্শনের আলো না-ফেললে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না, তথ্যের স্তূপেই চাপা পড়ে থাকতে হয়।

কিন্তু তাই বলে তথ্যকে বাদ দিয়ে তো ইতিহাস হয় না, ইতিহাস মানেই তথ্য; দর্শনের আলো ফেলতে হবে সেই তথ্যের ওপরই। সেই তথ্য অবশ্যই সঠিক ও নির্ভুল হতে হবে। ভুল ও বিকৃত তথ্য থেকে কোনো মতেই নির্ভুল ও প্রকৃত সত্য নিষ্কাশন করা যায় না। কাজেই ইতিহাসচর্চার জন্য তথ্যনিষ্ঠাই প্রাথমিক শর্ত।

'ইতিহাস' শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই এই তথ্যনির্ভরতার বিষয়টি নিহিত আছে। ইতিহ(এইরূপই)+আস(ছিল)=ইতিহাস। অর্থাৎ 'এই রূপই ছিল।' এক সময়ে যা ছিল বিদ্যমান, তা-ই এখন হয়েছে ইতিহাস। সেই ইতিহাস যাঁরা বিবৃত করবেন– অর্থাৎ যাঁরা হবেন ইতিহাসকার–তাঁদের অবশ্যই যা ছিল তা-ই খুঁজে বার করতে হবে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে, পরবর্তী কালে আরো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে আগেকার তথ্যের পুনর্বিচার করতে হবে, তথ্যের গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে কঠোরভাবে বস্তুনিষ্ঠ থাকতে হবে,– কোনোমতেই বিষয়ীগত বিবেচনা বা আপন পছন্দ-অপছন্দের অনুগত হলে চলবে না। প্রাচীন ভারতবর্ষে যদিও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বিষয়নিষ্ঠ ও কালনিষ্ঠ ইতিহাস রচিত হয়নি, তবু একাদশ শতকে 'রাজতরঙ্গিণী' নামক ইতিহাসগ্রন্থের রচিয়তা কহলন প্রকৃত ইতিহাসকারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন,–

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহির্ভূত।
ভূতার্থ কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥

মোদ্দা কথাটা হল: যিনি অনুরাগ বা বিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে অতীতের কথা বলতে গিয়ে সুস্থির ভাষা ব্যবহার করতে পারেন, সেই গুণবান্ মানুষই প্রশংসনীয়।

কহলনের এই কথাগুলো সকল দেশের ও সকল যুগের ইতিহাসের চর্চাকারীর জন্যই অবশ্যমান্য বিধান।

তবু, এই বিধান মান্য করলেই-যে ইতিহাসচর্চা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তা নয়। ইতিহাসের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য ইতিহাসের দর্শনের শরণ নিতে হবে। আবার সামগ্রিক 'বিশ্বদর্শন (World vie')-এর বাইরে 'ইতিহাসের দর্শন' বলে আলাদা কোনো দর্শনের-যে অস্তিত্ব নেই, সে কথাও ভুললে চলবে না। বিশ্বদর্শনে যে-রকম রূপভেদ ও শ্রেণীভেদ বিদ্যমান, ইতিহাসের দর্শনেও আছে সে-রকমই রূপভেদ ও শ্রেণীভেদ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী-নিরপেক্ষ বা সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ইতিহাসদর্শনের অস্তিত্ব নেই। আর তা নেই বলেই, আমারও-যে ইতিহাসের একটি বিশেষ দর্শনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে, সে-কথা আমি গোপন করতে চাই না। নিরপেক্ষ হবার ইচ্ছাই নেই আমার।

দুই

ভাববাদ ও বস্তুবাদ– মোটাদাগে বিভাজিত এই দু'রকম বিশ্বদর্শনের আওতাতেই ইতিহাসদর্শনের নানা ঘরানার উদ্ভব ঘটেছে। আমার পক্ষপাত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ভিত্তিক ইতিহাসদর্শনের প্রতি। ১৮৪৮ মালে মার্কস-এঙ্গেলস্-রচিত 'কমিউনিস্ট ইশ্তেহার'-এর প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিতেই ব্যক্ত হয়েছে সেই ইতিহাসদর্শনের মর্মকথা–'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।' এরপরের অনুচ্ছেদেই আছে এর ব্যাখ্যা–

"স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড্ কর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনো আড়ালে কখনো বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ-লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠন অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।"

আরো কিছু ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পাই ইশ্তেহারের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পাদটীকায়। সেখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে ইশ্তেহারে 'ইতিহাস' বলতে 'লিখিত ইতিহাস'কেই বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে–

"১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগিতিহাস (Prehistory)লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কালের সামাজিক সংগঠনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাক্স্তহাউজেন রুশদেশে জমির ওপর যৌথ মালিকানা আবিষ্কার করেন, মাউরার প্রমাণ করেন যে, সকল টিউটনিক জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজিক ভিত্তি থেকে, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে ভারত থেকে আয়র্ল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্র গ্রামগোষ্ঠীই (Village communities) সমাজের আদিরূপ ছিল কিংবা রয়েছে। গোত্রের (Gens) আসল প্রকৃত এবং উপজাতির (এঃৎরনব) সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কার এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি খুলে ধরল। এই আদিম গোষ্ঠীগুলো ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষপর্যন্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে।"

১৮৮৮ সালে ইশতেহারের ইংরেজি সংস্করণের এঙ্গেল্‌স্‌-লিখিত ভূমিকায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদভিত্তিক ইতিহাসদর্শনের মূল কথাটি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–

"ইতিহাসের প্রতিযুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান পদ্ধতি এবং তার আবশ্যিক ফল যে সামাজিক সংগঠন তাই হল একটা ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সে-যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস এবং একমাত্র তা দিয়েই এ-ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা চলে; সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির ওপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস; শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণীসংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীটি– অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।"

স্পষ্ট বোঝা যায়: ইতিহাসের পণ্ডিতি চর্চায় মার্কস-এঙ্গেল্‌সের কোনো উৎসাহ ছিল না, কিংবা দর্শনচর্চার অহেতুক আনন্দে তাঁরা ইতিহাসের দর্শনচর্চা করেননি। দুনিয়ার ব্যাখ্যার পরিবর্তনের বদলে 'দুনিয়াটাকে পরিবর্তন' করাই ছিল তাঁদের আসল লক্ষ্য। অর্থাৎ নিছক ইতিহাসচর্চা নয়, ইতিহাস সৃষ্টি। সেই ইতিহাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁদের আশু লক্ষ্য ছিল 'বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে' প্রলেতারিয়েতকে মুক্ত করা। সেই মুক্তির লক্ষ্যেই প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়েছিল তাঁদের ইতিহাসদর্শন। সেই দর্শন বলে: ইতিহাসে মানুষই মুখ্য। তবে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌ এ-ও জানতেন যে মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু আপন ইচ্ছামতো সে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না; ইতিহাসের নিয়ম জেনে সেই নিয়মের অনুবর্তিতাতেই মানুষকে ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হতে হয়। বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সেই মূল নিয়মের ধারক যে-দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ইতিহাসও সেই নিয়মেরই অধীন; 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' সহ মার্কস-এঙ্গেল্‌সের বিভিন্ন রচনায় সেই নিয়মেরই বিভিন্ন দিকের অভিব্যক্তি ঘটেছে, আমরা পেয়ে গেছি একটি সুষ্ঠু ইতিহাসদর্শন। সেই দর্শনের আলোকবর্তিকাটি হাতে না নিয়ে ইতিহাসের প্রকৃত রূপটি কোনো মতেই অবলোকন করা যাবে না, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা যাবে না, বিদ্যমান অবস্থা ও ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত বদল ঘটানো যাবে না।

তবে সেই দর্শনের আলোকবর্তিকাটি শুধু হাতে রাখলেই চলবে না। কখন, কোথায়, কীভাবে, ইতিহাসের কোন্‌ অংশে, কতদূর থেকে– সেই আলোকটির প্রক্ষেপণ ঘটাতে হয়, সে-সব বিষয়ে অবশ্যই সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। সঠিক সচেতনতা ও সতর্কতার অভাবে–এবং হাতুড়েদের হাতে পড়ে– এ-রকম একটি অসাধারণ ইতিহাসদর্শনেরও একান্ত অপপ্রয়োগ ঘটেছে। দ্বান্দ্বিকতা যে-দর্শনের অন্তঃসার, সেই দর্শনকেও যান্ত্রিকতার পাশবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে কখনো কখনো। এই দর্শনের সামগ্রিকতার সংকোচন ও অখণ্ডতার খণ্ডায়ন ঘটিয়ে অনেকেই একে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। এ-রকমটি করা অবশ্যই সংগত হয়নি। তবু, এ-রকমটি হওয়ার দায়-যে অনেকটাই মার্কস ও এঙ্গেল্‌সেরও–এ-কথা স্বয়ং এঙ্গেল্‌সই স্বীকার করে নিয়েছেন। আগেকার ইতিহাসের ব্যাখ্যা তারা ইতিহাসে অর্থনীতির ভূমিকা প্রায়-অস্বীকার করতেন বলেই মার্কস-এঙ্গেল্‌সের বিশ্লেষণে এদিকটার ওপর একটু বেশি জোর পড়ে গেছে। আর তাতেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমর্থক ও অনুসারী অনেক ইতিহাসচর্চাকারীর কাছেও-যে একটি ভুল সংকেত এসে যায়, এবং এ-রকম সংকেত প্রাপ্তদের ইতিহাসে-বীক্ষা-যে ভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে যায়–এ-বিষয়টি উপলব্ধি করে এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁর নিজের ও মার্কসের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েই ই.ব্লখের কাছে লিখিত একটি পত্রে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন:

"ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত প্রধান নিরূপক বিষয় হল বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন। এর থেকে বেশি আমি বা মার্কস কেউই বলিনি। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের এই বক্তব্যকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেন যে, অর্থনৈতিক উৎপাদনই আমাদের মূল কথা, তাহলে তিনি আমাদের কথাগুলো অর্থহীন, বিমূর্ত এবং অবাস্তব করে তুলছেন। অর্থনৈতিক অবস্থাটা নিশ্চয়ই ভিত্তি; কিন্তু উপরিতলার বিভিন্ন বিষয় যেমন শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ, তার ফলাফল, সফল যুদ্ধের পর জয়ীশ্রেণী যে সংবিধান প্রস্তুত করে সেই সংবিধান ইত্যাদি; আইনের নানারূপ এবং এমনকি যোদ্ধাদের মস্তিষ্কে সংগ্রামের নানা রিফ্লেক্‌স্‌; রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক নানা তত্ত্ব; ধর্মীয় ধ্যানধারণা, কুসংস্কার– এই সবই বহুক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারার ওপর প্রভাব ফেলে এবং তাদের আকার ও গতি নির্ধারণ করে।"

তবু, এঙ্গেল্‌সের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও সতর্কবাণীতেই-যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসদর্শনের ভুল প্রয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। ওই ইতিহাসদর্শনের নাম করেই কেউ কেউ যে ইতিহাসকে অর্থনীতিবাদের কবলগ্রস্ত করে ফেলেন, এবং অর্থনীতিকেই সর্বার্থসার করে তুলে 'উপরিতলা'র সব কিছুকেই সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন,– এমন দৃষ্টান্ত তো অনেক আছে। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তেরও কমতি নেই। মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের কথা বলে অনেকে 'উপরিতলার বিভিন্ন বিষয়'-এর ওপর এমন মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে ফেলেন যে তাতে 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা'র প্রধান নিরূপক বিষয়টিই (অর্থাৎ 'বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন') আড়ালে পড়ে যায়। আর এ-রকম নানা ধরনের ভ্রান্তিযুক্ত ইতিহাসকেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা মার্কসপন্থী ইতিহাসের নমুনা রূপে তুলে ধরে, এবং তার ওপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালায়। এর ফলে সাধারণ ইতিহাস-জিজ্ঞাসুদের মনও ভ্রান্তির কুয়াশাজালে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকে। দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদী দর্শনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে যে-সব ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোও বৃহত্তর পাঠকসমাজের দৃষ্টি অথবা মনোযোগের বাইরে থেকে যায়, প্রকৃত ইতিহাসচেতনার বিস্তৃতি ঘটতে পারে না।

সম্মিলিত সক্রিয় প্রয়াসেই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব।

তিন

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে যারা ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিল, ধনতন্ত্রের উন্মেষ লগ্নের সেই প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের ভেতর ইতিহাসচেতনা যথেষ্ট মাত্রাতেই ছিল। সামন্ততন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়ে ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার পত্তনের লক্ষ্যেই তারা তাদের সেদিনকার ইতিহাসচেতনাকে শাণিত করে তুলেছিল। তাদের সেই আশু লক্ষ্য-অনুযায়ী নতুন ইতিহাস সৃষ্টির (অর্থাৎ সমাজে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার) সঙ্গেই সঙ্গেই তারা ইতিহাসচেতনার রাশ টেনে ধরে। তখন থেকে ইতিহাসের স্থিতাবস্থাই হয় তাদের একান্ত কাম্য ও একাগ্রচিত্তে সাধনীয়। ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাদের এই রক্ষণশীলতা, স্বভাবতই, আরো বেশি উগ্র হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের যুগের বুর্জোয়ারা, বোধগম্য কারণেই, ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে। শুধু চোখ ফিরিয়ে রাখে না, ইতিহাসকে দস্তুরমতো ভয় পেতে শুরু করে। ইতিহাসের যে-দর্শন সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মের কথা বলে, স্বভাবতই ভয়টা তাদের সেই দর্শনকেই সবচেয়ে বেশি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জর্জ টম্‌সন যথার্থই বলেছিলেন,–

"ধনিক শ্রেণী আজ আর ধনতন্ত্রের অগ্রগতি বিধান করতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পিছনে পড়ে গিয়েছে। বস্তুত বহু বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে মানতেই রাজি নয়। কারণটা খুব সহজ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসন্ন ধ্বংসের বাস্তব চিত্রটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা প্রস্তুত নন। যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ধনতন্ত্র এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে ধরবার বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করে দার্শনিক ভাববাদ বা দুর্জ্ঞেয়বাদে আশ্রয় নেবার একটি মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

এমনটি না হয়ে গত্যন্তর নেই। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ছন্দটিকে মেনে নিতে হয়। সেই ছন্দটি মানলে বৈজ্ঞানিক নিয়মেই যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী, তা-ও না-মেনে পারা যায় না। আর তা মানলে তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তাবিদ্‌দের কণ্ঠেই কণ্ঠ মেলাতে হয়, ইতিহাস-ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিই-যে সঠিক পদ্ধতি তা-ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? ধনতন্ত্রের যে-ডালটির ওপর বসে থেকে বুর্জোয়া ইতিহাসকাররা ইতিহাসচর্চা করেন, সেই ডালটিকেই তাঁরা আপন হাতে কেটে দিতে পারেন কি?

পারেন না বলেই তাঁদের অন্যমতের শরণ নিতে হয়। সে-মত দার্শনিক ভাববাদের। শুধু ভাববাদের নয়, দুর্জ্ঞেয়বাদের। বস্তুনিষ্ঠ ভাববাদের কিংবা ধর্মতন্ত্রী ঈশ্বরবাদের প্রতি যে-রকম আস্থা নিয়ে প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী যুগের অনেক চিন্তাবিদ জগৎ, জীবন ও ইতিহাসের মূল্যায়ন করতেন, সে-রকম আস্থাপোষণ ও মূল্যায়ন সাম্রাজ্যবাদের যুগের বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এই যুগেই, বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর, এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসদর্শন নিয়ে মঞ্চাবতীর্ণ হলেন ওস্‌ওয়াল্ড স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬)। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরপরই স্পেংলার 'ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট' বা 'পাশ্চাত্যের অবক্ষয়' বইটি প্রকাশ করেন। পরাজিত জার্মান শাসকগোষ্ঠীকে পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়ে দিয়ে কৃত্রিম অহমিকায় স্ফীত করে তোলাই ছিল স্পেংলারের এই বইটি প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধন তো বৈজ্ঞানিক নিয়মের অনুবর্তী হয়ে (কিংবা সমাজের কোনো ধারাবাহিকতা বা বিবর্তনের নিয়ম আছে বলে স্বীকার করে নিয়েও) করা যায় না। স্পেংলারকে, তাই, আশ্রয় নিতে হয় দুর্জ্ঞেয়বাদের। তাঁকে বলতে হয় যে, ইতিহাস কতকগুলো দুর্জ্ঞেয় আকস্মিকতার সমাহার; সেই আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ব্যক্তির যেমন জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, তেমনই আছে ওই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলগুলোরও। স্পেংলারের মতে ওই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলগুলোর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অনুধাবন ও উপলব্ধিই ইতিহাসের তত্ত্ব বা দর্শন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহের যে–প্রগতিশীলতা প্রত্যক্ষ করেন, স্পেংলার তা করেন না। বরং তাঁর অভিমত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেন: উনিশ শতকে ধনতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের অবক্ষয়। স্পেংলার যুদ্ধকেই 'মানুষের চিরন্তন জীবনসত্তার প্রকাশ' বলে মনে করতেন, এবং নানা অপযুক্তি প্রয়োগ করে জার্মান জঙ্গি জাতীয়তাবাদকেই তিনি নতুন ভাবে চাগিয়ে তুলেছিলেন। এভাবে তিনি ফ্যাসিবাদীদের জন্যই দার্শনিক হাতিয়ার নির্মাণ করে দেন।

এরপর আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবি (জন্ম ১৮৮৯) যে ইতিহাসের দর্শনের প্রচার করেন তা স্পেংলারের ভাবনার ধারাবাহিকতা থেকেই সৃষ্ট। তবে স্পেংলারের থেকে টয়েনবির ভাবনার পার্থক্যও একেবারে কম নয়। স্পেংলারের ইতিহাসবীক্ষায় নৈরাশ্যবাদই প্রকট, সভ্যতার অবক্ষয় তাঁর বিবেচনায় একেবারেই অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে টয়েনবির ইতিহাসতত্ত্বের ভিত্তি অধ্যাত্মবাদ, এবং অধ্যাত্মিকতার মধ্যেই তিনি আশার আশ্বাসের সন্ধান করেন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাস-বীক্ষার ধারাবাহিক গতি ও ক্রম-প্রগতিকে অস্বীকার করেই টয়েনবি নির্মাণ করেন 'ইতিহাসের চক্রাবর্তনের তত্ত্ব'। ইতিহাসকে তিনি দেখেন কতকগুলো 'সভ্যতার বৃত্তের সমষ্টি' রূপে। টয়েনবি তাঁর সময়ে (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে) সারা পৃথিবীতে পাঁচটি সভ্যতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। সেগুলো হলো– ১. পাশ্চাত্য জগৎ, ২. পূর্ব ইউরোপের সনাতনী খ্রিস্টীয় সমাজ, ৩. মুসলিম জাতিসমূহ, ৪. হিন্দু সভ্যতা এবং ৫. সুদূর প্রাচ্য। এই তালিকার দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ সনাতনী খ্রিস্টীয় সমাজের) আবার দুটো ভাগ– দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও রুশ অঞ্চল। আর সুদূর প্রাচ্যের সভ্যতার চীন এবং জাপান-কোরিয়া– এই দুই ভাগ। অর্থাৎ টয়েনবির মতে বর্তমান পৃথিবীতে মূলত সাতটি সভ্যতা বিদ্যমান। এই সাতটি ছাড়া অতীতের আরো চৌদ্দটি সভ্যতার তিনি সন্ধান পেয়েছেন। এই একুশটি সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাই তিনি করেছেন তাঁর ছয় খণ্ডে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থে।

টয়েনবি প্রতিটি সভ্যতারই জন্ম, বিকাশ, ক্ষয় ও ধ্বংস বা মৃত্যুর কথা বলেন, কিন্তু এ-সবের কোনো সাধারণ নিয়ম আছে বলে বিশ্বাস করেন না। 'একটি সাধারণ উৎস থেকে বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি ঘটেছে'– এমন ধারণারও তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। আসলে টয়েনবি-যে 'ঐতিহাসিক ভাববাদের নতুন পুরোহিত'– এ-কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। সব সভ্যতারই ধ্বংস ও মৃত্যু আছে বলে মেনে নিয়েও টয়েনবি কিন্তু স্পেংলারের মতো পাশ্চাত্য সভ্যতার আশু ও অপরিহার্য মৃত্যুর কথা বলেন না। খ্রিস্টান সভ্যতার আধার এই পাশ্চাত্য সভ্যতা যে আধ্যাত্মিকতার পুনর্জন্মের মধ্য দিয়েই বেঁচে যেতে পারে– এমন ধরনের একটা কৃত্রিম আশাবাদই তিনি তাঁর ইতিহাসবীক্ষার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চান, এবং তাঁর অনুসারীরা এটিকে অবলম্বন করেই অনেক দিন ধরে বস্তুবাদী ইতিহাস-দর্শনের বিরুদ্ধে কোলাহলে মেতে থাকেন।

সেই কোলাহল আরো জোরদার হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অচিন্তিত-পূর্ব বিপর্যয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী মহল একেবারে বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে ফেটে পড়ে। শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকদের 'ইতিহাসের সমাপ্তি' তত্ত্ব নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য। সভ্যতা সম্পর্কে স্পেংলার-টয়েনবির মতবাদের ধারা বেয়েই তৈরি হয় হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত'-এর তত্ত্ব। মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের বিপরীতেই এই হান্টিংটনীয় সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব নির্মিত।

স্পেংলার-টয়েনবির মতোই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন সভ্যতার কথা বললেও অনেকটা ভিন্নতর ভূমিতে হান্টিংটনের অবস্থান। স্পেংলার তো পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং টয়েনবি আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বা Clericalism-এর মধ্য দিয়ে সে-সভ্যতা রক্ষা পেয়ে যেতে পারে বলে আশাবাদ ছড়িয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের অন্তিম পর্বে বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তন হান্টিংটনকে তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে অন্যতর ভাবনা ভাবতে প্ররোচিত করে তোলে। পাশ্চাত্য সভ্যতাই-যে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা,এ-বিষয়ে তাঁর মনে সামান্যতম সংশয়ও নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরে আছে যে কনফুসীয় বা চৈনিক সভ্যতা, জাপানি সভ্যতা এবং ইসলামি, হিন্দু, স্লাভিক আর লাতিন আমেরিকার সভ্যতা– এগুলো সবই একান্ত অনুন্নত। অথচ অনুন্নত হয়েও এরা যে উন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মানতে চায় না, এতেই বেঁধেছে সভ্যতার সংঘাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়ের মধ্য দিয়েই যে শেষ হবে সভ্যতার সংঘাত– এটিই হান্টিংটনীয় অপতত্ত্বের শেষ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এই শেষ সিদ্ধান্তের যে শেষ রক্ষা হবার নয়– অতি অল্পদিনের ব্যবধানেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরেই, যে-সব প্রতিবাদ-সমাবেশ ঘটতে থাকে সে-সব যেমন প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, পরোক্ষভাবে তেমনই হান্টিংটনীয় তত্ত্বেরও বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে বারাক হোসেন ওবামার নতুন মার্কিন প্রশাসন তো সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্বকে শিকেয় তুলে রাখতেই বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এরও আগে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের উদ্ভাবিত নানান কিসিমের সকল ইতিহাসতত্ত্বের এ-রকম অপমৃত্যুই ঘটেছে।

তাই বলে ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসদর্শনের কাছে অতি সহজেই মাথা নত করে ফেলবে, এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। নতুন নতুন ইতিহাসদর্শনের উদ্ভব ঘটিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিভ্রান্তির জাল ছড়িয়ে দিয়েই ধনতন্ত্র বেঁচে থাকার প্রয়াস গ্রহণ করবে। তবে সে-রকম সব প্রয়াসের সব ফানুসও-যে আগের মতোই ফেটে যেতে থাকবে, এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসদর্শনের সত্যতা-যে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হতে থাকবে– এতাবৎকালের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে এমন প্রত্যয়েরই জন্ম দেয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসদর্শন অতীতের ইতিহাসের চাবিই শুধু আমাদের হাতে তুলে দেয় না, ভবিষ্যতের ইতিহাস-নির্মাণের পথ ও পদ্ধতিও দেখিয়ে ও শিখিয়ে দেয়। কী করে বিগতকালের ও একালের শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ভাবীকালে শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত হবে, তা-ও আমাদের জানিয়ে দেয়।

এ-রকম শ্রেণীহীন সমাজের ভাবনাকে ইউটোপিয়ান বা কল্পরাজ্যবাদী বলে মনে করে যারা, তেমন লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয়। তবু, এ-ধরনের নেতিবাদীদের আমরা অনায়াসই উপেক্ষা করতে পারি। প্রখ্যাত ইতিহাসদর্শনবিদ ই.এইচ.কার ('হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' গ্রন্থের লেখক)-এর মতো আমরাও নেতিবাদীদের অপছন্দ ও কল্পরাজ্যবাদীদের পছন্দ করি। কার বলেছিলেন,–

'আজ পৃথিবী বোধ হয় নেতিবাদী ও কল্পরাজ্যবাদী (ইউটোপিয়ান) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রথমোক্তরা কোনো কিছুতেই অর্থ খুঁজে পায় না, আর দ্বিতীয়রা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো অসাধারণ সুন্দর কিন্তু অনির্ণেয় অনুমানের ভিত্তিতে অর্থ খুঁজে পায়। আমি দ্বিতীয়দের পছন্দ করি। কারণ কল্পরাজ্যই ব্যক্তিকে সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে; আর প্রকৃত কল্পরাজ্যের সঙ্গে অলস ও উদ্দেশ্যহীন আশাদাবাদের পার্থক্য আছে।'

ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ যদি নিতান্ত কল্পরাজ্যও হয়, তবু তা 'অলস ও উদ্দেশ্যহীন আশাবাদের' নামান্তর মাত্র নয়। ঐতিহাসিক বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের শক্ত মাটিতে তার ভিত্তি স্থাপিত। প্রত্যয়ের সেই শক্ত মাটিতে পা না-রেখে কেন আমরা উদভ্রান্তের মতো আত্মমুখী ভাববাদ বা যান্ত্রিক বস্তুবাদ বা দুর্জ্ঞেয়বাদের পল্‌কা ডালকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাইব?

ইতিহাসের দর্শন: বৈজ্ঞানিক সত্যের খোঁজে

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

মানুষের সামগ্রিক অতীত ঘটনার লিপিকৃত রূপই ইতিহাস। অতীতকে জানা, উপলব্ধি করা, কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করা, তার সাথে বর্তমানের সাদৃশ্য খোঁজা এবং অতীত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করার জন্য ইতিহাস বাদে অন্য কোনো আশ্রয় নেই। ইতিহাস মানব-জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, সাথে সাথে অতি চমকপ্রদও। রাসেল লিখেছেন, 'Of all the studies by which men acquire citizenship of the intellectual commonwealth, no single one is so indispensable as the study of the past.'| অতীতকে জানা এজন্য অপরিহার্য যে, মানুষ যেমনি অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হয় ঠিক তেমনি পেছনের কথা জানবার আগ্রহও তার কম নয়। আর কেনই-বা তা না হবে? জ্ঞানের যে শাখা মানুষের প্রাচীনতম ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, ঐক্য-অনৈক্য, সংঘাত-সংঘর্ষ, শান্তি আর বিবর্তনের কথা অবিচ্ছিন্নভাবে জানিয়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব তো সবার ওপরে। কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ ও অনুভবক্ষমতাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই। ইতিহাস অতীত-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগান দিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে, ইতিহাসের গণ্ডি অতীতের যে-কোনো সময় থেকে বর্তমানে অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এখন ইতিহাস মানে কিছু চিহ্নিত রাজ-রাজড়াদের যুদ্ধবিগ্রহ আর জয়-পরাজয়ের কাহিনীই নয় বরং অতীত-সংক্রান্ত মানবভাবনার বহুমুখী দিকগুলোর বিচিত্র প্রক্ষেপ এর অনিবার্য অংশ। বহুমুখী বলা হচ্ছে এই জন্য যে, মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরেও রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, কৃষি-শিল্প-শিক্ষা কিংবা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিস্তৃত ক্ষেত্র। সুতরাং ইতিহাস বললে খুব সঙ্গত কারণেই এসব কর্মধারার সামগ্রিক বিষয়গুলো চোখের সামনে হাজির হয়। আর ইতিহাসের দর্শন এই বিরাট কর্মযজ্ঞের চুলচেরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুত ইতিহাসের রচনাপদ্ধতি, তার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত থেকে বাছাই, সেগুলোকে লক্ষ্য পূরণে সঠিকভাবে ব্যবহার এবং বর্ণনার আঙ্গিকের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ইতিহাসের দর্শন। আবার অনেকে মনে করেছেন 'কাকে বলে ইতিহাস'- এর যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই ইতিহাসের দার্শনিক মূল্য নিহিত।

দর্শনের সাধারণ শাখার মতো ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মতভেদ আছে কারণ দর্শন মানেই তা কোনো-না-কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রেণী বা গোত্রনিরপেক্ষ দর্শন বলতে কোনো দর্শন নেই। কাজেই যখনই ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন আসে তখনই বিবেচনা করতে হবে কোন্ মতাদর্শ ধারণ করে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কোন্ বিশেষ প্রেক্ষাপট তাকে ইতিহাস রচনায় উদ্দীপ্ত করেছে? (মোটকথা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের দর্শন)। যাই হোক মোটাদাগে দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদ হল- ভাববাদ ও বস্তুবাদ। এই দুটি মতবাদ যেমনি মানুষের চিন্তার পদ্ধতিকে দুটি বিপরীতমুখী অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই বিভাগ সমানভাবে কাজ করেছে। এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই চিন্তা ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার মূল্যায়নই হবে এ প্রবন্ধের মূল কাজ।

দুই

ইতিহাস ঘটনার নির্মোহ ব্যাখ্যা নাকি এটা ব্যক্তিসাপেক্ষ (বিষয়) ভিত্তিক (subjective) মূল্যায়নের দলিল– এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি আজও। বৌদ্ধিক মহলে এ-নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে বিস্তর। এ প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে ইতিহাসের দার্শনিক-চরিত্র সংক্রান্ত আরেকটা বড় প্রশ্ন– ইতিহাস বিজ্ঞান নাকি কলা। কেউ বলছেন ইতিহাস নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের উন্মোচন করে চলে। তাই একে বিজ্ঞান না বলে পার নেই। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন ইতিহাস কখনই বিজ্ঞান হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞানে যেমন তথ্য-উপাত্তের ব্যক্তিনিরপেক্ষ ব্যবহার হয়, ইতিহাসে তেমন হয় না। এতে না আছে পদ্ধতিতাত্ত্বিক গবেষণা, না আছে নির্ভুলভাবে অনুমান করার দক্ষতা। তবে একটা কথা ঠিক, ইতিহাস বিজ্ঞানই হোক আর কলাই হোক মানুষ ইতিহাসের কাছে চায় সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক তথ্য। কারণ ইতিহাসের একমাত্র দায়িত্ব সত্যকে উন্মোচন করা– তা সে যতই অপ্রিয় হোক। তবে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেটা আদৌ সম্ভব হয়েছে কিনা তা যথেষ্ট প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। আর এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের দায়িত্ব একমাত্র ঐ দার্শনিকদেরই। আমরা শুধু ইতিহাসের আলোকে এর অনুপুঙ্খ বিচার করতে চাই।

অনেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, ইতিহাস অবশ্যই বিজ্ঞান। ১৯০৩ সালে ব্যুরি বলেছিলেন, 'ইতিহাস একটি বিজ্ঞান তার বেশিও নয়, কমও নয়'। ইতিহাসে যে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয় তার কোনোরকম হের-ফের হওয়ার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানী যেমন সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে তা থেকে আরোহ প্রক্রিয়ায় নতুন সিদ্ধান্তে হাজির হন সেরকম ইতিহাসকারের কর্মপদ্ধতিও বিজ্ঞানীর মতো আরোহাত্মক (inductive) । ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে উপাত্তগুলো সামনে পান সেগুলিকে জড়ো করেন, সংগৃহীত তথ্যের যাচাই করেন এবং তার থেকে সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এ কারণে পদ্ধতিতাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীর সাথে ইতিহাসকারের কোনো তফাৎ নেই। অনেকে অভিযোগ করেছেন, ইতিহাস একান্ত ভাবেই অনন্য জিনিস নিয়ে চর্চা করে আর বিজ্ঞান করে সাধারণ বিষয় নিয়ে। সম্ভবত অ্যারিস্টটল থেকে এই অভিযোগটা চলে আসছে। তারা বলেছেন ইতিহাস বিশেষ ঘটনার আলোচনা ছাড়া কিছু নয়। এর উত্তরে অনেক ঐতিহাসিক যেমন ই.এইচ.কার মন্তব্য করেন, বিজ্ঞানীর মতো ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলোও ঐতিহাসিকের কাছে সাধারণ মাত্রা পেয়েছে। ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তার সাধারণ সূত্র খুজঁতে চেয়েছেন। যেমন- ঐতিহাসিক গিবন খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের উত্থানের দুই ঘটনাকেই বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিককালে ইংরেজি, রুশ, চীন, ফরাসি বিপ্লব লিখতে যেয়ে ঐতিহাসিকরা একই কাজ করেছেন। ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসকারের থাকতে হবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিশক্তি। এবং একই সাথে দরকার হবে পূর্বধারণামুক্ত বিশুদ্ধ চিন্তা। তাঁর নিজের কথায়- 'A historian must divest his mind of sentiments, prejudices and pre-conceptions and all kinds of human emotions which are likely to distort his vision and judgement'। অধ্যাপক মজুমদার মনে করেন, যে বিষয়ের ইতিহাস রচিত হবে তার যথেষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এবং সেগুলোকে অবশ্যই স্বতঃপ্রমাণিত (self-evident) হতে হবে। কারণ ইতিহাস রচনাকারীর মূল লক্ষ্যই সত্য উদ্‌ঘাটন করা। সত্য উন্মোচনের বাইরে তার কোনো দায়িত্ব নেই। তিনি একজন নিরপেক্ষ ধারাবিবরণকারীর মতো সব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যাবেন। এখানে তার নিজস্ব ভালো-মন্দের কোনো জায়গা নেই । প্রফেসর র‍্যাঙ্কিও মনে করতেন ইতিহাসের লক্ষ্যই হল যা ঘটছে তার ঠিকঠাক বর্ণনা দেওয়া (It's aim is merely to show what actually occurred)। ইতিহাস রচনা করতে যেয়ে রচনাকারী যদি তার নিরপেক্ষতা হারান তাহলে তার পরিণতি হয় ভয়ানক। মানুষ কিছুতেই আর সত্যকে জানতে পারে না। অতীতে ইতিহাস রচনায় পূর্বধারণা, দ্বেষ, বিশেষ গোষ্ঠী বা মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি কারণগুলোর জন্য ঘটনায় প্রকৃত ইতিহাস থেকে সাধারণ পাঠক বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন - History of British India নামে ভারতীয় ইতিহাসের অতি চমৎকার একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সুবিখ্যাত ইংরেজ জেমস মিল। তিনি ছিলেন নামকরা ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা। ঐ গ্রন্থখানা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ম্যাককুলি এটাকে ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য গ্রন্থ হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু অনেকে বলেছেন, রাজনৈতিক ও বর্ণগত কারণে হিন্দুর প্রতি মিলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঐ গ্রন্থখানা হয়ে গেছে একপেশে ও খণ্ডিত। এ অভিযোগ স্বয়ং স্যার উইলিয়াম জোনসের। তিনি ছিলেন প্রাচ্যমুখী। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে ভি.এ. স্মিথের 'Early History of India'- গ্রন্থের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে নামকরা বাঙালি-ইংরেজ নীরদ সি. চৌধুরীর ক্ষেত্রে। তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ ' Autobiography of an unknown Indian' গ্রন্থটি ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হলে প্রায় সব বাঙালি তথা ভারতীয় তার প্রতি ভয়ংকরভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় সভ্যতা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিবর্তন সংক্রান্ত এক নবতর বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন নীরদবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সমকাল অবধি রাজনৈতিক মিথষ্ক্রিয়ায় ভারত এক নতুন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা আমরা পাই এই গ্রন্থের ' An Essay on the Course of Indian History' অধ্যায়ে। তিনি তার মতবাদকে ভারতীয় চিন্তার এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আখ্যা দেন যা তাঁর নিজের ভাষায় জ্ঞানের জগতে অনেকটা কোপারনিকাস বিপ্লবের মতোই। এ প্রসংগে তিনি জানিয়েছেন, ' So far as Indian History is concerned, the difference between my theory and that of my countrymen is almost like the

difference between the copernican and the pre-copernican view regarding the earth: mine centres round a sun, that of my countrymen is egocentric '। নীরদ চৌধুরীর ভারত-ভাবনা সহজভাবে নেয়নি অনেক ভারতীয়। ইংরেজদের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির মাত্রা অতিক্রম করার ফলে মি. চৌধুরীকে মাশুল গুণতে হয়েছে অনেক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বাঁকা দৃষ্টির মুখে পড়েন তিনি। অবশেষে বাকি জীবন বিলেতে কাটিয়ে বেঁচে যান। সুতরাং যদি কোনো ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রচনাকারীর বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি, দ্বেষ, অনুকম্পা অথবা সংস্কার সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে বাধা সৃষ্টি করে তবে সেখান থেকে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন পাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই বিজ্ঞানী যেমনি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে নির্মোহ সত্যকে অনাবৃত করতে চান, ইতিহাসকারেরও উচিত সেই একই পদ্ধতি ধরে পথ চলা। এক্ষেত্রে রচনাকারীকে বিচক্ষণতার সাথে হতে হয় নৈতিকভাবে উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী।

তবে ইতিহাসের বিজ্ঞান-চরিত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উত্তর-পর্বের অনেক দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক। তাঁরা মনে করেন, ইতিহাস এক জিনিস, বিজ্ঞান আরেক জিনিস। বিজ্ঞানে তথ্য-উপাত্ত যেভাবে সংযোজিত হয় তাতে ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হল বিজ্ঞান। অন্যদিকে ইতিহাসের পুরোটাই মানব কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত ব্যাপার। এজন্য ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে অগ্রগণ্য। তাই এ-সংক্রান্ত যে কোনো পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা তথা পূর্বানুমান যথেষ্ট ঝুঁকির কাজ। ইতিহাসকে তাঁরা ভাবেন 'কাঁচি আর আঠা' মারার ব্যাপার। কাঁচি দিয়ে আমরা ঘটনাগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে যেমন টুকরো টুকরো তথ্যকে নিজের মতো করে সাজাই, ইতিহাসের ব্যাপারটাও তাই। আর এ-ধরনের তথ্যের সংগ্রহ ও নির্বাচন করার পুরো প্রক্রিয়াটিই ইতিহাস রচয়িতার ব্যক্তিগত পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা- অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। জর্জ ক্লার্ক মন্তব্য করেছিলেন ইতিহাসে বিষয়নিষ্ঠতা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ ঐতিহাসিক তথ্য সবসময় কারো-না-কারো ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে সংগৃহীত। ইতিহাস রচনার সংগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা জড়িয়ে আছে সেটা হল নৈতিকতা। ইতিহাসকারের রায় ঘোষণার কোনো অধিকার থাকবে কিনা তা একটা বড় প্রশ্ন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক কি এ-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ কোনো অবস্থান নিতে পারবেন? অধ্যাপক ডি নোল্‌স দৃঢ়তার সাথে বলেন, রায় ঘোষণা করা ঐতিহাসিকের এখতিয়ারের মধ্যে নেই। তার কথায়, 'ঐতিহাসিক বিচারক নয়, ফাঁসি দেওয়ার বিচারক তো নয়ই।' তাহলে ইতিহাস কি নীতিবিবর্জিত স্রেফ অথর্ব মানুষের খামখেয়ালীপনা? ইতিহাস কি শিশু আর নির্বোধের অতীত ভাবনার ব্যাপার। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পূর্বেকার মতো এখানেও ঐতিহাসিকরা দ্বিধাবিভক্ত।

আদতে ইতিহাসের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কটা বেশ জটিল। ই.এইচ.কার মনে করতেন, 'ঐতিহাসিক ও নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়'। ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা বাঞ্ছনীয়– ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া উচিত যতটুকু ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পারে। ধরা যাক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় জীবিত কমিউনিস্টদের মধ্যে জ্যোতি বসু ও ফিডেল কাস্ট্রোর ভূমিকা নিয়ে কেউ ইতিহাস রচনা করবেন। হয়তো হতে পারে তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠুর পিতা কিংবা হৃদয়হীন স্বামী। অথবা পারিবারিক জীবনে উদাসীন ব্যক্তি। কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই তাঁদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচিত হওয়া উচিত নয় যদি-না কোনোভাবে তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের ওপর কিছু-না-কিছু প্রভাব ফেলে। স্যার আইজায়া বার্লিন তাঁর 'হিস্টোরিকাল ইনেভিটেবিলিটি,-তে ইতিহাসকারের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ সংবেদনশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এক করে দেখেছেন। তিনি ভাবেন ঐতিহাসিক-কে হতে হবে মানবিক। অপরাধীকে ঘৃণা করতে হবে– পুরস্কৃত করতে হবে যোগ্য ব্যক্তিকে। ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি পরিষ্কারভাবে রায় দিয়েছেন, 'শার্লমান বা নেপোলিয়ন বা চেঙ্গিস খাঁ বা হিটলার বা স্টালিনকে তাদের হত্যালীলার জন্য বিচার করা উচিত।'

ইতিহাস রচনা করতে যেয়ে ঐতিহাসিক যে অগণিত তথ্য হাতের কাছে পান তার কোনটাকে তিনি নির্বাচন করবেন তা নির্ভর করছে তার কাছে সত্যের মানদণ্ড কী তার ওপর। তিনি যে বিশেষ দর্শন ধারণ করেন সেটা তার ইতিহাস রচনার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমেরিকার প্রয়োগবাদী দর্শন (Pragmatic Philosophy) ও মার্কসীয় দর্শন (Marxist Philosophy)। প্রয়োগবাদী দর্শনের মূল কথা হল আমার কাছে তা-ই সত্য যা আমার উপকারে লাগে। দার্শনিক উইলিয়াম জেমস বলেছেন, দর্শনের সেইটুকুই সত্য যার প্রয়োজনীয়তা বা কার্যকারিতা আছে। এমনকি সেটা ঈশ্বরের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও। ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে সত্য হবে যদি এই ধারণা আমার কোনো উপকার করে। তাছাড়া এর কোনো উপযোগিতা আমার কাছে নেই। গোটা আমেরিকান দর্শনই তাই। সুতরাং প্রায়োগিক দর্শনে ইতিহাস ব্যাখ্যা পুরোটাই ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। অন্যদিকে মার্কসীয় দর্শন মতে, মানুষের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। অর্থাৎ সেখানেও রয়েছে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দর্শন।

তিন

আমরা দেখলাম ইতিহাস তাহলে এক-এক জন ব্যক্তির নিকট এক-এক রকম। এর থেকে সংশয় জাগে সত্যটা তাহলে আমরা পাই তো? এই সংশয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক কলিংউড। তিনি লিখেছেন - 'ইতিহাসকে সেন্ট অগাস্টিন দেখেছেন আদি খ্রিস্টানের দৃষ্টিকোণ থেকে, তিলামঁ সতেরো শতকের ফরাসি দৃষ্টিকোণ থেকে ; গিবন,

আঠারো শতকের ইংরেজের ; মমসেন, উনিশ শতকের জার্মান-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। কোন্ দৃষ্টিকোণ সঠিক ছিল সে নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যিনি যে-দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাছে একমাত্র সেটাই সম্ভব ছিল।' আমরা প্রকৃতপক্ষে এমন একটা কানাগলির মধ্যে প্রবেশ করেছি যেখান থেকে আসল সত্যটা পাওয়া কঠিন। বিষয়টার ওপর আরেকটু চাপ প্রয়োগ করে আমরা ইতিহাসের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে পৌঁছাতে চাই।

সুবিখ্যাত ভারত-পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন, 'মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হল ধর্মের ইতিহাস।' ধর্ম যেহেতু মানুষের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান তাই এর বাইরে কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। ধর্ম হল জীবন ধারণের এমন একটা সামগ্রিক পদ্ধতি যা কম-বেশি প্রতিটা মানুষকে আচ্ছাদন করে আছে। ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, জীবনপদ্ধতির দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং মাঙ্গলিক জীবনের পথ দেখিয়েছে। মহাবিশ্বের প্রতিটা বাস্তবতা এমনকি অবাস্তবতারও ব্যাখ্যা দিয়েছে ধর্ম। ধর্মের প্রতিটা ব্যাখ্যাই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কোনো কিছু যাদৃচ্ছিক বা আকস্মিক নয়। দুই একটা ধর্মের কথা বাদ দিলে প্রায় সব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুই ঈশ্বর বা পরমসত্তা। এই পরমসত্তার ইচ্ছা পূরণে জগতের প্রতিটা ঘটনা ঘটে চলেছে। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়, কোনো কিছুই নয় তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ধর্মের এই মূলকথাগুলো ধারণ করে, দর্শনের অতি প্রাচীনতম চিন্তা ভাববাদ গড়ে উঠেছে। ভাববাদের মূলকথার সাথে ধর্মের ব্যাখ্যার কোনো বিশেষ হের-ফের নেই। ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যাও তাই প্রকারান্তরে ধর্মেরই ব্যাখ্যা। বিশিষ্ট স্পেনীয় আরব ঐতিহাসিক ছিলেন ইব্ন্ খলদুন। তিউনিস, গ্রানাডা, কায়রো ইত্যাদি স্থানে মুসলমান সুলতানদের অধীনে কাজ করেছেন তিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইব্ন্ খলদুন ছিলেন সবচেয়ে নামকরা। তাঁর কাছে ইতিহাসের মানে মুসলমানের ইতিহাস। মুসলিম গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, তাদের রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধের মাধ্যমে অন্যকে পরাজিত করা, মধ্যপ্রাচ্যে বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে কোন্দল সর্বোপরি ইসলামের আবির্ভাব ও তার বিকাশের নানা কাহিনী তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার ইতিহাস মূল্যায়নের দলিল-দস্তাবেজে। আরবদের ইতিহাস 'কিতাব-উল-ইবার' তার অন্যতম গ্রন্থ। এছাড়া Rosenthal-এর ইংরেজি তর্জমায় 'মুকান্দমাহ' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর একটি। তিনি তাঁর আলোচনায় কোরআন থেকে অজস্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, ধর্মীয় অনুজ্ঞার অনুসরণে শাসন পরিচালনার ওপর জোর দিয়েছেন, ইহকালের সাথে সাথে পরকালের কথা বলেছেন। সর্বোপরি মানব-আত্মার মুক্তি তথা পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা লাভের উপায় বাতলিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় রাজবংশগুলোর পতনের নানা কারণ উল্লেখ করে বলেন, 'আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর শেষ মঞ্জিলে উপনীত হওয়ায় যে পরিকল্পনা তৈয়ার করে রেখেছেন তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন কারো পক্ষেই উচিত নয়।' রাজবংশগুলোর ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ দেখাতে যেয়ে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই এসবের পতন ঘটে। কারণ 'আল্লাহ্ই সমস্ত কিছুর মালিক; তিনিই সমগ্র সৃষ্টির নিয়ামক। তিনি ব্যতীত আর কোনো আল্লাহ্ নেই।' 'ইসলামের ইতিহাসে দেখা গেছে, ইসলামের জীবনবিধান থেকে যারা সরে গেছে, নীতি-ভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যায়, অত্যাচার, কুটিলতা আর প্রবঞ্চনায় মত্ত হয়েছে তাদের পতন হয়েছে। বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করে যে সমাজ, যে রাজবংশ নজির সৃষ্টি করেছে তারাই আল্লাহর ভালোবাসা পেয়েছে। এ বাদে যে জাতি আল্লাহর সঠিক বিধান লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তখনই সে জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করার মনস্থ করেছেন।'

অন্যদিকে এই উপমহাদেশের আরেকজন ইসলামী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারনীও ইতিহাস ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইসলাম ধর্মের আলোকে। তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতানদের ঘনিষ্ঠ। 'নাত-এ-মুহম্মদী' ও ফাতাওয়া তাঁর অন্যতম দুটি গ্রন্থ। বারনী মনে করতেন মহাপুরুষ ও রাজা-বাদশা তথা ধর্ম ও রাষ্ট্রনায়কদের স্মৃতিকথা ও কার্যবিবরণীর নাম ইতিহাস। যারা ইতর, নীচ, অযোগ্য, অথর্ব, নগণ্য এবং অখ্যাত মানুষ ইতিহাসের সাথে তাদের কোনো যোগ নেই। তিনি ইতিহাসে বংশমর্যাদায় মহান, উচ্চ ও পদমর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। অতীতে যারা মহামানব ছিলেন কিংবা রাজা-বাদশা ছিলেন তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিলে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন সম্ভব বলে তার ধারণা ছিল। ইতিহাস থেকে ব্যাপক পরিমাণে শিক্ষা গ্রহণ করলে নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। বারনীর নিকট থেকে যে ইতিহাস ব্যাখ্যা আমরা পাই তা যে কোনো ইসলামী চিন্তাবিদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকগণের সম্পর্কে বারনী এক নতুন তথ্য দিয়েছেন- খলিফা, সুলতান, উজির, রাজ-রাজড়াদের নিকট থেকে অনেক ঐতিহাসিক অনেক উপঢৌকন পেতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, উট, ঘোড়া কিংবা বাগবাগিচার বিনিময়ে ঐতিহাসিকদের নিকট থেকে তারা তাদের নিজেদের পক্ষের কথা লিখিয়ে নিতেন। হয়তো এ কারণে পরবর্তীতে ইতিহাস পড়ার প্রতি মানুষের উৎসাহের ঘাটতি পেয়েছিল। ইতিহাসের যারা ভাববাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা মূলত ধর্মেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমরা সেন্ট অগাস্টিন কিংবা হেগেল-ব্রাডলি, যার ব্যাখ্যাই পড়ি-না কেন তা অবশ্যই এই বিশ্বসংক্রান্ত অতিপ্রাকৃত, আজগুবি, অস্পষ্ট এবং চরম বাস্তবতাবিরোধী নানা গল্প। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার, হেনরি বার্গসঁ, স্যামুয়েল আলেকজান্ডার, সি লয়েড মরগান প্রমুখরা মানুষের চিন্তার ইতিহাসকে এক পরম শক্তিমান সত্তার ইচ্ছার প্রকাশ বলে মনে করতেন। সমাজের শ্রেণী বিভাজন, তথা যাবতীয় ঘটনাই পরমসত্তার একান্ত ইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। এর বিপরীতে আমরা যদি বৈজ্ঞানিক, গতিশীল, সৃজনমূলক, বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করি তাহলে সমাজবিকাশের সবচেয়ে বিজ্ঞান-নির্ভর দার্শনিক তত্ত্বের কাছে আশ্রয় নিতেই হবে। আর এটা অবশ্যই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) ও তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা ঐতিহাসিক

বস্তুবাদ (Historical Materialism)। আমরা এখন লক্ষ্য করব মানুষের ইতিহাস ও বাস্তবতাকে এই দর্শন কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে।

চার

যদিও দুঃসময়ের চক্রে পড়ে মার্কসবাদী ভাবনা কিছুটা কোণঠাসা তবুও এটা নিশ্চিত করে বলা যায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তা পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক আর গ্রহণযোগ্য এ বিষয়ে সংশয় নেই। কেননা এই দর্শন সমাজবিকাশের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। এই দর্শন এমন এক ভাবনা যা জগতের সৃষ্টি এবং সমাজ ও জীবনের বাস্তবতাকে সমগ্রিকভাবে অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছে। এজন্য এটাকে মানুষের ইতিহাসের সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা না করে উপায় নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে ইতিহাসের সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্ক কী? বলা যায়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনই একমাত্র দর্শন যা মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে নির্মোহ ও নির্বিকারভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছে। সমাজবিকাশের অতি সাধারণ সূত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই দর্শন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মানুষের পুরো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এর ভিতরের সবচেয়ে একান্ত উপাদানগুলোকে দর্শনের বিকাশ ও তার সমৃদ্ধিতে কাজে লাগিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও বস্তুবাদী চিন্তার যোগফল। এই ধারণা দুটি এসেছে দু'জন প্রথিতদশা দার্শনিকের কাছ থেকে। হেগেলের কাছ থেকে এসেছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আর লুডভিগ ফয়েরবাখের কাছ থেকে এসেছে বস্তুবাদী চিন্তা। মার্কস এ দুটি চিন্তা গ্রহণ করেছেন কিন্তু এ দুটি চিন্তার প্রয়োগ হয়েছিল দুটি ভিন্ন অর্থে। অথচ ধার করা চিন্তা দুটি মার্কস কাজে লাগিয়েছেন সমাজবিকাশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব ছিল ভাববাদে পরিপূর্ণ; অন্যদিকে ফয়েরবাখের বস্তুবাদও ছিল অন্ধ যান্ত্রিক বস্তুবাদ। প্রকারান্তরে ফয়েরবাখের দর্শন ধর্ম ও নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভাববাদী চিন্তার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। তাই দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ মার্কসের কাছে এসে ভাববাদের খোঁয়াড় থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক সূত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দুটি দিক আছে। জগতকে গতি ও পরিবর্তনের ধারায় ব্যাখ্যা করেছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব; অন্যদিকে জগতের আদি সত্তা হিসেবে বস্তুকে অবধারিত হিসেবে গ্রহণ করেছে বস্তুবাদী চিন্তা।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল কথা হল এই বিশ্বের আদি ও মৌলিক উপাদান হল বস্তু। বস্তুর গতি ও তাদের ভিন্ন মাত্রার সমাবেশের কারণেই অতি সূক্ষ্মতম পর্যায়ে চেতনার আবির্ভাব ঘটে। তাই চেতনা বস্তু থেকে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম মাত্রার ফলাফল। ভাববাদী দর্শনে বলা হয় বস্তুর আগে চেতনার উদ্ভব। অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ির মতো ব্যাপার। বস্তু ছাড়া কিভাবে চেতনার উদ্ভব ঘটে তার সদুত্তর এখানে নেই। ভাববাদী দর্শনে জগতকে অচল, দ্বন্দ্বহীন, পূত-পবিত্র এবং সামাজিক বিভাজনকে পরমসত্তার ইচ্ছা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন জগত সম্পর্কে সমকালীন বিজ্ঞানসমূহের যেমন- পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞানের অখণ্ড জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলাফল। তবে মনে রাখতে হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মতো নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করা এখানে সম্ভব নয়। তাই একে সব বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান হিসেবে যারা আখ্যা দিয়েছেন তাদের সেটা অতিশয়োক্তি।

এই দর্শন জগতের প্রতিটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছে দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে। কোনো কিছুই স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়। নিরন্তর সংঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিটা বস্তু। ভাববাদী দার্শনিকরা এ সত্যকে অগ্রাহ্য করে মনগড়া ও অসত্য কথা বলে চলেছেন। এঙ্গেলস এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে– 'দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সব কিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় অনন্ত উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্ব মাত্র।'

জে.ভি স্টালিন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন – অধিবিদ্যার বিপরীতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিশ্বজগতকে পরস্পর সম্পর্কহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর নিরপেক্ষ বস্তুসমূহের তথা বাহ্য ব্যাপারসমূহের আকস্মিক পিণ্ডীভবন বলে মনে করে না। বরং মনে করে এক সম্পর্কযুক্ত ও অখণ্ড সমগ্র বলে; যেখানে বস্তু তথা বাহ্য ব্যাপারসমূহ হল অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অধিবিদ্যার বিপরীতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থাণু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন নয় এবং বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম পরিবর্তনশীল ও গতিশীল– সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্তন ও বিবর্তনের ক্রিয়া চলছে। প্রতিক্ষণই কোনো-না-কোনো নতুন বস্তুর আবির্ভাব ও বিকাশ হচ্ছে। আবার কোনো না কোনো বস্তু বিনষ্ট ও তিরোহিত হচ্ছে।

অধিবিদ্যার বিপরীতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিকাশের প্রক্রিয়াকে সরল ক্রমবৃদ্ধির এমন এক প্রক্রিয়া বলে মনে করে না, যেখানে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনের দিকে চালিত করে না বরং এমন এক বিকাশ ধারা বলেই মনে করে যা নগণ্য ও অস্পষ্ট পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহ থেকে সুস্পষ্ট মৌলিক পরিবর্তনসমূহের দিকে গুণগত পরিবর্তনসমূহের দিকেই চালিত করে; এমন এক বিকাশধারা বলেই মনে করে যেখানে গুণগত পরিবর্তনসমূহ ক্রমান্বয়ে ঘটে না বরং দ্রুত ও প্রত্যাশিতভাবে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উল্লম্ফনের রূপ ধারণ করে; আকস্মিকভাবে নয় বরং তা ঘটে অস্পষ্ট ও ক্রমিক পরিমাণগত পরিবর্তনসমূহের পুঞ্জীভবনের স্বাভাবিক পরিণতিতে। অধিবিদ্যার বিপরীতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মত হল এই যে, বিশ্ব-জগতের সকল বস্তু ও বাহ্য ব্যাপারের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হল অন্তর্নিহিত, কারণ তাদের সকলেরই রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, একটি অতীত ও একটি ভবিষ্যৎ, কোনো-কোনোটি তিরোধান লাভ করছে আর কোনো-

কোনোটি বিকাশ লাভ করেছে; আর এর বিপরীত দিকসমূহের মধ্যকার সংগ্রাম পুরাতন ও নতুনের মধ্যকার সংগ্রাম যা মৃত্যু-বরণ করছে আর যা জন্ম নিচ্ছে, যা তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে আর যা বিকাশ লাভ করছে, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই গঠন করে বিকাশের প্রক্রিয়ায় আভ্যন্তরীণ মর্মবস্তু, পরিমাণগত পরিবর্তণ থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের অভ্যন্তরীণ মর্মবস্তু ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী এই বিশ্বের আদিসত্তা হল বস্তু । সৃষ্টির শুরুটা একটা বিশেষ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে ; একদিন সেটা শেষও হবে এধরনের এক আকস্মিকতায় । সৃষ্টির পেছনে কোনো বিশেষ নকশাবিদের পরিকল্পনা নেই, নেই বিশেষ কোনো তদারকি সংস্থা । বস্তুর অভ্যন্তরে যে গতি ও সম্ভাবনা আছে এবং তা বিকশিত হওয়ার যে অসম্ভব প্রবণতা ধারণ করে আছে তার ফলেই বস্তুজগত নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলেছে । গতিই বস্তুর ধর্ম । আর স্বতঃস্ফূর্ততাই সেই ধর্মকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে । সামনে এগিয়ে যাওয়াটা নিছক একটা পরিবর্তন নয় ; এই পরিবর্তনটা হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে । বস্তুর ভিতর সৃষ্টির যে নেশা আছে তার জন্যই সৃষ্টি হয়ে চলেছে নতুন নতুন জিনিস । প্রশ্ন হতে পারে অন্ধ বস্তু কিভাবে সচেতন সত্তার জন্ম দেবে? মার্কসের আমলে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল জটিল । এমনকি মহাশূন্যাবস্থা থেকে বস্তুর আবির্ভাবের প্রশ্নটাও ছিল আরো দুর্বোধ্য । কিন্তু আধুনিক কণাবাদী বলবিদ্যা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে অত্যন্ত জটিল গাণিতিক সমীকরণের মধ্য দিয়ে । তাই শক্তি থেকে বস্তুর উদ্ভবের সমীকরণটা মানুষকে আর ভাবায় না । অন্যদিকে সেই বস্তুর অতি জটিল ও সূক্ষ্ম পরিবর্তিত অবস্থা যে চেতনার আবির্ভাব ঘটাতে পারে এর সমাধান অল্পকিছু অন্ধ মানুষ বাদে সবারই জানা । ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তাকে আরো সাহসী করে তোলে । এই তত্ত্বানুয়ায়ী জগতের বস্তু ও ঘটনাসমূহ সামগ্রিকভাবে সম্পর্কিত; কোনো ঘটনাই অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ায় বস্তুর মধ্যে যে অবিরত সংঘাত ঘটছে তার ফলাফলেই নতুনের আবির্ভাব হয় । বিকাশের এই ধারা বুঝতে গেলে নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্বের আলোকেই বুঝতে হবে । মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস তাই দ্বন্দ্বের বাইরের কিছু নয় । যারা মনে করেন নিছক অন্ধ আবেগের মাঝ দিয়ে মানুষের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে তারা অধিবিদ, চূড়ান্তভাবে ভাববাদী । তারা নতুনকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন । প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন । বসে থাকেন স্থাণু হয়ে । অথচ এই দর্শন প্রগতিশীল, সৃজনশীল, বিকাশমান এবং দুর্জেয় । দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তিনটি মৌলিক সূত্র আছে । সূত্রগুলো হল বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়ম, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং নেতির নেতিকরণ । এগুলো একে অন্যের সাথে খুব গভীরভাবে সম্পর্কিত । একটি ছাড়া অন্যটিকে বোঝা যায় না । জগতের প্রায় প্রতিটা ঘটনাই কোনো-না -কোনো ভাবে এই সূত্রের সাথে সম্পর্কিত ।

পাঁচ

মার্কসবাদে বলা হচ্ছে রাজনীতি হল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক-বিষয়ক নীতি । বলাই বাহুল্য এই সম্পর্ক হল শ্রেণীসম্পর্ক । রাজনীতি এই শ্রেণীসম্পর্কেরই প্রকাশ । এই শ্রেণী হল শোষক ও শোষিত শ্রেণী । । ইতিহাস থেকে দেখা গেছে এই সম্পর্ক কোনো সময় সুখকর নয় । ধনী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চলছে নিরন্তর সংঘাত । মানবসমাজের ইতিহাস– গোটাটাই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস । এবং এই শ্রেণীসংগ্রামই সমাজ বিকাশের মূল নিয়ামক । শোষক ও শোষিতের এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তখন থেকে যখন থেকে মানুষ উৎপাদন শুরু করেছে । এবং তখন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের অতিরিক্ত উৎপাদন প্রবণতা । সম্পত্তির মালিকরা চেয়েছে সম্পদকে তাদের কুক্ষিগত করতে । তারা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে শ্রমিকদেরকে ,যারা এই উৎপাদনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট । ফলে এই দ্বন্দ্ব হয়ে পড়েছে অনিবার্য । আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে প্রকট হয়েছে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এসে । কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার-এ যথার্থই লেখা হয়েছে–

> 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস । স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও-বা প্রকাশ্যে ।'

যাই হোক, মানুষের ইতিহাসকে তাই বর্ণনা করতে এমন এক সাধারণ সূত্র আমাদের প্রয়োজন হয়েছে যা কোনো ঘটনাকেই বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে না-দেখে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে পারে । আর এটাই ইতিহাস মূল্যায়নের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । এক্ষেত্রে ইতিহাসকে যারা দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে বিচার করেছে সেই দর্শনকে সবচেয়ে এগিয়ে না রেখে উপায় কী? প্রাচীন গ্রীসের সেই পিলোপনেশীয় যুদ্ধ থেকে কারগিল যুদ্ধ পর্যন্ত যতরকম রাজনৈতিক সংঘাত পরিলক্ষিত হয়েছে, আপাতত সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এদের মূল ঐতিহাসিক যোগসূত্র কিন্তু এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যেই আছে । তাই ইতিহাসের দর্শন সম্ভবত মানবসমাজ বিকাশের এমন এক কার্যকরী ও অনুধ্যানমূলক প্রক্রিয়া যা আধুনিক মানুষের চিন্তার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করছে বহুগুণ । ঐতিহাসিক সত্যকে নির্লেপভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং সুদূর অতীতকে বর্তমানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইতিহাসের দর্শন হতে পারে সাধারণ মানুষের একমাত্র আশ্রয় ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. E.H.Carr : What is History (অনুবাদঃ স্নেহাৎপল দত্ত; সৌমিত্র পালিত) কে.পি.বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা
২. R.C. Mojumdar : Historiography in Modern India, Asia Publishing House, Bombay.
৩. B.Russell: Basic Writings of Bertrand Russell, Routledge, London.
৪. Maurice Cornforth: Dialectical Materialism; National Book Agency (Pvt.) Ltd, Calcutta.
৫. N.C.Chowdhuri : Autobiography of an unknown Indian, Jaico Publishing House
৬.V.Afanasyev: Marxist Philosophy ; Progress Publishers, Moscow.
৭. মমতাজুর রহমান তরফদার (সম্পাদনা) ইতিহাসের দর্শন : বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৮. জেভি স্তালিন : দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এন বি এ, কলকাতা
৯. ডি মায়াল এডোয়ার্ডস : (অনুবাদঃ সুশীল কুমার চক্রবর্তী) ধর্মদর্শন, পশ্চিমবংগ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
১০. হারুন রশীদ : মার্কসীয় দর্শন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ।

প্র ব ন্ধ

ইতিহাসের দর্শনঃ কতটুকু বুঝেছি

মু স্তা ফা জা মা ন আ ব্বা সী

বুঝিনি । বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম ইতিহাস । ৫৬ সনে । পেলাম ভালো অধ্যাপকদের । তাঁরা মন দিয়ে শেখালেন রাজা-বাদশাদের ইতিহাস, সন তারিখ । মন ভরেনি । তখনকার দিনে ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস পড়তে আসতেন সিভিল সার্ভিস অথবা নিদেনপক্ষে ইপিসিএস বা একটি চাকরি পাওয়ার সুবিধা হবে বিবেচনায় । ইতিহাস এবং দর্শনে উঠত ভালো নম্বর, ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাসের দিকে ধাবমান । হাজির হলাম শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকের কাছে । উনি হ্যারল্ড লাস্কির ছাত্র, টিচার্স কমনরুমে একঘণ্টা ধরে বোঝালেন ইতিহাসের দর্শনের কথা । লিখে দিলেন কয়েকটি বইয়ের কথা । কোথায় সিলেবাস, কোথায় কী? লাইব্রেরিতে মশগুল হয়ে পড়তে গেছি আর্নেল্ড টয়েনবির 'হিসট্রি অব সিভিলিজেশনস', (তখন দশ ভলিউমের মাত্র চারটি রেরিয়েছে), গিবনের 'রাইজ এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার', (দশ ভলিউম) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভলিউমগুলো । বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে এসেছে ।

অনার্সে ও এম.এ-তে 'হিসট্রিওগ্রাফি' (অর্থাৎ ডাইনাস্টির ইতিহাস) মুখস্থ না করেও, দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম । লোকসাহিত্যে লোকসংগীতে লোকসংস্কৃতিতে যে গ্রামীণ বাঙালির জনজীবনের ইতিহাস পরে প্রত্যক্ষ করি, তার সঙ্গে হিসট্রিওগ্রাফির তফাৎ, সহজেই বুঝতে পারলাম । এই প্রসঙ্গে পরে আসছি ।

'ইতিহাস কোন কাজে এসেছে তোমার জীবনে? জিজ্ঞেস করলেন আমার শিক্ষক নামকরা প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. আহমদ হাসান দানী (কিছুদিন আগে লোকান্তরিত) । বছর দশক আগে, এশিয়াটিক সোসাইটির এক অনুষ্ঠানেঃ বললাম, আমার প্রথম ডুব, মানবশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদে (দ.) । আমার লেখা 'মুহাম্মদের নাম' (৫২৫ পৃষ্ঠা) পাঠালাম তাঁকে । 'ইতিহাসের দর্শন' এখনও দূরে ।

ইতিহাসের 'কনসেপ্ট' মানবচিন্তায় বিশিষ্ট স্থানের দাবিদার । ইতিহাসের অন্তর্গত নানা জাগতিক বিবর্তন ও গতি ও প্রবাহ মানবচিন্তাকে করে প্রভাবিত । এর থেকেই উদয় 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া'র সম্ভাবনা । বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গ্রথিত হয় নতুন মর্যাদায় । নানা প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা, যাতে মেটাফিজিক্স, হার্মেনিউটিক্স, এপিস্টমলজি এবং হিস্টোরিসিজম । প্রশ্ন অনেক, তার মধ্যে আছে ১. ইতিহাসে যা পাই তা কি ব্যক্তিনির্ভর

কোনো কর্ম, সামাজিক অবকাঠামো, কাল ও দেশনির্ভর সভ্যতা, যা ধীরে ধীরে প্রবাহিত, নাকি আছে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ? ২. ইতিহাসের কি সামগ্রিক কোনো অর্থ আছে, আছে কোনো নির্দিষ্ট গতিপথ, নাকি শুধুই নানা ব্যক্তিনির্ভর ঘটনার অভিক্ষেপ? ৩. আমাদের ইতিহাস চর্চা, জানা, বোঝা ও এর বোঝানোর কি কোনো নির্দিষ্ট পন্থা আছে? ৪. আজকের ঘটনা কি মানবসভ্যতার কোনো নিয়ন্ত্রণের শিকার? আরও বহু প্রশ্ন।

ইতিহাস কী? গদ্যের ভাষায়, যা কিছু মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর সঙ্গে জুড়তে পারি সৌরজগৎ, পৃথিবীর জন্মের ইতিহাস ও কোটি কোটি বছরের 'সময়ের ইতিহাস' (A brief history of time : Stephen Hawkins দ্রষ্টব্য)। ইতিহাসের দর্শনে মূল্যবান বক্তব্যটি কাল মার্ক্স-এর। তিনি বলছেন: 'Men make their own history, but not in circumstances of their own choosing' (1852)। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে জানতে পারি ইতিহাসের পর্যালোচনার মধ্যেই নিহিত আছে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারটি। বর্তমানের কাছে অতীতের ফেলে যাওয়া যে ধ্বংসের অবশেষ, দেয়ালের লিখন, মুদ্রা, দলিলাদি, মৌখিক ইতিহাস, পাদ্রি মোল্লাদের রেখে যাওয়া বইপুস্তক এবং গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসবিদদের লিখে যাওয়া ঘটনাবলির সম্মিলক আমাদের একটি জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখান থেকে আমরা একটা পর্যবেক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করি। মানবসৃষ্টির ইতিহাসকেও এই প্রশ্নের মধ্যে দাঁড় করানো হয়ে থাকে। মানবমণ্ডলীর একই ইতিহাস, যা মিশর থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত, সুমিরিয়ান ব্যাবিলন থেকে বুশ-বিধ্বস্ত ইরাক পর্যন্ত প্রবাহিত। এর যোগসূত্রটি কী? এর অর্থ খোঁজাও ইতিহাসের দর্শনের অন্তর্গত।

হেগেলের কাছে সবাই এসেছেন ইতিহাসের দর্শন শেখার জন্যে। পথিকৃৎ তিনি। মানুষের স্বাধীন চিন্তার সর্বশেষ ফসল এই দর্শন। 'The question at issue is the ultimate end of mankind, the end which the spirit sets itself in the world' (1857) । তাঁর লেখা: Phenomenology of Spirit (1807) থিসিসে এর পূর্ণ দর্শন নিহিত। সংক্ষেপে তা হল: আপন আত্মার উন্মেষ ও দর্শন। 'History is the process whereby the spirit discovers itself and its own concepts'|

১৯৭০-এর পরে ইতিহাসের দর্শনের খোলনালচে যায় বদলে Hayden White : Metahistory (1973) ও Louis Mink লেখালেখির পর। ইতিহাসের দর্শনের চেহারা এখন অন্য রকম।

প্রাচ্যে ইতিহাসের দর্শন রূপ নিয়েছে নতুনভাবে মহাচীনে এবং ইসলামি দুনিয়ায় ইব্নে খাল্দুনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। চার্লস ডারউইনের The origin of species প্রকাশিত ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে যা মানবজন্মের ইতিহাসকে দেয় বদলে। পরে ডারউইনের এই থিওরি সামাজিক ডারউইন থিওরি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। হারবার্ট স্পেন্সার একে নাম দেন Survival of the fittest নামে। সভ্যতা যে ক্রমে শেষের দিকে প্রত্যাবর্তিত তা পাওয়া যায়, পল ভেলেরির বক্তব্যে : 'We civilizations now know ourselves mortal'. Francis Fokoyama লেখেন চমৎকার একটি বই, নাম : The end of history and the last man (1992), যা হেগেলের Phenomenology of Spirit (1807) থেকে উদ্ভূত। হেগেলের চিন্তা Dialectic-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যা কিছু অঘটন ঘটেছে তা-ই ইতিহাসের গতি। অর্থাৎ যা কিছু অঘটন হবে, তারপরেই হবে এর পরবর্তী ফলাফল বা Antithesis। কার্ল মার্ক্স এটাকে যুক্ত করেছেন এভাবে : Louis the XVI-এর আবির্ভাব না হলে উদয় হত না ফরাসি বিপ্লবের। তিনি তার দর্শনে Reason -কে Spirit-এর উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এই Reason প্রকৃতিকেও বশ করেছে। তিনি লিখছেন, 'Reason spiritualize nature. Roads, fields, fences and all the modern infrastructure in which we live is the result of this spiritualization nature'. মানবসভ্যতাকে বলেছেন, 'Result of the labor of reason in যরংঃড়ঙ্কু–এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক মত। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের যেমন মিল, তেমনি একজনের বৈজ্ঞানিক মতের সঙ্গে অন্য বৈজ্ঞানিক মতের সাদৃশ্য। ইউরোপব্যাপী ইতিহাসের দর্শনের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে।

আমাদের শুরু। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর বসে আছেন সভাসদদের সঙ্গে। তাঁকে পড়ে শোনান হল প্রাচীন বেদবেদান্ত থেকে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন : "এ তো বেদান্ত নয়, এ তো আমাদের 'তাসাউউফ'-এর কাছাকাছি"। জাহাঙ্গীরের দৌহিত্র দারাহ্ সিকো একজন সুফী, বাবা লালদাসের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। লিখলেন, তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, 'মাজমা-ই-বাহরেইন' (সুফী ও বেদান্ত সমুদ্রের মিলন)। মিলন হয়নি, মিলনের সূত্রপাত হয়েছে। ইতিহাসের দর্শনের মিলন।

Reason শব্দটি কোরানে ৪৪ বার দেখা দিয়েছে। উদ্দেশ্য ইজ্তিহাদ অর্থাৎ নিজে খুঁজে বার করা। নবীকে জিজ্ঞেস করা হল :

'বিচার কিভাবে করব'?

'কোরানের উপরে' ।

'যদি কোরানে লেখা না থাকে'?

'সুন্নাহের উপরে'।

'যদি সুন্নাহ কিছু না বলে'?

'তোমার নিজের বিচারের (Reason-এর) উপরে'।

কোরানে হাদিসে তো সব কিছু লেখা নেই, তাহলে কি সব ইজ্‌তিহাদ (অনুসন্ধান) বন্ধ? না যাবে না। বরং বৃদ্ধি পাবে। তা হবে কোরান ও সুন্নাহর আলোকে, এটাই ইসলামী আকিদা। ফার্সি কবিতায় এর বর্ণনা :

Carve out your ancient form
Create within you a new being
Such a being is your true being
Or else yourself is but smoke

প্রাচীন সভ্যতাগুলো ইতিহাসকে দেখেছে যে দৃষ্টিকোণ থেকে তার খানিকটা আলোচনা হতে পারে। বৈদিক সভ্যতায় কালকে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে, যা হল কলি দ্বাপর ত্রেতা ও সত্য। গ্রীকরা চরিত্রানুসারে তাদের ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে সাজিয়েছেন। তারা বলেছেন, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ইতিহাসকে করেছে গৌরবময় আবার 'অলিগারকি' বাড়িয়েছে শত্রুতা ও বক্রতা। চীন দেশে এই সাইকেল অন্যভাবে বিধৃত। আবার ইবনে খালদুনের বক্তব্য সম্পূর্ণ নতুন। স্বর্গ থেকে আদমের বিদায় খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনভাবে দেখা হয়েছে যা ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের সহ-অবস্থানকে মেনে নিয়েছে। গৃহযুদ্ধ, চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের হাত। এডওয়ার্ড গিবনের The history of the decline and fall of the Roman Empire (1776) গ্রন্থে যে রাজন্যের উত্থান ও অবসানের ইংগিত তা ইতিহাসের 'সাইকেল'কে সমর্থন করে। বর্তমানে এই 'সাইকেল'কে অধ্যয়ন করা হয়েছে সূক্ষ্ম ধর্মনিরপেক্ষ নতুন বিচারে। যা Peter Turchin-এর (Introduction to social macro dynamics) গ্রন্থে বিস্ময়করভাবে উপস্থাপিত। প্রগতির পথে এই অধ্যয়ন নিয়ে গেছে জার্মানীর অঁভশষধৎঁহম অর্থাৎ 'জ্ঞানউন্মেষণ' পর্যায়ে। কধহঃ ১৭৮৪ সালে লেখেন জ্ঞানউন্মেষণ কী? সংক্ষেপে আত্মচিন্তায় যা আসে, তাই 'জ্ঞানউন্মেষণ'। ইজ্‌তিহাদের সঙ্গে এর তফাৎ সামান্যই, আমার মতে।

Enlightenment is when a person leaves behind a state of immaturity and dependence *(Unmundigkeit)* for which they themselves were responsible. Immaturity and dependence are the inability to use one's own intellect without the direction of another. One is responsible for this immaturity and dependence, if its cause is not a lack of intelligence or education, but a lack of determination and courage to think without the direction of another. *Sapere aude! Dare to know!* is therefore the slogan of the Enlightenment.

লোকজীবনের সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে দর্শনের সন্ধান পাই, তা 'লোকায়ত দর্শন'। এটি ব্যাপক এবং গভীর লোকজ্ঞানের অধীন বিষয়, যার প্রারম্ভিক কথা মৎসম্পাদিত 'ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়। বাঙালি মুসলমানদের আত্মসমীক্ষা তো মাত্র সেদিন শুরু হল। ড. শাহাদাত হোসেন খানের লেখা The freedom of intellect movement in Bengali Muslim thought in 1926-1930 (Toronto, 1997) এর শুরু। ড. মোহাম্মদ শাহ-এর লেখা In search of identity : Bengali Muslim (1880-1940), 1996-এর সঙ্গে পঠিতব্য Understanding the Bengali Muslims (Interpretative Essays edited by Rafi Uddin Ahmed) (UPL)।

প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত করা যায়। আমার বিশ্বাস : 'বুদ্ধির মুক্তি' বলে কিছু নেই। আছে 'দাসত্ব'। Premise থাকতেই হবে। তা না হলে অভিজ্ঞান এগুবে না। পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে Reason I Spirit-এর বিচার ইতিহাসের দর্শনকে আন্দোলিত করে বৈকি। বিশ্বাস (Spirit) এই বিচারকে পৌঁছে দেয় এমন এক গভীর বলয়ে, যেখানে বিশ্বাসী নিজেই ঈশ্বরের মহিমায়।

ইতিহাস ও দ্বন্দ্ব

মো. আব্দুল আউয়াল

আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। তবু তো আমাদের ছাত্র জীবনে ইতিহাস পড়তে হয়েছে। স্কুল জীবনে যখন বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের ইতিহাস পড়তে হয়েছিল তখন বিষয়টি আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর ছিল। বিরক্তিকর হলেও ইতিহাস না পড়ে তো আমাদের উপায় ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত এটা আমরা কেন পড়ছি? এর প্রয়োজনীয়তাটা কী?

তখন আমাদের শুধু রাজা-বাদশাহের ইতিহাস পড়ানো হত। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ইতিহাস আমাদের পাঠ্যবইয়ে ছিল না। স্কুলজীবনের পরে এসে ব্যক্তিগত তাগিদ থেকে যে সব ইতিহাস পড়ার চেষ্টা করেছি, সেখানেও দেখা গেল অধিকাংশ মানুষের যে ইতিহাস সেটা অনুপস্থিত।

আমরা যদি একটা প্রশ্ন তুলি, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যে মুসলমান, এই মুসলমান হওয়ার ইতিহাসটা কী? আমরা কি সেই ইতিহাসটা আসলে জানি? তার চেয়ে বড় কথা সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে কি-না; আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের উৎস সম্পর্কেই যদি না-জানি, তাহলে আমাদের গন্তব্যটা কী হবে? কাজেই মানুষ হিসেবে এই যে জন্মগ্রহণ করা, বেড়ে-ওঠা ইত্যাদি-সংক্রান্ত সঠিক ইতিহাস লিখিত হওয়া এবং সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি। অথচ সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি; সে কারণে আমাদের পক্ষে আমাদের উৎস সম্পর্কে জানাও সম্ভব হয়নি। আমরা পাঠ্যবইয়ে মোগলদের ইতিহাস যতটা পেয়েছিলাম, বৃটিশদের দু'শ বছরের ইতিহাস ততটা পাইনি। আমার জানা মতে বৃটিশদের দীর্ঘসময় ধরে যে রাজত্বকাল চলেছে তারও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি। শুধু তাই নয়, নিকট অতীতে সংঘটিত হয়ে গেল যে মহান মুক্তিযুদ্ধ তার প্রকৃত ইতিহাসও তো লিখিত হয়নি।

কাজেই এই সকল ইতিহাস লেখা ভীষণ জরুরি কাজ বলে আমি মনে করি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গত ত্রিশ বছরে যে কত রকম অস্বীকারের প্রচেষ্টা চলল, সেটা সত্যিই দুঃখজনক। কাজেই ইতিহাস লিখলেই হবে না, ইতিহাসকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং সত্য হতে হবে। একটি সত্যকে অস্বীকার করতে চাইলেই সেটা মিথ্যা হয়ে যায় না। বরং সেই অপচেষ্টা এক সময়ে ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তো আমাদের পরবর্তী জেনারেশন ভালো করে জানেনই না আর তার আগের কথা যদি বলি সেটা তো হবে আরও ভয়াবহ; সেক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহম্মদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইটি অত্যন্ত পাঠযোগ্য। আমি মনে করি এ বইটি প্রত্যেকের পড়া উচিত।

বৃটিশ আমলের শেষ দিকে বৃটিশদের শাসন-শোষণ কী রূপ ধারণ করেছিল, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব কেমন ছিল, অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের দিক থেকে কোন পর্যায়ে ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো মনসুর আহম্মদ সাহেবের ঐ বইয়ে আছে।

দুই

একটি ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লাগে; আমাদের যে শিশুকাল থেকে চিন্তা ও মননের অঙ্কুরোগম, সেই শিশুকালের যাত্রাকে যেভাবে অবহেলা করা হয়– বিষয়টি আমার কাছে বোধগম্য নয়। যত কথাই বলি সবার আগে তো আমাদের শিশুকাল, শৈশবকালকে ভালোভাবে সুস্থ পরিবেশে বাড়তে দিতে হবে। কিন্তু সর্বস্তরে এই বিষয়টি ভীষণভাবে অবহেলিত। প্রশ্ন হল এখান থেকে উত্তরণের উপায়টা তাহলে কী? একজন মানুষের ইতিহাসের মধ্যেই কিন্তু তাঁর দর্শনটাও নিহিত। শ্রদ্ধাভাজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার আলোকিত মানুষের কথা বলেন, কথা হল এই আলোকিত মানুষ সৃষ্টির যাত্রাটাই যদি অবহেলার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই জাতির পুষ্টিসাধন হবে কীভাবে? সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বেশি যত্ন নিতে হবে, নজর দিতে হবে এখানে। যারা ইতিহাস লিখবেন এবং যাদের ইতিহাস লিখবেন সেই মানুষের শিশু ও শৈশবকাল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়ে সে যা গ্রহণ করে, সারা জীবন ধরে সে সেটা নির্গত করতে থাকে। আমাদের এখানে এত অসততা, দুর্নীতি, মিথ্যাচার– এ সবেরকারণ কিন্তু ঐ শিশু ও শৈশবের যে মানস গঠন, তার মধ্যে নিহিত থাকে। সুতরাং এখান থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের বেড়ে-ওঠার ইতিহাসের মধ্যে যেখানেই গলদ সেখানেই নজর দিতে হবে উপযুক্তভাবে।

তিন

ছোট বেলায় আমি আমার বাবার সঙ্গে হিন্দুদের বাড়িতে পূজা দেখতে যেতাম, তারাও ঈদের দিনে আমাদের বাড়িতে আসত। সেখানে হিন্দুদের সাথে আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি। আমার ধারণা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাধারণ যারা তাদের সম্পর্ক ভালো ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দ্বন্দ্ব বিরাজ করত জমিদারদের সাথে মুসলমানদের এবং উচ্চবর্গের হিন্দুদের সাথে নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। কাজেই হিন্দু-মুসলমানদের যে দ্বন্দ্ব সেটা আসলে শ্রেণীগত দ্বন্দ্বই ছিল।

'You can win', `Living with honour', এবং 'Freedom is not free' এই তিনটি বইয়ের বিখ্যাত ভারতীয় লেখক শিব খেরো বলেছেন, 'যে শিশু জন্মের পরই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সেই শিশু বড় হয়ে কী আর করবে'। কথাটি আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান জন্মের পরই এ-দেশ দু'টি নানা দিক থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ল, কাজেই এই অসুখ সারা খুবই দুরূহ।

আজ আমরা যদি সিঙ্গাপুরের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে, তারা মালয়েশিয়ার সাথে যোগ দিয়ে আবার দুই বছর পর সেখান থেকে বেরিয়েও গেল; সেই সময়টা তাদের জন্য কত না কষ্টের এবং কঠিন ছিল। সিঙ্গাপুরের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে। তারা কী করে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে প্রথম কাতারের দেশে পরিণত হল! তাদের ইতিহাসটা তাহলে কী, তাদের দর্শনটাই-বা কী– সেটা আজ আমাদের অবশ্যই জানতে-বুঝতে

হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে জাপান বর্তমানের এই অবস্থায় কী করে আসলো? তারা আজ বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে– কিন্তু কীভাবে তারা করল– সেটা আমাদের জানা দরকার।

LEE KUAN YEW তাঁর From Third World to First (The Singapore Story 1965-2000) গ্রন্থে লিখেছেন,

On my first official visit to America in October 1967, I recounted to 50 businessmen at a luncheon in Chicago how Singapore had grown from a village of 120 fishermen in 1819 to become a metropolis of two million. This was because its philosophy was to provide goods and services "cheaper and better than anyone else, or perish". They responded well because I was not putting my hand out for aid, which they had come to expect of leaders from newly independent countries. I noted their favourable reaction to my "no begging bowl" approach.

একই বইয়ের অন্যত্র LEE KUAN YEW লিখেছেন,

Assistance should provide Singapore with jobs through industries and not make us dependent on perpetual injections of aid. I warned our workers,"the world does not owe us a living. We cannot live by the begging bowl."

অন্যদিকে NGIAM TONG DOW যিনি LEE KUAN YEW সরকারের অন্যতম সদস্য হিসেবে একাধারে শিল্প ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং of Economic Development Board (EDB) ও Housing Development Board (HDB) -এর চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁর 'A Mandarin and the making of public policy' গ্রন্থে লিখেছেন,

Dr Winsemius told that as a foreigner he can only advise, and not steer the ship for us. He can teach me how to drive or even repair the car, but I as Singaporean have no choice but to steer the ship, drive the car. or pilot the plane myself. In corporate terms, a Singaporean must be the CEO of a Singapore corporation. Even if we were to crash the vehicle, we should have the satisfaction of doing it ourselves. Others should not have to do it for us. We should be in control of our own destiny.

তিনি তাঁর একই গ্রন্থে আরও লিখেছেন, Continuity of policies is only possible if a country enjoys political stability. The post-independence generation, born after 1965, are now young parents themselves and have taken the political stability of Singapore for granted. Without the leadership of Mr Lee Kuan Yew and his first generation founding colleagues, Singapore could well be another sorry third world story.

কাজেই সিঙ্গাপুর কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে প্রথম বিশ্বের তালিকায় আসলো সেটা আমাদের জানা দরকার। এবং আমরা যদি তাদের সেই ইতিহাস আংশিকও অনুসরণ করি তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশও প্রথম বিশ্বের তালিকায় চলে যেতে পারে। বাংলাদেশের সেই সম্পদ ও জনশক্তি রয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসও তো বেশি দিনের পুরনো নয়– তারা তো সারা বিশ্বকেই নিজের করে নিয়েছে। জানি আমেরিকার অনেক কিছুই আছে যা কখনো প্রশংসার দাবি তো রাখেই না, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে সেগুলো কলঙ্ক হয়ে থাকবে। কিন্তু তারপরও আমেরিকার ভালো দিকগুলো আমরা তো গ্রহণ করতে পারি।

সুতরাং বিশেষ করে বিশ্বে যে সমস্ত দেশ আজ উন্নত অথচ এক সময়ে এই দেশগুলোরই অত্যন্ত নাজুক অবস্থা ছিল, সে সব দেশের ইতিহাসটা কী তা আমাদের জানা একান্তভাবে জরুরি। জাপানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমি একটা বিষয় জানি, সেটা হল, জাপানের মানুষ একসময় এমনই আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল যে, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটা পাউরুটি জুটত; সেই পাউরুটির ভেতরকার নরম অংশটুকু শিশু বাচ্চাদের খেতে দিত আর পাউরুটির চারপাশের শক্ত অংশটুকু বাবা-মা খেয়ে কোনোমতে দিনযাপন করতেন। এটা ঘটেছিল আর্থিক অভাবের কারণে। কাজেই এই সাধারণ বিষয়টি থেকে কিন্তু পুরো জাপানের আর্থিক ইতিহাসটা কী সেটা খানিকটা আন্দাজ করা যায়– আজকে সেই জাপান কোথায় পৌঁছেছে? কীভাবে পৌঁছেছে? এর সঠিক জবাব জানার জন্য জাপান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের দর্শন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে। বাংলাদেশকে যদি তার বর্তমান অবস্থা থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে অন্তত গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের মধ্য থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে– এবং সেই অনুসারে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গত সাঁইত্রিশ বছরের ইতিহাস নিয়েও যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা কী কী ভুল করে এই অবস্থায় এসেছি সেটা জানতে বুঝতে পারব। আর সেই ভুলকে কী কী উপায়ে অতিক্রম করা সম্ভব সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই কিন্তু আমাদের ইতিহাসটা কী হতে পারত অথচ কী হয়েছে সেই দর্শনটা আবিষ্কার করতে পারব। আমাদের প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য হল, আমাদের দূরদৃষ্টি কখনোই ছিল না, এখনও নেই। আমাদের যখন যেটা দরকার হয়েছে আমরা তখন বিচ্ছিন্নভাবে সেটাই করেছি। এখনো সেভাবেই

করে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি চলমান সময়ের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করছি, সেটা হল, রাজউকের প্লট বরাদ্দের জন্য যত আবেদন পড়েছে, তার মধ্যে বিভিন্ন পেশা-শ্রেণীর মানুষ আছে যারা লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ পাবেন। প্রশ্ন হল, সংসদ সদস্যরা যেমন দেশের নাগরিক একইভাবে অন্য পেশা-শ্রেণীর মানুষও এদেশেরই নাগরিক। কাজেই সবাই যেখানে লটারির মাধ্যমে প্লট পাবেন একইভাবে সংসদ সদস্যদের বেলায়ও এই লটারি পদ্ধতির বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে বড় কথা, এখনো যদি ফ্ল্যাটের দিকে না-গিয়ে শুধু প্লট প্লট করি– তাহলে এত প্লট রাজউক পাবে কোথায়? অথচ মানুষের আবাসের জন্য কিন্তু প্লট দরকার নেই, দরকার হল বাসযোগ্য সুস্থ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। সুতরাং প্রথমত ফ্ল্যাটের পরিবর্তে এতগুলো প্লট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত একটি ঐতিহাসিক ভুল এবং সংসদ সদস্যরা লটারি না করেই প্লট বরাদ্দ নেবেন, সেটা হবে অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত। পূর্বেও আমরা এরকম ভুল অনেক করেছি। আজকে দেখা যাচ্ছে রাজউক প্লট দিয়েই যাচ্ছে, প্রশ্ন হল রাজউক এত প্লট কোথায় পাবে। আমি যদি বলি পনের কোটি মানুষকে একটি করে কবরের জায়গা দিতে হবে, সরকার কি সেটা পারবে দিতে? সুতরাং আজকের এই ভুল বিষয় ভবিষ্যতে যে ইতিহাস তৈরি করবে তার অন্তর্গত দর্শন কী সেটা অনুসন্ধান করা এবং সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আজ অতি জরুরি। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, আবাদী জমি ধ্বংস করে যেভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে, সেটাও আমাদের জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়।

চার

সব শেষে বলা যায়, ইতিহাস কখনো রচনা করার বিষয় নয়; চেষ্টা করে পরিকল্পনা করে ইতিহাস লেখা যায় না। যা ঘটে যা সত্য সেটা লিপিবদ্ধ করার নামই ইতিহাস। পক্ষান্তরে ইতিহাস রচনা করতে গেলে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করা হতে পারে। আমাদের চারপাশে যে সব ইতিহাস লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশই অবশ্য সে রকম। অর্থাৎ সত্যকে আড়াল করে বা পাশ কাটিয়ে ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথাই যদি বলি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে নিয়ে কত রকম ইতিহাসই-না সাজানো হল। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইতিহাসের মাধ্যমে তুলে ধরতে চায়, তাহলে কি বঙ্গবন্ধুর অবদানকে কেউ অস্বীকার বা খাটো করতে পারবে? সুতরাং ইতিহাসের দর্শন, বিষয়টি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কী ধরনের দর্শন থেকে বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে বাদ দিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে আবার কী ধরনের দর্শন থেকে তাকে দেবতার আসনে নিয়ে যাওয়া হয়– দু' দিকেরই চরম অবস্থানের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে বাদ দিয়ে কি বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব? সেটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয়। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদানকেও খাটো করে দেখা সমীচীন নয়।

আবার হঠাৎ করেই এক দিনে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়ে যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরির জন্য নানা ধাপ পাড়ি দিয়ে বাংলার মানুষ একটি চূড়ান্ত মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছিল। সেক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর অবদানও কম ছিল না। মওলানা ভাসানী নানা আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন, যার মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনাকে মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। কাজেই যার যা প্রাপ্য আমরা সেটা যদি সঠিকভাবে তাদের দিতে পারি, প্রত্যেকের অবদানের কথা যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারি, তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এবং এভাবে যে ইতিহাস লেখা হবে তার গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হবে অনেক বেশি। ফলে বারবার আর ইতিহাস লেখার প্রয়োজন দেখা দেবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্থানের পক্ষে জেনারেল নিয়াজি যখন মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন, তখন সেই স্থলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি কেন উপস্থিত ছিলেন না, সেই প্রশ্নের জবাব কিন্তু আজও আমরা জানি না। তাহলে কি তাঁকে সেদিন উপস্থিত হতে দেয়া হয়নি? যদি তাই হয়, তারই-বা শেকড় কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন তিনি নিজেই উপস্থিত থাকতে চাননি। তাই যদি হয়, তাহলে কেন তিনি তা চাননি– সেই প্রশ্নের উত্তরও জানা দরকার। সেই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, এর মাধ্যমে আসলে আমরা কী অর্জন করেছি? আমার তো মনে হয় কোন অর্জন তো আমাদের হয়ইনি বরং হারিয়েছে অনেক কিছুই। যার মধ্যে অন্যতম হল একটি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক-এর প্রাপ্য সন্মান যেমন দেয়া হয়নি, এবং এর ফলে আমাদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও আমরা হারিয়েছি।

ইতিহাস অনেক বিষয়েরই হতে পারে; ইতিহাস ব্যতীত কোনো উপায় কি আছে অতীতকে জানবার; আমার মনে হয় নেই। সুতরাং ইতিহাসের দর্শন তো তখনই বিবেচ্য হবে যখন ইতিহাস লেখা হবে। আমাদের অধিকাংশ বিষয়েরই ইতিহাস লেখা হয়নি। সুতরাং সেই সব ইতিহাস লেখা দরকার। সেই ইতিহাস কে লিখবেন? কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, গন্তব্য ঠিক করে তো ইতিহাস লেখা যাবে না। ইতিহাসকে তার নিজের পথেই চলতে দিতে হবে। তাছাড়া যার লোভ-লালসা নেই, নৈতিকতা রয়েছে, সত্যকে যার কাছে মনে হয় স্বাভাবিক সেই ব্যক্তিই পারেন ইতিহাস লিখতে। সুতরাং কোন কোন বিষয়ের ইতিহাস লিখতে হবে সেটা ঠিক করে নিতে হবে সবার আগে। আমি তো মনে করি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ হিসেবে সবার আগে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। আমাদের এই সীমাহীন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। কাজেই অর্থনীতির ইতিহাস লেখা দরকার সবার আগে। এই ধরনের ইতিহাস লিখিত হলে তার ভেতরকার দর্শনটাও আমরা পেয়ে যাব। ইতিহাস হল অতীত, যা ভবিষ্যতের পথ দেখায়।

অতীতই আমরা জানি না, তাহলে ভবিষ্যৎ আমরা কীভাবে দেখব? কাজেই ভবিষ্যৎ আমরা তখনই দেখব যখন অতীত সম্পর্কে আমরা জানতে ও বুঝতে পারব।

নিজের অতীত জানলেই হবে না বরং জানতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির অতীতও। আর তখনই আমরা তুলনা করতে পারব যে, আমাদের অবস্থান ইতিহাসে আসলে কোথায়। এখন তো হাতির পাঁচ পা দেখার মতো আমরা অনেকটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা বলি। সুতরাং সেখান থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ হতে হবে।

ইতিহাসের দর্শন ও নারীর জীবন

ফে র দৌ সী সু ল তা না

কন্যা জায়া জননী। তিন রূপে প্রধানত দেখি আমরা নারীকে। যুগে যুগে নারীরা এই তিন রূপে তার ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। জন্মের পর যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়, তারস্বরে চিৎকার করে সে জানান দেয় তার উপস্থিতি, সে নবজাতক। তার এই চিৎকার অস্তিত্ব রক্ষার চিৎকার; নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার মধ্যে কন্যাশিশু আর পুত্রশিশুর কি কোনো পার্থক্য আছে? না নেই। পার্থক্য তো তৈরি হয় তার পরে। সমাজ-সভ্যতার গোড়ার দিকে তাকালে আমরা দেখি তখন মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক প্রথা ছিল। সে সময় পরিবারকে শাসন করতেন নারীরা।

কালক্রমে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় পরিবারের ক্ষমতা, সম্পত্তির অধিকার এবং সামাজিক ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে পুরুষের অধিকারে চলে গেল। শুরু হল নারীর অবমূল্যায়ন, শোষণ, যন্ত্রণা, নিপীড়ন। এগুলো ইতিহাসেরই কথা। আমরা জেনেছি। দেখিনি।

মহিলাদের অসূর্যম্পর্শা, পর্দাপ্রথার নামে গৃহবন্দী করে রাখার কথা আমরা জানি।

এমন একটা সময় এল যখন কন্যাসন্তান জন্মানো ছিল পাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যাসন্তান জন্মানোর পরপরই হত্যা করা হত। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থেই এই প্রবণতা হ্রাস পেলেও নারীর প্রতি নিপীড়নের মাত্রা তাতে বিন্দুমাত্র কমল না। বরং গোটা ভারতবর্ষে হিন্দু নারীদের স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে বিধবা স্ত্রীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত সতীদাহ প্রথা বা সহমরণের ধর্মীয় আবরণের মাধ্যমে।

রাজা রামমোহন রায় এই ধর্মীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। রহিত করলেন সতীদাহ প্রথা। কিন্তু বৈধব্যের নানা বিধিনিষেধ, আচার-আচরণ ইত্যাদির নামে বিধবা মহিলাদের যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত তা এখনো অব্যাহত আছে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, বর্তমানে ভারতে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ বা ডিভোর্স করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যা আগে ছিল না। কিন্তু ভারতের উগ্র হিন্দু মৌলবাদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষবাষ্প ছড়িয়ে রেখেছে তাতে এই সুফল খুব কম মানুষই ভোগ করতে পারছে। আর বাংলাদেশে? হিন্দু আইনের বিষয়ে তেমন কি কোনো অগ্রগতি হয়েছে? আমাদের দেশে হিন্দু নারীর চিত্র তো আরো করুণ আর ভয়াবহ। নারী বিয়ের পর স্বামীর সংসারে চলে যায়। পিতার সম্পত্তিতে তার আর কোনো অধিকার থাকে না। আমাদের মুসলিম নারীরা পিতার সম্পত্তিতে যে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার ভোগ করেন হিন্দু নারীরা তা পান না। মুসলিম নারীরা স্বামীকে তালাক প্রদানের অধিকার পেলেও হিন্দু নারীরা এ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। বাংলাদেশে মুসলিম মহিলাদেরই প্রকৃত অবস্থান কী? প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে তাকালে উগ্র মৌলবাদের যে বিভীষিকা চোখে পড়ে, মহিলাদের ওপর দমন-নিপীড়নের যে-চিত্র সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখতে পাই তার সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কি সমাজপতিরা করেছেন? করার উদ্যোগ নিয়েছেন? সাম্প্রতিক সময়ে নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে যে উদ্যোগ ফখরুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তার ফলে বিশেষ করে ধর্মীয় লেবাসধারী আমাদের সব শ্রেণী-পেশার জাতি কীভাবে তা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন তা আমরা দেখেছি। এসময় সুশীল সমাজের, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ইতিবাচক সক্রিয় ভূমিকাও কি আমরা দেখেছি? এবং এসব ঘটনা অতীতের বহু ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে যা বর্ণনা করা হল তা-ও ইতিহাস থেকেই নেয়া, আজকের ঘটনাই ভবিষ্যতের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সমাজের বড় বড় চিত্রগুলো ধারণ করে আছে। ইতিহাস গ্রন্থে যে যুগ পরিবর্তনের বিভিন্ন মনোলোভা বিবরণ আছে তা-ও আমরা জানি। কিন্তু আদিকাল

থেকে আজ পর্যন্ত কি এই উপ-মহাদেশে কি সারা পৃথিবীতে নারীর অধিকার আর নারীর আত্মত্যাগের যে পারস্পরিক সমান্তরাল অবস্থান, তাতে খুব একটা পার্থক্য কিন্তু ঘটেনি ।

যে কন্যাশিশু বেড়ে উঠছে পুত্রশিশুর সাথে তাদের ভরণ-পোষণ বা লালন-পালনে খুব যে পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে করা হচ্ছে তা কিন্তু নয় । বিভেদ অথবা পার্থক্যটা শুরু হয় আরও পরে । ভাই-বোন বাবা-মায়ের স্নেহের ছায়ায় বড় হয়ে ওঠে । লেখাপড়ায়ও আজকাল খুব একটা পার্থক্য নির্ণীত হয় না । তবে বোনটিকে যখন পাত্রস্থ করা হয়, তখন থেকেই শুরু হয় বৈষম্য । বাবার সম্পত্তির অধিকার থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হয় সে । ভালো বরের কাছে ভালো ঘরে তাকে পাত্রস্থ করা হল এতেই যেন সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল অধিকাংশ পিতামাতার ।

স্বামীর ঘরে, শ্বশুর-শাশুরি-ননদ-দেবর সহ শুরু হয় নতুন করে নতুন পরিবেশে আবার যাত্রা । এখানে নতুন বউ বলে তার আমিত্ব বলে কিছুই থাকে না । এই পরিবেশের সব কিছুকে নিজের ঘাড়ে নেবার দায় যেন নববধূরই । যে যত বেশি নিপুনভাবে নিজেকে , নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়ে নতুন সংসারকে আপন করে নেবে সেই হবে শ্রেষ্ঠ বধূ । চাকরিজীবী বধূ-কে অফিস থেকে এসে প্রতিদিনই সংসারের হাল ধরতে হয় । রাত থেকে সকালের নাশতা পর্যন্ত সাংসারিক সমস্ত কাজের দায় সামাল দিয়েই তবে অফিস । দশভূজা মহামায়ার মতো সর্বকাজে কাজি হতেই হবে তাকে । না হলে সে সংসারে বিপত্তি । যদি শুধু স্বামী-স্ত্রীর সংসার হয় সেখানেও চিত্র কিন্তু তেমন পরিবর্তিত হয় না । অফিস-ফেরত স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম । আর-অফিস ফেরত স্ত্রীর সকল অসুবিধা হেয় জ্ঞান করাও পতির ধর্ম । এ তো চলছেই, চলবে । সংসারে নতুন অতিথি এলে নববধূ জননীতে রূপান্তরিত হয় । কাজের দায়িত্ব বাড়ে । ছেলে-মেয়ের যত্ন-আত্তি আর লেখা-পড়ার সব ঝক্কি মায়ের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় হয়ে ওঠে মনোরম । ছেলে-মেয়ের সাফল্যে বংশের রশ্মি বাড়ে, বাবার মুখ উজ্জ্বল হয় আর ব্যর্থতার গ্লানি মায়ের মুখে তমসার গাঢ়তর কালিমা লেপে দেয় । অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই মায়ের কোনো লালন-পালনে ঘাটতি ছিল তাই সন্তানের এই অবনতি ।

ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার পাট চুকলে তাদের ব্যবসায় অথবা চাকরি এবং পরে বিয়ে ইত্যাদির আয়োজন । শুরু হয় তৃতীয় অধ্যায় । এখানে ছেলের সংসারে বৃদ্ধা মায়ের অবস্থান– নতজানু । অথবা মূল্যহীন পরজীবী গাছের মতো । অস্তিত্ব জানান দিতেও লজ্জা, না দিয়েও পারা যায় না । এই হল এই উপমহাদেশের চিত্র । এবার আসা যাক চাকরিজীবী মহিলার কর্মক্ষেত্রে । এখানে তুমুল প্রতিযোগিতা । নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য নীরব লড়াই সহকর্মীদের সাথে । এখানে বেতন বৈষম্য, প্রমোশন বৈষম্য তথা জেন্ডার বৈষম্য তো রয়েছেই সর্বোপরি মহিলা সহকর্মীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদমনের অবিরাম প্রচেষ্টা বর্তমান । এই সব ঝামেলাকে প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ করে বা সামাল দিয়ে যে অর্জন তার সামাজিক ব্যাখ্যাও অনেক সময় মনকে ব্যথিত করে । তারপরেও সমাজ বদলাচ্ছে, মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে এরকম মনে হলে হাস্যকর সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় । কিন্তু যখন পৃথিবীব্যাপী নারীদের জীবনধারণের রকমফের থাকলেও কোনো-না-কোনো জায়গায়, কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে নারীর প্রতি একইরূপে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে তখন সত্যিই মনে হয় বৃথা এ পণ্ডশ্রম । আর নারীর ইতিহাসের প্রকৃতি দর্শনও তাই ।

এমেলিয়া জেন্টেলম্যান, ৪ মার্চ, ২০০৯ দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় "Growth in violence against women feared as recession hits" নামে যে আর্টিকেল লিখেছেন তা পড়ে ধারণা করতে পারবেন অনায়াসে যে, শুধু আদিকালে নয়, শুধু ভারতবর্ষে বা অনুন্নত দেশেই নয় মহিলাদের প্রতি বৈষম্য সব দেশে সর্বকালে প্রায় একই রকম । এই আর্টিকেলে দেখান হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দায় মহিলারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । চাকরি হারাচ্ছেন সন্তানসম্ভবা মা, মাতৃত্ব ছুটি ভোগরত মহিলা অথবা খণ্ডকালীন চাকরিজীবী মহিলা । অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অনেকের সংসার ভেঙে যাচ্ছে, বাড়ছে ফ্যামিলি ক্রাইম । এই আর্টিকেলে আরও বলা হয়েছে, ইক্যুয়াল অপরচুনিটি কমিশনের জরিপে দেখা যায়, শুধু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে নয়, স্বাভাবিক অবস্থায়ও বছরে ৩০ হাজার মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে বা মাতৃকালীন ছুটিজনিত কারণে চাকুরিচ্যুত হয় ।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য নিউইয়র্কে সরকারি কর্মকর্তা, জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের ৫৩ তম সেশন অনুষ্ঠিত হয় । এসময় অর্থনৈতিক মন্দায় মহিলাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সবচাইতে বেশি প্রাধান্য পায় আলোচনায় ।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন অধিবেশনে জানান পৃথিবীব্যাপী পাঁচ জন মহিলার মধ্যে এক জন যৌন হয়রানির শিকার হন এবং কোথাও কোথাও তিন জনের মধ্যে এক জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন । (সূত্রঃ US meeting assesses effects of global recession on women, by William Eagle, Washington on 09th March2009)

আমরা যদি আরো উদাহরণ চাই পেতে পারি অনায়াসে । কিন্তু সব ছবিই একই কথা বলবে । তাহলে কী দাঁড়াল বিষয়টি? উন্নয়নশীল অথবা উন্নত যে দেশই হোক না কেন, যে জাতিই হোক না কেন, কী সাহিত্যে, কী সঙ্গীতে, কী বক্তৃতায় আমরা মহিলাদের শ্রদ্ধা জানাই, ভালোও বাসি– কিন্তু বাস্তবে ? রূঢ়, কঠিন হলেও সত্য আমরা তাদের অবদমিত করি প্রতি পদে পদে । জীবনকে সুন্দর, উপভোগ্য এবং মোহনীয় করে যে নারী, যাকে ছাড়া সৃষ্টি অসম্ভব, সেই সুন্দর সত্যকে আমরা যতদিন সম্মান না করব, যতদিন সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দেব, সমাজ এবং রাষ্ট্রে অবিমিশ্র অমিতাচার আমাদের জড়িয়ে ধরবে ।

About.Com: Women in Business কলামে Lahle Wolfe : Gender discrimination against women : From cradle to CEO :childhood stereotyping sets the stage for business women বিষয়ক লেখায় দেখিয়েছেন শৈশবেই বালিকারা মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট চাকরি এবং ভালো স্ত্রী ও মা হওয়াই একজন মহিলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য– এই ধারণা নিয়েই তারা বড় হয়ে ওঠে। এবং এই অসত্য ধারণা তাদের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয় যে, করপোরেট ওর্য়াল্ড-এর high powered job তাদের জন্য suitable নয়। তিনি তার লেখার তিন স্তরে এর প্রয়োগ দেখান এই ভাবে: প্রাথমিক (elementary) স্কুলে শিক্ষকগণ ছেলেদের-কে অংক এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় বেশি উৎসাহিত করেন এবং মেয়েদের ষধহমঁধমব বা আর্টস পড়তে উৎসাহিত করেন। এতেই বোঝা যায় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বালকদের অংক এবং বিজ্ঞানে উৎসাহী করে বোঝানো হয় তারা প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞানে পারদর্শী হবে কেননা এগুলো ছেলেদের জন্যই। আর মেয়েরা পড়বে নান্দনিক শিল্প এবং কলা। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (middle and high school) স্তরে : এসময় ছেলেদের খেলাধূলা, বিতর্ক, বিজ্ঞান এবং অংক বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। আর মেয়েদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, স্বেচ্ছামূলক কাজ ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হয়। কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের উৎসাহিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা হয়, তথাকথিত মহিলা বিষয়ক চাকরি যেমন সেবাকর্মী, নার্স, শিক্ষিকা, রিটেইল এবং অফিস প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে। অথচ মহিলারা পুরুষের মতোই শিক্ষার সকল স্তরেই কিন্তু ডিগ্রি অর্জন করছে এমনকি হায়ার গ্রেড এবং অনার্স লেভেলেও। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে চ্যালেঞ্জিং জব গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের শিক্ষাজীবনের কোনো ডিগ্রিই কাজে লাগছে না। যেখানে ছেলেরা এসব ক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষা এমনকি PHD ডিগ্রিও অর্জন করেছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মহিলারা ছেলেদের চেয়ে শিক্ষিত বেশি হচ্ছে। বেশি ডিগ্রিও অর্জন করছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অব লেবার-এর ২০০৭-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় মহিলারা মাঠ পর্যায়ে এবং শিল্পক্ষেত্রে মহিলা হিসেবেই চিহ্নিত হচ্ছে। ২০০৬-এর CNN Money-এর সমীক্ষা অনুযায়ী বিখ্যাত ৫০০ কোম্পানিতে কেবলমাত্র ১০ জন মহিলা রয়েছেন শীর্ষ পর্যায়ে এবং ১০০০ শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ২০ জন শীর্ষস্থানীয় মহিলা এক্সিকিউটিভ। (সূত্র: ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন সায়েন্স, ন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস, ইউনাইটেড স্টক ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন, ফাস্ট ফ্যাক্টস, একসেসড এপ্রিল-২০০৮)। আমরা অনেকে মনে করি যে, ইউরোপীয়-আমেরিকান দেশগুলো সকল ক্ষেত্রেই বেশি সভ্য এবং ন্যায়পরায়ণ। তারা-ছেলে মেয়ে এধরনের পাথর্ক্য নিরূপণে অভ্যস্ত নয়। তারা মানুষ হিসেবেই নারীকেও গণ্য করে। আমাদের এই ধারণা কতখানি অসত্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তা জানানোর একটি তাগিদ থেকে এই নিবন্ধটিতে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করা হল। নারী জন্মলগ্ন থেকে তার চারপাশের পরিবেশ এবং পরিমণ্ডল দেখে। তার প্রতি অন্যের আচরণ দেখে শিশু বয়সেই অনুভব করে সে মূখ্য নয়, গৌণ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নানা এসব কারণেই নারী সমতায় আসতে পারেনি। ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন দু'এক জন শাসক, অসামান্য গুণবতী কোনো সম্রাজ্ঞী'র অবস্থান ছাড়া ধারাবাহিকভাবে নারীর কোনো ক্ষমতায়নের ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। দেখি না।

আমাদের দেশে যদিও ১৬/১৭ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী কিন্তু তারা দু'জনেই পিতা বা স্বামীর পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত, নিজ গুণে বা রাজনৈতিক ধারাবাহিক প্রজ্ঞায় তারা ঐ অবস্থানে অধিষ্ঠিত নন। প্রাচ্য শুধু নয়, পাশ্চাত্যের দিকে তাকালেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতার চিত্র নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলেই প্রতীয়মান হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যদিও পৃথিবীতে নারীই অধিকাংশ শ্রম দিয়ে থাকে কিন্তু সম্পদে নারীর অধিকার প্রায় অস্বীকৃত। যদিও অনেক দেশে নারী-পুরুষ সমভাবে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে কিন্তু আমাদের মতো বেশ কিছু দেশে সম্পত্তির অধিকার ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখনো অনেক উন্নত দেশেই একই শ্রমের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী কম মজুরি পায় আর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদে মেয়েদের সংখ্যাও কম।

এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই, নারীকে বেছে নিতে হয় মাতৃত্ব অথবা পেশার মধ্যে যেকোনো একটি। অর্থাৎ লিঙ্গ ভূমিকায় এই ভারও নারীর ওপর বর্তায়। পুরুষ এখানে মুক্ত বিহঙ্গ।

নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং শ্রেণীভেদে এই বৈষম্যের নীরব নীতি প্রতিপদেই প্রতীয়মান। ফিরে আসি আমার বাংলাদেশে। বাংলাদেশের নারী তো জলজ গাছ। ভেসে বেড়ায় কচুরিপানার মতো। আজ কন্যা– পিতার আশ্রয়ে, কাল বধূ– স্বামীর ছায়ায়, পরশু মাতা– ছেলের তত্ত্বাবধানে। এই করে কেটে যায় অধিকাংশ নারীর জীবন। জীবনের যা কিছু অর্জন সব সংসারের সীমানায়, সংসারের চৌহদ্দিতে পরিবারের সদস্যদের উৎকর্ষের জন্য ব্যয় করে তৃপ্ত হয়। নারী– জননী। সন্তানের সুখের জন্য নিজের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস বাজি রেখে লালন-পালন করেন তিনি শিশুকে। সে শিশু বড় হয়। তাকে ঘিরে রচিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মা। তিলে তিলে বড় হয়ে ওঠা সন্তানের অনাগত ভবিষ্যতের সামনের জঞ্জাল সরান তিনি নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। সন্তানের সুখই মায়ের সুখ। এই নারীর জীবন তখনই সার্থক হয় যখন সন্তান সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সেই মাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহতালা উল্লেখ করেছেন সুস্পষ্টভাবে–' মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত'– এ থেকেই বোঝা যায় মায়ের স্থান কত উপরে।

মাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিলে তাতেই সন্তানের সুখ। কন্যা-জায়া-জননী নারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমরা এই জাগতিক জীবনে নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ না করে নারীর জীবনযাপনে পুরুষের সমান অধিকার দিলে, সমাজ-রাষ্ট্র-সর্বোপরি এই বিশ্ব আরো সুন্দর আর মধুর হয়ে উঠবে। এবং সেদিনই পৃথিবীর বুকে নারীর সত্যিকারের ইতিহাস মাথা সোজা করে দাঁড়াবে নিজস্ব মানবিক দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে।

ইতিহাসের দর্শনে বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান

ই স রা ই ল খা ন

বাংলাভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রগতিশীল বলে খ্যাত ঐতিহাসিকগণও সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি। তাই বাঙালির বিভিন্ন বিষয়ের যে-সকল 'ইতিহাস' লেখা হয়েছে; তাতে পক্ষপাতদুষ্ট ধর্মীয় আনুগত্যই প্রকটরূপে ধরা দিয়েছে। কারণ 'বাঙলার' ইতিহাসকারগণের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তাঁরা অধিকাংশই এসেছেন বর্ণহিন্দুর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, যদুনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়– সকলেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যে-সমাজ ও পরিবার থেকে সে সব সমাজ ও পরিবারের ছিল মুসলমানদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্য। সে কারণে মুসলমানদের প্রতি উল্লিখিত ইতিহাসকারগণেরও ছিল প্রকাশ্য অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ও বিরক্তি। মুসলমানদের সম্পর্কে এদের ন্যূনতম অনুরাগ ও সম্প্রীতির সদিচ্ছা পর্যন্ত ছিল না। ফলে পাশাপাশি বাস করলেও মুসলমানদের সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, নাটক ও অন্যান্য শিল্প সম্পর্কে তাঁরা রয়ে গেছেন বলা যায় সম্পূর্ণই অজ্ঞ। এ সম্পর্কে দুটি বক্তব্য উদ্ধৃত করি:

বাঙালি বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব আহমদ শরীফ। তিনি লিখেছেন, 'ইসলাম অমুসলিমদের কখনো মুসলিম-রাজ্যের বা রাষ্ট্রের নাগরিক বলে স্বীকার করে না, তারা মনে করে অমুসলিম মাত্রই মুসলমানদের জিম্মি বা আমানত। তবে অধিকার না-দিলেও মুসলমানেরা অমুসলিমদের প্রতি অবিচার অত্যাচার করে না'।

আবার ভারতবর্ষ-উদ্ভূত নয় বলে মুসলমানেরা ভারতের হিন্দুদের নিকট স্বদেশী নাগরিক বলে স্বীকৃতি পায়নি,– এক কথায় হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা প্রায় সবসময়ই 'অশ্রদ্ধেয়'। তিনি বলেন, দুহাজারের বেশি দাঙ্গায় মুসলিম নিধনের উপর্যুপরি ঘটনায় প্রতি সপ্তাহে হিন্দু কর্তৃক মুসলিম হত্যার ঘটনা ঘটে। ভারতীয় অমুসলিম বা হিন্দু বাঙালিরাও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এখনও মুসলিম-বাঙালিদের হেয় বলেই মনে করে। সেজন্যে মুসলিম বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার খবর হিন্দুরা রাখে না।[১] তাতে হিন্দুরাই বাঙালিজীবনের সারাৎসার থেকে বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত এমনকি উন্মূল হয়ে যাচ্ছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন 'বড়বাবু' শীর্ষক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন: ষড়দর্শন নির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্র-পৌত্রেরা মুসলমান আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতিনিজম্ তথা কিন্দী, ফারাবা, বু আলী সিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল গজ্জালী (লাতিনে অল-গাজেল), আবু রুশদ্ (লতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলি করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। বস্তুত হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।[২]

দুই

বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি

পণ্ডিতেরা বলেছেন, বাঙালি জাতির অভ্যুদয় প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা নয়। হিন্দু-বাঙালিরা, বৌদ্ধ-বাঙালিরা, জৈন-বাঙালিরা, তথা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত-বাঙালিরা 'মুসলমান-বাঙালি' ও 'বাঙালি জাতি' গঠনে উপাদান সরবরাহ করে। তাই বাঙালির ইতিহাস বা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনায় প্রথমেই বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা দিয়েই শুরু করতে হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

'... যতদিন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙালী বলা চলে না। ... আনুমানিক দশম শতক হইতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদকে অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস আরম্ভ হইল'।[৩]

তুর্কী বিজয়ের পরে বাঙালি পণ্ডিতজন এবং বাঙালি জনগণ পরস্পরবিরোধী টানের মধ্যে পড়ে। ইসলাম ধর্ম এসে দেশে তখন নতুন ঝড়ের সৃষ্টি করল। ... বাঙালি জীবনে একটি নতুন 'ইসলামী ভাবধারা' এসে মিলিত হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তুর্কীদের বিজয় তথা ইসলামের প্রসার যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল। তুর্কি-বিজয় থেকেই বাঙলার মধ্যযুগের উন্মেষ, আর প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে। যেমন পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয়েই আধুনিক যুগের উন্মেষ ঘটে। এ যদি সত্য ও স্বীকৃত হয়, তাহলে বলতে হবে প্রাচীন যুগের অবসানের মূলে ছিল ইসলাম।[৪] অথচ এই ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব আধুনিক হিন্দু ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা শ্রেণী চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইতিহাসের সত্যকে অন্ধ চোখে অবলোকন করেছেন। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার মূলে এখনও দেখা যায় শ্রেণী-স্বার্থবোধ কার্যকর রয়েছে। কালে কালে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে, সোজা কথায়, প্রাক্তন সেই শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধি এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রাধান্য পেয়েছে। উচ্চ শ্রেণী থেকে উদ্ভূত লেখক-সাহিত্যিকদের রচনায় নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আপনশ্রেণী সম্পর্কে গর্ববোধ উনিশ-বিশ শতকেও বাঙালির চিন্তা-চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল। বাঙালি মুসলমান কারা? এতো এদেশীয় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের বাঙালিরাই। কিন্তু আভিজাত্য অভিলাষী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি উচ্চশ্রেণী উদ্ভূত, আর্য-হিন্দুর কাছ থেকেও এই বিষয়ে 'সত্য-তথ্য' পাওয়া যায়নি। বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই যেহেতু অনগ্রসর বাঙালি বৌদ্ধ ও হিন্দুর বংশধর, সেহেতু এদেশের মুসলমান সমাজ সাধারণভাবে শিক্ষায়, মেধায়, বিত্তে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু পেছনের থেকে যে সামনে আসা যায়–এ সত্য মেনে নেবার মধ্যে মুসলমানেরা অগ্রসর হবার প্রেরণা যেমন খোঁজেনি, তেমনি হিন্দুরাও মানবতাবাদীর নিরপেক্ষ বিবেচনায় পেছনের লোকেদের সম্মুখ-যাত্রাকে স্বীকৃতি দেয়নি কিংবা উৎসাহিত করতে চায়নি। অথচ অগ্রসর উচ্চশ্রেণী বাস্তববাদী ও মানবতাবাদী হলে এই সমস্যার অস্তিত্ব বিশ শতকেও বাঙলায় থাকত না। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার প্রসঙ্গেই উপরিউক্ত কথাটা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। যদিও বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার ধারণাটাই একটা অসত্য ভাষণ এবং অকারণ বিতর্ক। এতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলমানদেরকে হেয়-হীন ভাববার কৌশলাত্মক অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তিন

বাঙলার মুসলমান ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রায় সর্বত্রই উচ্চমূল্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু মহান ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর মতো অনেকেই সে-কথা মানতে যেন একেবারেই নারাজ। যেমন তিনি লিখেছেন–

"অনেকে মনে করেন মুসলমান সুলতান ওমরাহের উৎসাহেই বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। বাংলাদেশে প্রায় ছয়শত বৎসরব্যাপী মুসলমান রাজত্বে মুসলমান সুলতান ও তাঁদের অনুচরের মধ্যে, 'বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যাঁহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা ছয়জনের বেশি নহে। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগে কেবল বাঙলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই–এমনকি যেখানে মুসলমানদের অধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেই সব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিত্যের ভাষায় কথিত হইয়াছিল'। 'সুতরাং বাঙলার মুসলমান সুলতানদের অনুগ্রহ না-হইলেও যে বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত না এইরূপ মনে করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আর দেশের রাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎসাহ দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ইহা না করিলে, প্রত্যবায় করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোনো কারণ নাই।"[৫]

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪৮) এবং আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal, Vol; 11-এর একাংশের লেখক অধ্যাপক আবু মহামেদ হবীবুল্লার এতদসংক্রান্ত উক্তিরও তুচ্ছার্থক সমালোচনা করে বলেন, হবীবুল্লাহ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহের বংশের 'উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালির যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল।'– এই বক্তব্য 'অসার ও ভিত্তিহীন' বলে 'আলোচনারও অযোগ্য'। তবে তিনি মনে করেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসের কোনো উক্তিই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ সাধারণ লোক যে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে ইহা স্বাভাবিক বিষয় নহে।"

এই জন্য 'নিতান্ত অসার' হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহর উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। তিনি অধ্যাপক হবীবুল্লাহর অপরাপর ঐতিহাসিক বক্তব্যও তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে খণ্ডন করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মোটামুটিভাবে বঙ্গে মুসলিম প্রভাব বা আগমনকে সদর্থে সহজে স্বীকার করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষী থেকে শুরু করে (হিন্দু) লেখকদের কেউই মুসলমানদের সহ্য করেননি এবং মুসলমানদের ওপর নিস্পৃহভাবে মন্তব্য করেননি। এই সময়কালের শাসকদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের কিছুটা এলার্জি ছিল। এমনকি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে শ্রদ্ধাযোগ্য সত্য থাকলেও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক অসহিষ্ণুতা প্রত্যক্ষ

না করে পারা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমকালীন মুসলিম শাসকদের সদগুণগুলোকেও তাঁরা বিনা তর্কে ছেড়ে না-দিয়ে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের ধারণা– তাঁরা যে ব্যাখ্যা দেবেন, তা হিন্দু পাঠক বিশ্বাস করবেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্বিষ্ট সমালোচকদের আরো দু'একটি বক্তব্য উপস্থাপন করছি:

'মুসলিম-বিজয় না-হলে যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার সাহিত্যচর্চা আরও বিলম্বিত হত– সেই মুসলিম-বিজয়কেই হিন্দু-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে ধ্বংসের অপবাদ দিয়ে ইতিহাস লিখেছেন। যুগ যুগ ধরে এই বিকৃত ইতিহাস তৈরি করেছে 'তামস যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ'-তত্ত্ব। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সহযোগী লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায় তামসযুগতত্ত্বের কারণগুলোকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, ১২০১ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ বছর বাঙালির সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোনো নিদর্শন না-পাওয়ার জন্য শাসক মুসলমানদের অত্যাচার ও হিন্দুদের গ্রন্থাদি মুসলিম কর্তৃক বিনষ্ট করার অভিযোগকে স্বীকার করা যায় না।' কারণ 'হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোনো প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকে না, তাহার বহু প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্য সৃষ্টির অনার্বিভাবের কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ..."[৬] তিনি বলেন– নিশ্চিত কোনো প্রমাণ না-দিয়ে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। সম্ভবত 'ইহার কারণ এই যে, এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিভাধর সাহিত্যিক আবির্ভূত হন নাই।' কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হলেও তাঁদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতঃই লুপ্ত ও বিস্মৃত হয়ে গেছে। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট অভিমত যদি এই হয় যে, 'হিন্দুদের সাহিত্যের প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই' তাহলে মুসলমান নৃপতিগণ যে, দেশীয় সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন,– এ সত্য অনেকটা প্রমাণিতই হয়ে যায়। তাছাড়া আমরা এতদিন এ কথাও মনে করতে চাইনি যে, 'অন্ধকার যুগ' বলতে কোনও নির্দিষ্টকালে 'সংস্কৃতি চর্চার' অবরুদ্ধ অবস্থাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু কোনো আমলের প্রথম দিকেই সংস্কৃতিচর্চা যে বন্ধ ছিল না তাই সেসব যুগকে 'তমস যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ' মনে করবার বিষয়কে মনগড়া বলেছেন। ঐ কালে হিন্দু পণ্ডিতদের 'সংস্কৃতি' এবং মুসলিম শাসক তথা উচ্চ স্তরের লোকদের মধ্যে 'ফারসি' ও 'আরবি'র চর্চা অব্যাহত ছিল। ঐ কালে রচিত সংস্কৃতি ও আরবি-ফারসি গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়ে প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সাংস্কৃতিকভাবে ঐ কালটি বন্ধ্যা, অসৃষ্টিশীল কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। তাছাড়া বাংলা ভাষায় শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হননি বলে সুখময় মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তার প্রেক্ষিতে আহমদ শরীফ ভাষা-তাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষা তখন সৃজ্যমান পর্যায়ে ছিল বলে লিখিত সাহিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মুখে মুখে বাংলায় সাহিত্যচর্চা চলছিল। অতএব অন্ধকার যুগের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা যেমন ইতিহাসসিদ্ধ কাজ নয়, তেমনি মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আগ্রহী কলা-কুশলী হতে চাননি এটাও ঠিক নয়। আপেক্ষিকতাকে মনে রেখে পশ্চাৎপদতার অভিযোগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই প্রকৃত ইতিহাস অনুসারীর কাজ হয় বলে মনে হয়।[৭] তাই রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য অনুদার এবং একচক্ষু ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-তাড়িত বলা যায়। কারণ, দেখা যায়, রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানগণ দেশে জনগণের (বুদ্ধিজীবীদের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য) মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এবং মাতৃভাষার অবাধ উন্নতির পথে আধুনিককালেও প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছেন। সেন আমলে হিন্দু রাজারা হিন্দু বাঙালির মাতৃভাষার চর্চার পথে সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন।

মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চাকারীদের তর্ক-বিতর্কে এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে বাংলাসাহিত্যের বিকাশে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাকে মহিমান্বিত করে দেখা হয়, আর হিন্দু-প্রধান এলাকায় (কলকাতা তথা ভারতে) মুসলিম-অবদানকে খাটো করে দেখা হয়; আর তাই তাঁরা বলেন, মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, নগণ্য ও হীনবীর্য। তবে এ কথা ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত যে বাংলাসাহিত্যের উৎকর্ষের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানদের আগমন ঘটে প্রায় একই কালে। কিছুটা তথ্য আর কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ 'ইউসুফ-জোলেখা'-কে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আমলে (১৩৯০-১৪১০) রচিত বলে মন্তব্য করেছেন। এই স্বীকৃতির মধ্যেও মেধা ও উন্নত চিন্তার পরিচয় আছে। খাঁটি বাংলায় লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আর মুসলিম-রচিত প্রথম কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রায় সমকালীন রচনা বলে সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। যদিও দুটোর মধ্যে 'ইউসুফ-জোলেখা'র ভাষা তুলনামূলকভাবে বেশি আধুনিক আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষা কিছু প্রাচীন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ যুক্তিরও পাল্টা জবাব আছে, তা হল: এখনও দেখি, একই কালে বিদ্যা ও প্রজ্ঞার অভাবে একজন লেখেন পুরনো ধাঁচে, আরেকজন লেখেন শতবর্ষ এগিয়ে ভবিষ্যতের ধাঁচে। এটা হয় প্রতিভার পার্থক্যের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও পুরনো রীতিতে এখনও শিক্ষিত লোকেরা বলে-কয়ে থাকেন। কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় যে-ঢংয়ের আলোচনা করেছেন, তাতে কারো কারো মনে হতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দানকে খাটো করে দেখানোর পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়েই ইউসুফ-জোলেখাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পরের বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার..)।

বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা আরবি, ফার্সি না উর্দু– এসব উনিশ-বিশ শতকের প্রান্তছোঁয়া মাত্র ষাট-সত্তর বছরের পুরনো বিতর্ক হয়ে গেছে। সুখময় মুখোপাধ্যায় এটাকে মধ্যযুগের আলোচনায় এনে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি লিখেছেন: 'বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকেরা হিন্দু-লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কারণ, বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবি বা ফার্সি নহে– বাংলা, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাঙালি মুসলমানদের বাংলা ভাষাকে 'হিন্দুয়ানী-ভাষা' বলিতেন, কবি সৈয়দ সুলতানের লেখা হইতে তাহার প্রমাণ মেলে।'[৮]

এ কথার পরেই তিনি লিখেছেন: "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা এমন একটি নতুন বস্তু দিয়াছেন- যাহা হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই। ধর্ম নিরপেক্ষ বা লৌকিককাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন।" বস্তুতপক্ষে এই রকম পরস্পর সঙ্গতিবিহীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা হিন্দু-গবেষকগণ যত্রতত্র আরও অজস্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সুকুমার সেন; তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, নাজিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সুফিয়ানের পার্থক্যই জানতেন না। তাঁরা মুসলমানদের বই-পুস্তক না-পড়েই সমালোচনা লিখেছেন এবং এখনও সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বই না-পড়েই কলকাতার লোকেরা এক ধরনের দাদাগিরি করেন। এ থেকে মনে হয়, এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মুসলমান গবেষকদের দ্বারা প্রণয়নের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে; এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। আশ্চর্যের বিষয় আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' লিখেছেন অনেক আগে। অথচ এর আলোকে তাদের লেখা ইতিহাসের সংশোধিত ইতিহাস হিন্দুরা লেখেননি; বস্তুত এগুলো তাঁরা পড়েনও না। আহমদ শরীফের গবেষণার আলোকে এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে, হিন্দুর ন্যায় মুসলমান সমাজেও মধ্যযুগেই মৌলিক সাহিত্যপ্রতিভা জন্মগ্রহণ করেন, হিন্দু লেখকদের প্রায় সমানসংখ্যক লেখকই তখন সাহিত্যচর্চা করেছেন । আধুনিক কালেও মুসলমানদের ঔজ্জ্বল্য স্বীকার করা না হলেও নিরপেক্ষ বিচারে তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। পূর্বপুরুষের সম্মিলিত সাধারণ ধনে গড়ে ওঠা ভিত্তির ওপর আধুনিক কিংবা উত্তরাধুনিক কবি-সাহিত্যিকেরা সুরম্য অট্টালিকা গড়ার কাজে রত রয়েছেন। কিন্তু সুকুমার সেন, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, ক্ষেত্রগুপ্ত প্রমুখের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে আজকের রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের একটি মাত্র অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আলোচনা করেছেন– যার অধিকাংশই মূল বই না-পড়ে, বরং হালকাভাবে শুনে শুনে এসব অপকর্ম তাঁরা করেছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন তোলা হয়নি যে– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের মুসলিম লেখকগণও কী করে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন? ফলে সে সব খণ্ডিত ইতিহাস পড়ে ওদেশের মুসলমানেরাও মুসলিম সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রধান লেখক ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের নাম পর্যন্ত জানেন না বলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি। প্রায় দুশ বইয়ের লেখক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ ডা. লুৎফর রহমানকে চেনেননি! বিখ্যাত একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকার মুসলিম সম্পাদকও চিনতেন না বলে অবাক হয়েছিলাম! ডা. লুৎফর রহমানকে দিয়েই উদাহরণ দিলাম এই কারণে যে, তাকেই যাঁরা চেনেন না, তাহলে লুৎফর রহমানের সমকালীন, পূর্বসূরি, উত্তরসূরি কজন সাহিত্যিকের খবর তাঁরা রাখেন? অথচ কৃত্তিবাস-কালি রাম দাস থেকে আজকের হিন্দু তরুণ কবিদের খবরও রাখার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান পাঠকদের উদার মানসিকতা ও মহানুভবতার পরিচয় মিলছে– এ কারণে এঁদের ভবিষ্যতও অনেক সমৃদ্ধশালী হবে তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্য রচনার খতিয়ান যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের মতোই বদ্ধ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে। বাংলা সাময়িকপত্র মুসলমানরাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত কোনো হিন্দু লেখক-গবেষক মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রের কথা পত্র-পত্রিকার ইতিহাসের অন্তর্গত করেননি। বিক্ষিপ্তভাবে কলকাতা ও ঢাকা থেকে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের ওপর কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে বরং এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। কোন ধারার পত্রিকা কীভাবে বিকশিত হল,– সে ধারণা পেতে খুবই বেগ পেতে হত। বিশেষত মুসলমানদের পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা শিক্ষিত সমাজে ছিলই না। অথচ বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারত বিভক্তির মতো ঘটনা ঘটিয়ে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই কালের মুসলিম সাময়িকপত্রগুলো কারো দ্বারাই আদৃত হয়নি। পূর্ব বাঙলার মুসলমানেরা পাকিস্তান সম্পর্কে (১৯৫২ নাগাদ) অল্পকালের মধ্যেই মোহমুক্ত হবার ফলে পাকিস্তান-আন্দোলনকালীন পত্র-পত্রিকার প্রতি তাঁরা যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। পশ্চিম বাঙলার মুসলমানেরাও মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন না বলে, ঐ সকল মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যবাদী পত্রিকা ও সাহিত্যের প্রতি বিষনজরেই তাকাতেন; যেভাবেই হোক, ঐ কালের সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখনের কাজ পাকিস্তানকালের মুসলিম ঐতিহ্য রক্ষক মহল থেকেই গৃহীত হয়, কিন্তু তা শেষ করার তাগিদ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' আমলে এসে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। ইতিহাসের উপকরণ-উপাদান এভাবেই কালে কালে অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়– এ থেকে এ বিষয়ে একটি বাস্তব চিত্রও লাভ করা যায়।

ইতিহাসের দর্শনে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক, বিরোধ, সম্প্রীতির প্রচেষ্টা কালে কালে বিভিন্ন রূপে, আন্দোলন আকারে গড়ে উঠতে দেখা যায়। হিন্দু-লেখক কর্তৃক মুসলমানদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করার প্রয়াস-প্রচেষ্টা বিগত দেড়শ-দুইশ বছরের মধ্যেও কম দেখা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু রাজপুত নায়কের সঙ্গে মুসলিম-কন্যার

প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে যে তরঙ্গ তোলেন, তার ধারাবাহিকতায় অনেকেই পালটা জবাব দেবার জন্য কলম ধরেছেন। লিখেছেন রায়নন্দিনী, সেক আন্দু। ডাক্তার আবুল হোসেন লিখেছেন ছয়টি গ্রন্থ; 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত নিয়েও হয়েছে, হয়েছে নবাব সিরাজদৌলাকে নিয়ে; কেউ চরিত্র হনন করেছেন–কেউ আবার তা খণ্ডন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি প্রবেশের বিরোধিতা করেছেন প্রায় সকল হিন্দু– ব্যতিক্রম প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ গুটিকতক মহাজন। পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানদেরকে হেয় অবজ্ঞেয় করে চিত্রিত করায় মুসলমানেরা অপমানিত বোধ করে– যার ফলে তারা বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকের পত্র-পত্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে আছে এই বিষয়ে বিতর্ক। এই সব আন্দোলনের মূলে একটাই কারণ– বাঙালির সার্বিক বিকাশের ধারাকে নিরপেক্ষ সত্যভাবে দেখতে-দেখতে চিত্রিত করতে সক্ষম না-হওয়া। বাঙলা ও বাঙালির জীবনের ট্রাজেডি হচ্ছে– আচার্য আহমদ শরীফের মতো মানবতাবাদী-সাম্যবাদী-নাস্তিক-গবেষক লেখক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছেন কম। আস্তিক্যবাদী-দার্শনিক-লেখকদের চারিত্রবৈশিষ্ট্য আহমদ শরীফের কাছ থেকেই আমরা শিখেছি: তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন, আস্তিক্যবাদী দার্শনিকগণ শেষতক কোনো-না-কোনো দর্শনের প্রতি, সমাজের প্রতি, ধর্মের প্রতি আস্থা অনুরাগ ও সমর্থন ব্যক্ত করতে বা প্রদর্শন করতে বাধ্য হন। অথচ ইতিহাসের তত্ত্ব ও সত্যকে নিরপেক্ষ নাস্তিক্যবাদী দর্শনের আলোকে দর্শন না করলে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। সত্যের খাতিরে বিপক্ষ-বিরোধভাবাপন্ন সমাজ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে অধ্যয়ন-অনুশীলন করে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য কোনো দার্শনিক ঐতিহাসিক সম্পৃক্ত হননি। তবুও আস্তিক্যবাদী দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ বিবেকের তাড়নায় কখনও কখনও যে সত্য সফল করে গেছেন বা যান-তাই-ই হয়েছে পরবর্তী গবেষণার দিক-দর্শন। যেমন আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আচার্য যদুনাথ সরকার, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ যে সমস্ত তথ্য ও সত্য উক্তি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাই-ই মুসলিম গবেষকদেরকে নতুনের আলোক-বর্তিকারূপে পথ দেখিছে; অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেছে । কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বমাত্রিক বিকাশের পর্বে-পর্বে দর্শনগত পার্থক্য, বিরোধিতা ও সমন্বয়-সম্প্রীতির যেসব প্রয়াস-প্রচেষ্টা হয়েছে, তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে যে আলোচনা প্রয়োজন, সেই আলোচনার সূত্রপাত অন্তত 'হালখাতা' করেছে– এটা আমাদের জন্য আশার কথা।

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, ভারতে বাংলাদেশে মৌলবাদ-এর রূপ-স্বরূপ। প্রগতির ধারা ও পন্থা, স্বর্নিবাচিত প্রবন্ধ, সূচীপত্র ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৫২২।

২. সৈয়দ মুজতবা আলী, আহমদ শরীফ উদ্ধৃত করেছেন, দ্রঃ বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৪৭।

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ. ২০-৩০।

৪. আহমদ শরীফ, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃ. ৩।

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ), দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮৭, ৪র্থ সং, পৃ. ৩৩৩-৩৫।

৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর নামে চালু বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্য যুগ) পৃ. ৩৫৭।

৭. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ সম্পর্কে ধারণার জন্য আহমদ শরীফের 'বিচিত্র চিন্তা' ও 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ড, ওয়াকিল আহমদের 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' দেখা যেতে পারে।

৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ঐ পৃ. ৩৯২-৯৬।

ইতিহাসের দর্শন

জা কি র তা লু ক দা র

এখনকার সরকারি দলিল-দস্তাবেজ দেখলে, আজ থেকে একশো বছর পরে, যে-কেউ বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে কাশ্মিরি জাতিটাই বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি উগ্র গোষ্ঠীমাত্র, ফিলিস্তিনিরা জন্মসূত্রে সন্ত্রাসী হয়েই জন্ম নেয় এবং তারা মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইসরায়েলের অস্তিত্ব পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য হেন অপকর্ম নাই যা

করতে পিছপা হয়, তামিলরা সন্ত্রাসী জাতি, তারা শ্রীলঙ্কাকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হয়ে উঠতে দেয়নি, মুসলিমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সহিংস ধর্মীয় জাতি যারা শুধুমাত্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আমেরিকার টুইন টাওয়ার গুঁড়িয়ে দেয়। আর পৃথিবীতে একমাত্র সভ্য ও মানবীয় জাতি হচ্ছে মার্কিনীরা, ফলে তাদের হাতেই ন্যস্ত পৃথিবীর অভিভাবকত্ব, এবং এটি ইতিহাসসম্মত।

ইতিহাসের দর্শন কাকে বলে? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী কী? ইতিহাসের দর্শনকে কত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? ইতিহাসের দর্শন চর্চার উপকারিতা কী? 'ইতিহাসের দর্শন' ধারণাটির উৎপত্তির ইতিহাস ও কারণ কী?– ইত্যাকার প্রশ্ন অ্যাকাডেমিশিয়ানদের জন্য তোলা থাকুক। আমাদের মতো ঘা-খাওয়া মানুষরা শুধু দেখে যে ইতিহাস কীভাবে ক্ষমতাশালীদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও একপেশে হতে থাকে। ঘা-খাওয়া মানুষ বলতে সবসময়ই ঘা খাওয়া মানুষ। বর্তমানেরও। ইতিহাসেরও। আরো অনেকদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতেও যে ঘা খেয়ে যেতে হবে, তা এখন ভবিষ্যদ্বক্তা না হয়েও বলা যায়। বর্তমানের ঘা নাহয় সহ্য করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের ঘা যখন জন্মান্তরের পাপের ফল হিসাবে নিরন্তর খেয়ে যেতে হয়, তখন তা জীবনকে শুধু অসহ্যই করে তোলে না, বরং হীনম্মন্যতার অতলেও ডুবিয়ে রাখে। এই ইতিহাসের ঘা আসে ইতিহাসের হাত ধরেই, ইতিহাস-রচয়িতার হাত ধরেই, ইতিহাসের দর্শনের হাত ধরেই।

তাই ঘা-খাওয়া মানুষদের শুধু ইতিহাসকে প্রশ্ন করলেই চলে না, ইতিহাসের দর্শনকেও তার প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। যে দর্শন ইতিহাসের অলক্ষ্য নির্মাতা, সেই দর্শনকে প্রতি-আক্রমণ না করলে ইতিহাসের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তাই আমরা শুধু কী বলা হয়েছে সেটাকেই প্রশ্ন করি না, কে বলেছে, কোন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছে, কার পক্ষে ও কার বিপক্ষে বলেছে, কোন দর্শনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে বলেছে– সেই প্রশ্নগুলোও সামনে তুলে আনি।

এইখানেই মার্কসবাদীদের সততা। কারণ মার্কসবাদী নিজেই মার্কসবাদী নামে পরিচিত ইতিহাস-বীক্ষাকেও প্রশ্ন করতে পারে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলে তাকে ভেঙে আবার নতুন বীক্ষার সন্ধানও করতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে বার বার প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে নিজের দর্শন, এমনকি বিলুপ্তির মুখোমুখি হতে পারে দর্শন, কিন্তু তাতে ভীত হয় না মার্কসবাদী। কারণ তার প্রয়োজন, মার্কসবাদ নয়– সত্য।

একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে আমাদের দেশে মার্কস-এর চিন্তাধারা বলতে এমন একগুচ্ছ ভাবনাপুঞ্জকে বোঝানো হয়ে থাকে যাকে স্ট্যালিনের আমলে 'মার্কসবাদ' আখ্যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী। সেই অর্থে এটিকে কেউ কেউ 'অফিসিয়াল মার্কসবাদ' বলে অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশে যারা মার্কসবাদের পক্ষে কথা বলেছেন, তাঁরা মূলত এই অফিসিয়াল মার্কসবাদের পক্ষেই বলেছেন। যারা বিরোধিতা করেছেন এবং করছেন, তারাও এই অফিসিয়াল মার্কসবাদেরই বিরোধিতা করছেন। অফিসিয়াল মার্কসবাদে কার্ল মার্কসকে প্রায় ধর্মপ্রণেতার জায়গাতে বসানো হয়েছিল। কিন্তু মার্কস নিজে যেমনটি চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁকে যারা বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা মনে করে যে– সমাজের বিবর্তন বিষয়ে মার্কস যে কাজ করে গেছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় চিন্তা তাঁর জীবদ্দশাতে তো বটেই, তাঁর পরবর্তীকালেও আর কেউ করতে পারেন নি। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রতিটি কথাকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে হবে। এবং মার্কস-এর অনুগামী বলে যারা নিজেদের ঘোষণা করেননি, এমন অনেক চিন্তকের কাজ থেকেও গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। 'অফিসিয়াল মার্কসবাদে' মার্কসবাদের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'কে। সেখানে বলা হয়েছে, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা তার পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র অনুসরণই করে না; বরং পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপই পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। অর্থাৎ 'উৎপাদন ব্যবস্থা' ধারণাটির মধ্যেই কিছু নিয়মের ধারণা নিহিত রয়েছে। যে নিয়ম অনুসারে কোনো একটি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে, তা বিকশিত হয়, তারপরে তা অবনমনের পথে নামে, সবশেষে অবলুপ্ত হয়ে পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। উৎপাদন ব্যবস্থার যে ধাপগুলোর কথা অফিসিয়াল মার্কসবাদের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' জোরেশোরে বলেছে সেগুলো হচ্ছে– ১. আদিম সাম্যবাদী কৌমসমাজ ২. দাসসমাজ ৩. সামন্ততন্ত্র ৪. পুঁজিবাদ ও ৫. সমাজতন্ত্র। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'ডায়ালেকটিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' গ্রন্থে স্ট্যালিন এই তত্ত্বকে গ্রন্থিত করেন। একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বুখারিনের 'হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর পক্ষ থেকে, এমনকি চীনের পার্টির পক্ষ থেকেও, যত প্রচারমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলোতেই এই ধারণাটিকে এমন বিতর্কহীনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, যার ফলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই স্ট্যালিনীয় প্রকল্পটিকে মার্কসীয় ইতিহাসচিন্তার অন্যতম মূলস্তম্ভ হিসাবে সারা পৃথিবীতেই গ্রহণ করা হয়।

গত শতকের ষাটের দশকে কয়েকজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এই তত্ত্বের দিকে প্রশ্নের আঙুল উঁচিয়েছিলেন বটে, তবে তাঁদের চিন্তা সক্রিয় মার্কসবাদীদের তখন তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এখন, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে মার্কস-এর মূল ও অসম্পাদিত রচনাবলি হাতে পাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে, যে অপরিবর্তনীয় পরম্পরার কথা স্ট্যালিনের বইতে পাওয়া যায়, ঐ প্রকার অমোঘতা-সমন্বিত কোনো দাবি মার্কস-এর লেখায় আদৌ পাওয়া যায় না।

পাওয়া যাবেই-বা কেমন করে? আদতে পৃথিবীর কোথাও তো এমন থাকবন্দি হয়ে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ঘটেনি। বাস্তব বিশ্লেষণ করার আগে মার্কস-এর লেখা থেকে কিছুটা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে নেওয়া যাক। মার্কস তাঁর সবিশেষ প্রসিদ্ধ 'প্রিফেস টু দি কন্ট্রিবিউশানস টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনে ধাপের ধারণার কথাটি লিখেছেন। সেই সঙ্গে এই বইতে পাওয়া যাচ্ছে দাসসমাজ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ– এই তিনটি ধাপের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই গ্রন্থে তিনি এক 'এশিয়াটিক' সমাজের উল্লেখ করেছেন, যা স্ট্যালিন ও 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'পন্থীরা বেমালুম চেপে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্কস যে পরম্পরার কথা বলেছেন, তা তিনি ভারতবর্ষ, চীনসহ পশ্চিম ইউরোপের বাইরের কোনো দেশ সম্পর্কে প্রয়োগ করেননি। এইসব দেশ সম্পর্কে মার্কস সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে 'এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন'। আবার মার্কস যখন কেল্ট, স্লাভ প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তাদেরও যে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তা উল্লেখ করতে ভোলেন না। অনেক বিশ্লেষক তো মনে করছেন যে মার্কসকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজের জন্য পৃথক পৃথক উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভাবা খুবই সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপেই সামন্ততন্ত্রের অবনমন এবং পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্যে ছিল কয়েক শো বছরের ব্যবধান। সেই কারণে কোনো কোনো মার্কসবাদী গবেষক এখন পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যেই সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য একটি উৎপাদন ব্যবস্থার নাম প্রস্তাব করেছেন, যা উদ্ভূত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের সাথে বাণিজ্যের সংমিশ্রণে।

মার্কস তাঁর ইতিহাসের পরম্পরার গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন পশ্চিম ইউরোপকে। তাঁর বই 'গ্রুন্ডরিখ' এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা ধারণ করে রেখেছে। ভালো করে 'গ্রুন্ডরিখ' বিশ্লেষণ করলে অন্তত ৪টি পরম্পরার সন্ধান পাওয়া যায়। ১. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ– দাস সমাজ। ২. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ– এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা। ৩. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ– সামন্ততন্ত্র ও এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার মিশ্রণ। ৪. আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজ– সামন্ততন্ত্র– পুঁজিবাদ।

প্রথম পরম্পরাটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই পথ পরবর্তীকালের সামন্ততন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়নি। দ্বিতীয় পরম্পরাটি ভারতবর্ষ ও চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৃতীয় পরম্পরাটি রাশিয়াসহ বিভিন্ন স্লাভ ভূখণ্ডে । অর্থাৎ মার্কস-এর গবেষণা অনুযায়ী দাস ব্যবস্থা থেকে ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেনি। ঘটেছিল জার্মান কৌম সমাজ থেকে। শেষে শরণ নিতে হয় রবীন্দ্রনাথেরই– 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলেই নয়।'

দুই

মানুষের জীবন, ফলত মানুষের সমাজ কোনোদিনই একমাত্রিক নয়। তার অর্থ হচ্ছে ইতিহাসও কখনো একমাত্রিক হতে পারে না। অথচ যে কোনো ইতিহাসের দর্শনই একমাত্রিক। সেই একমাত্রিক দর্শন নিয়ে ইতিহাসের দিকে তাকানো মানে অন্ধের হস্তিদর্শন। ধর্মতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে মানুষ যা কিছু করে, তা তার আনুষ্ঠানিক ধর্মমতকে কেন্দ্রে স্থাপন করেই করে। সেই অনুসারে ধর্মে ধর্মে বিভেদটাই সত্য। আবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইতিহাস বলে যে বিভেদ নয় সমন্বয়টাই সত্য। দুই পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে ইতিহাস থেকে কিছু উদাহরণ তো টেনে আনতেই পারে। ধরা যাক এই উপমহাদেশে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কথা। ইংরেজরা যাকে বলে 'সিপাহি বিদ্রোহ'। ইসলামপন্থী ইতিহাসে তাকে দাবি করা হয় 'মুসলমানদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ' বলে। আর কার্ল মার্কস তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ'। সেই যুদ্ধ বা বিদ্রোহকালেরই একটি ঘটনা। ১৮৫৭ সালের ৭ জুন। এলাহাবাদের চেল এলাকার ছোট একটি গ্রাম বারওয়ারি। সেখানে ইংরেজ রেলকর্মীদের একটি ছাউনি ছিল। রেলপথ বসানোর কাজে তারা সেখানে অবস্থান করছিল। স্থানীয় জমিদার নায়েব বখ্‌শ-এর নেতৃত্বে স্থানীয় অধিবাসীরা আক্রমণ চালাল ইংরেজদের ওপর। জীবন বাঁচাতে ইংরেজরা আশ্রয় নিল উঁচু পানির ট্যাংকের ওপর। নিচে তাদের ঘেরাও করে রইল বিদ্রোহী গ্রামবাসী। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় ভারতবর্ষীয় দরদি প্রাণ শেষ পর্যন্ত গলে গেল। তখন রফা হল যে ইংরেজদের হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিনিময়ে তারা বিদ্রোহীদের কিছু টাকা-পয়সা দেবে। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু যেই টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল বেঁধে গেল। তখন ন্যায়সম্মত বণ্টনের দায়িত্ব বর্তাল সেই ইংরেজদের হাতেই। ইংরেজরা বলল যে হিন্দু এবং মুসলমানরা দুই আলাদা সারিতে বসুক। আলাদা সারি তৈরি হলে দেখা গেল হিন্দু আর মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান। তখন ইংরেজরা হিন্দু আর মুসলমান দুই দলকেই আলাদা আলাদা ভাবে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে দিল। তারপরে সেই ইংরেজদের নামে ধন্য ধন্য। এতবড় জটিলতার কত সুন্দর আর সুষ্ঠু সমাধান করে দিলে ইংরেজরা। তখন হিন্দুও বলে মুসলমানও বলে– সত্যিকারের রাজার জাত থাকলে তা হচ্ছে ইংরেজরা!

এই ঘটনা কার পক্ষে যায়। বিদ্রোহে যোগ দেওয়া, ইংরেজদের ঘেরাও করা, তাদের তাড়িয়ে পানির ট্যাংকের ওপরে তোলা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান একসাথে। এখানে ধর্মসমন্বয়ের অসামান্য কাণ্ডটি ঘটে গেছে। এই পর্যন্তের ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইতিহাসের দর্শনের সাথে একেবারে টাঁয়ে টাঁয়ে মিলে যায়। কিন্তু যেই বখরার প্রসঙ্গ সামনে এল,

সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ফিরে পেল তার হিন্দুসত্তা, আর মুসলমান ফিরে পেল তার মুসলমানসত্তা। পুরো ঘটনাটিকে নিজের পক্ষে কাজে লাগানোর কোনো ফর্মুলা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং ধর্মাশ্রয়ী– দুই ইতিহাসেরই আকরগ্রন্থ থেকেই উধাও করে রাখা হয়েছিল ঘটনাটির বিবরণ।

নাড়কেলবেড়ের জঙ্গনায়ক তীতুমীর তাঁর বাঁশের কেল্লার জন্য ইতিহাসে খ্যাত। ইসলামি ধর্মতন্ত্রপন্থীদের ইতিহাস তীতুমীরকে ওহাবী, ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা তথা ধর্মসংস্কারক এবং ইসলাম পুনরুদ্ধারের যোদ্ধা বলেই প্রচার করতে চায়। এই ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের গৌরব পুনরুদ্ধার তীতুমীরের কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিজে ও তাঁর সহযোদ্ধারা হিন্দুদের থেকে আলাদা পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা দাঁড়ি রাখতেন, মাথা কামাতেন, আর হিন্দুরা যেভাবে ধুতি পরে সেভাবে না পরে, অর্থাৎ ধুতির কাছা না দিয়ে তহবন্দের (আজকের ভাষায় লুঙ্গির) মতো করে পরতেন। হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দু জমিদার এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা তীতুমীর এবং তাঁর সঙ্গীদের বলত 'নেড়ে আর দেঁড়ে'। মুসলমানদের কাছা খুলে ধুতি পরার কারণ হিসাবে তারা প্রচার করেছিল যে তীতুমীর বাহিনীর সবার অণ্ডকোষ বড় হয়ে ঝুলে গেছে ষণ্ডের মতো, তাই তারা ধুতিতে কাছা দেয় না। তীতুমীরও যে এসব হিন্দু সাম্প্রদায়িক জমিদারদের নানাভাবে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন সে তথ্যও আমাদের জানা আছে। কিন্তু যে তথ্যটি এই দুই ধর্মতন্ত্রী ইতিহাস এবং ইংরেজ সরকারি ইতিহাস চাপা দিয়ে রাখতে চায়, সেটি হচ্ছে ইংরেজ আমলে এদেশে সত্যিকার অর্থে একমাত্র সফল আন্দোলন 'নীল বিদ্রোহে' তীতুমীর বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ঘটনা। কোনো ইতিহাসেই স্পষ্টভাবে তুলে আনা হয় না এই তথ্যটি যে তীতুমীর নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামে জঙ্গি-নেতৃত্ব দেবার জন্য বিশেষ এক বাহিনীই গড়ে তুলেছিলেন, যার নাম ছিল 'হামকল বাহিনী'। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকের সকল জঙ্গি আক্রমণে হামকল বাহিনীর সদস্যরা থাকতেন সম্মুখ সারিতে। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই নীলকরদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো জঙ্গি হামলা সংঘটিত হয়। ছোটলাটের কাছে তার একটা তালিকা পাঠায় ইংরেজ অফিসাররা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– ১. মোল্লাহাটি কুঠি আক্রমণ করে সহকারী ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেবকে প্রচণ্ড প্রহারের পর মৃত মনে করে মাঠের মধ্যে ফেলে যাওয়া, ২. খাজুরার কুঠি লুট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ৩. লোকনাথপুরের কুঠি আক্রমণ, লুট ও অগ্নিসংযোগ, ৪. চাঁদপুরের গোলদার কুঠির নীলের গোলা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, ৫. খাড়াগোদা কুঠির পরিশোধিত নীল চিত্রা নদীতে ফেলে দেওয়া, ৬. ঘোলদারি কুঠির সমস্ত গোলা ভেঙে ফেলা ও কর্মচারিদের বেদম প্রহার করে কুঠি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ৭. শানঘর, মধুয়া এবং সিন্দুরিয়া নীলকুঠির কনসার্নের সকল নীলের আবাদ নষ্ট করে ফেলা, ৮. নাটুদহ ও রানাঘাটে সকল ইউরোপীয় কুঠিমালিক ও তাদের পরিবারের লোকদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

নীল বিদ্রোহের সময় গ্রামে গ্রামে কৃষক বাহিনী যে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করে, তার পেছনে ছিল হামকল বাহিনীর সুদক্ষ রণকৌশল। ১৮৬০ সালের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক মাসিক পত্রিকায় পাদ্রি ফ্রিদরিক ফন লেখেন– 'কুষক যোদ্ধাগণ ছয়টি বিভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের সজ্জিত করেছিল। ১ম কোম্পানি তীরন্দাজদের নিয়ে গঠিত হয়। ২য় কোম্পানি গঠিত হয় প্রাচীনকালের ডেভিডের মতো ফিঙা দ্বারা গোলক নিক্ষেপকারীদের নিয়ে। ৩য় কোম্পানি ইটওয়ালাদের নিয়ে, যারা আমার বাড়ি থেকে ইট কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। ৪র্থ কোম্পানি বেলওয়ালাদের নিয়ে গঠিত। এদের কাজ হল নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর মস্তক লক্ষ্য করে শক্ত কাঁচা বেল ছুঁড়ে মারা। ৫ম কোম্পানি গঠিত হয় থালা-ওয়ালাদের নিয়ে। তারা ভাত খাওয়ার কাঁসা ও পিতলের থালাগুলো আনুভূমিকভাবে চালাতে পারে। এতে যে শত্রুনিধনের কাজটি উত্তম রূপেই করা সম্ভব হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৬ষ্ঠ কোম্পানি গঠিত ছিল রোলা-ওয়ালাদের নিয়ে। খুব উত্তমরূপে পোড়ানো খণ্ড অথবা অখণ্ড মাটির বাসন ও পাত্র ছিল এদের অস্ত্র। এই কোম্পানির সৈনিক ছিল প্রধানত স্ত্রীলোকগণ। বাঙালি রমণীরা এই অস্ত্র উত্তমরূপেই ব্যবহার করতে জানে। নীলকরদের একদল লাঠিয়াল যখন একটি গ্রাম আক্রমণ করেছিল তখন সেই গ্রামের রমণীবৃন্দ এই অস্ত্রদ্বারা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। ফলে লাঠিয়ালরা রক্তাক্ত দেহে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া আরো একটি কোম্পানি তৈরি হয় যারা লাঠি চালাতে জানে তাদের নিয়ে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানি বল্লমধারী বাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। একজন বল্লমধারী ১০০ জন লাঠিধারীকে পরাজিত করতে পারে।' (দেখুন: নীলবিদ্রোহের নানাকথা। মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। নভেম্বর ১৯৯০। পৃষ্ঠা নম্বর– ৫৩)।

এই লাঠিধারী এবং বল্লমধারী বিদ্রোহীরা ছিলেন মূলত তীতুমীরের হামকল বাহিনীর সদস্য। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে হামকল বাহিনীর দুইটি প্রধান ঘাঁটি ছিল হুলিয়ামারী ও চাঁন্দুরে গ্রামে। হুলিয়ামারীর যে অঞ্চলে হামকল বাহিনীর ব্যারাক ছিল সেই অংশ পরবর্তীকালে তীতুদহ নামে অভিহিত হয়। হামকল বাহিনীর অনেক সদস্যই ছদ্মবেশে নীলকুঠিতে ছোট ছোট পদে চাকরি করতেন। তারাই গোপনে কুঠির যাবতীয় সংবাদ নিজেদের ব্যারাকে পাঠাতেন। সিন্দুরিয়া কুঠির কুঠিয়াল উইলিয়াম শেরিফের প্রধান সহিস রইস খাঁ ছিলেন এমনই একজন ছদ্মবেশী হামকল যোদ্ধা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সদরুদ্দিন। চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সবচেয়ে বড় যে নীলজঙ্গ সংঘটিত হয়, যেখানে তিরিশ হাজার কৃষক যোদ্ধা ঐ জেলার সকল নীলকরের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে সকল নীলকুঠি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিল, সেই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে পালন ছিলেন এই হামকল যোদ্ধা সৈয়দ সদরউদ্দিন ওরফে রইস খাঁ। (দেখুন: প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা নম্বর ৭১)। এক নীল বিদ্রোহের ইতিহাসই না কত ভাবে লেখা হয়েছে! হিন্দু ধর্মতন্ত্রী ইতিহাসবিদের লেখায় সৈয়দ

সদরউদ্দিনের কোনো চিহ্নই নেই। সেখানে চুয়াডাঙ্গা নীলজঙ্গের তিন প্রধান কুশীলব হচ্ছেন তিন হিন্দু জমিদার– সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, পথহাটির দিকপতি মজুমদার, এবং চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। সত্যি বটে, এই তিন জমিদার একপর্যায়ে কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তা তারা নীলচাষ উচ্ছেদের জন্য দাঁড়াননি। তারা জড়িত হয়েছিলেন ইংরেজদের তাড়িয়ে নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য। কেননা তারা নিজেরাও ছিলেন নীলকুঠির মালিক এবং নীলের ব্যবসায়ী।

নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কিছু কিছু তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাওয়ার প্রবণতা। এটি বিশেষভাবে করা হয়েছে আমাদের বাংলার কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির বিতর্কিত কার্যকলাপ আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে রয়েছেন মহান রাজা রামমোহন রায়(!), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ তদানীন্তন বাংলার গৌরব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, এবং প্রসন্ননাথ ঠাকুর। উল্লিখিত তিনজনই ছিলেন নীলকুঠির মালিক এবং নীলের ব্যবসায়ী। এই তিন মহান বাঙালি ছাড়াও নীলকর হিসাবে ইংরেজদের মতোই কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ঘোড়াখালির জমিদার অবনীমোহন বসু, নলডাঙ্হার রাজা প্রমথভূষণ, পোতাহাটির আশুতোষ গাঙ্গুলী, ইংরেজদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীকোল বোয়ালিয়ার হরিচরণ সাহা এবং আরো অনেক বাঙালি এবং দেশীয় নীল কুঠিয়াল। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম আরো বিশেষভাবে নীলচাষের সাথে যুক্ত এই কারণে যে তাঁদের ওকালতি ছাড়া বাংলায় নীলচাষের কোনো আইনগত ভিত্তিই তৈরি হত না। এই আইনগত ভিত্তির কারণেই লক্ষ লক্ষ কৃষক অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয়েছিলেন, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, হাজার হাজার রমণী সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন। তিন বাঙালি মহাপুরুষের ওকালতি সফল না হলে ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। ব্যাপারটি খোলাসা করে বলা যাক।

এই দেশে নীল ব্যবসার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদার যে শুধু জমির ওপরেই কর্তৃত্ব করত তা-ই নয়, প্রজার জানমাল, ইজ্জত-সম্ভ্রমেরও মালিক ছিল তারাই। নীলকররা টাকার বিনিময়ে জমি কিনে নীল চাষ করতে পারলেও রায়তকে তো জোর করে কাজে লাগাতে পারত না। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অনুসারে রায়তের ওপর এক জমিদার ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না। তাছাড়া জমিদার টাকার বিনিময়ে জমি বা তালুক পত্তনি দিতে পারত না। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর নীলকরদের কাছে জমিদারদের তালুক পত্তনি দেওয়ার অধিকার চাইলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। তিনি প্রচার করলেন– 'আলস্য, অনভিজ্ঞতা ও ঋণের জন্য দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্তনি দিতে উদগ্রীব। কারণ ইহাতে তাঁহারা জমিদারি চালাইবার দায় হইতে নিস্কৃতি লাভ করেন এবং জমি পত্তনিদারের মতো একটি নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোনো একটি বড় শহরে বসবাস করিতে পারেন।'

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে নীলকররা যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাতে রামমোহন রায় লিখেছিলেন– 'নীলকর সাহেবদের সম্পর্কে আমি আমার মত সবিনয়ে উল্লেখ করছি। বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করেছি। আমি দেখেছি, নীলচাষের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় উন্নততর।... নীলকরদের দ্বারা হয়তো সামান্য কিছুটা ক্ষতি সাধিত হতে পারে, কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি যত ইউরোপীয় এখানে আছে তাদের যে কোনো অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এদেশীয় সাধারণ মানুষের কল্যাণই বেশি করছেন।' (দেখুন: পার্লামেন্টারি পেপারস। ভলিউম ৩৬। পৃষ্ঠা ২৭)। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখলেন– 'আমি দেখেছি, নীলের চাষ এদেশের মানুষের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদেরও উন্নতি যথেষ্ট সাধিত হয়েছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নেই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীলচাষ এলাকাভুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে।... আমি কেবল জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একথা বলছি না। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি একথা পেশ করছি।' (দেখুন: প্রাগুক্ত)। ইংরেজদের আস্থাভাজন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর গংদের ওকালতি বৃথা যায়নি। ১৮১৯ সালে পাশ করা হল 'অষ্টম আইন'। এই আইনে জমিদারদের নিজেদের জমিদারির ভিতরে পত্তনি তালুক দেবার অধিকার প্রদান করা হল। ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে ইংরেজদের জমি ও জমিদারি ক্রয় করার অধিকার প্রদান করে 'চতুর্থ আইন' পাশ করা হল। এই আইনের সুবিধা নিয়ে বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি এক বছরের মধ্যেই কেবল চুয়াডাঙ্গা, ঝিনেদা, রানাঘাট এবং যশোর অঞ্চলেই ৫৯৪টি গ্রামের জমিদারি কিনে নিয়ে ব্যাপকভাবে নীলচাষ করতে শুরু করে। কেবল নীলচাষ বা নীলব্যবসাতে অংশগ্রহণের কারণেই নয়, বরং বাংলায় সর্বনাশা নীলচাষের আইনগত ভিত্তি গড়ে দেবার কাজে রামমোহনের মতো মহাপুরুষরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা জনসমক্ষে তুলে ধরতে তাঁর সবচেয়ে বড় ভক্তও অস্বস্তি বোধ করেন। তাই বেশিরভাগ ইতিহাসে অকথিত থেকে যায় এইসব তথ্য। ইতিহাসের এই দর্শনকে কী নামে অভিহিত করা যায়?

তিন

সবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গ।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কি একটি জনযুদ্ধ ছিল? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে দুই নিয়মিত বা ট্রাডিশনাল সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ ছিল না, তা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবিত সকলেরই জানা। এতটাই জানা যে তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ বা দলিল উপস্থিত করারই প্রয়োজন নেই। যে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ হয়ে ওঠে, সেগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো আর কোনো যুদ্ধেই এত প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল না। ফলে প্রকৃত

একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এবং বাংলাদেশের মানুষ এক বিরল গৌরবের অধিকারী। কিন্তু ইতিহাস নির্মাণের ছলচাতুরি এই গৌরব থেকে ভবিষ্যতের বাঙালিকে বঞ্চিত করে ফেলবে এমন আশংকা এখনই দেখা যাচ্ছে। আর এই ইতিহাস নিজের ইচ্ছামতো লেখার চাতুরি শুরু হয়েছে, অন্য কোনো সরকারের সময় নয়, খোদ শেখ মুজিব সরকারের সময় থেকেই। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়নের জন্য যে পদক-তালিকা ঘোষিত হয়, তাতে সুস্পষ্টভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধের সম্মান থেকে সরিয়ে দেবার প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। চারটি খেতাব দেওয়া হয় মোট মাত্র ৬৭৬ জনকে। তারমধ্যে আবার ৫২০টিই দেওয়া হল সশস্ত্র বাহিনীতে নাম লেখানো মুক্তিযোদ্ধাকে। সর্বোচ্চ পদক 'বীরশ্রেষ্ঠ' দেওয়া হয়েছে ৭ জনকে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক 'বীরউত্তম' দেওয়া হয়েছে ৬৮ জনকে। তাদের মধ্যে ২ জন ছাড়া বাকি ৬৬ জনই সামরিক বাহিনীর লোক। তৃতীয় পদক 'বীরবিক্রম' দেওয়া হয়েছে ১৭৫ জনকে। তাদের মধ্যে ১৪৫ জনই সামরিক বাহিনীর। সর্বশেষ পদক 'বীরপ্রতীক'। এইক্ষেত্রে ৪২৬টি পদকের মধ্যে ৩০৫টিই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, নির্যাতিতা হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন। কিন্তু নারীদের ভাগ্যে পদক জুটেছে মাত্র ২টি। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পদক পেয়েছেন মাত্র ৫ জন। আর একশো বছর পরে সরকারি ইতিহাস অনুযায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হতে পারে, সেই আশংকা এখনই দেখা যাচ্ছে। আর আছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথা। ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ইতিহাসলেখকরা একদিন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আমাদের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি উপহার হিসাবে লিখবেন, এ ব্যাপারে প্রস্তুতি এখন থেকেই চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর পক্ষে অংশ নেওয়া একজন সামরিক অফিসার বলছেন– মিছেই ভারতের সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ফলাও করে লিখছে। আমাদের ভারতীয় বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা ছাড়া যুদ্ধে আর তেমন কিছুই করেনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। (দেখুন: অসীম রায়ের আত্মজীবনী 'জীবন-মৃত্যু'র দ্বিতীয় খণ্ড)।

চার

একই ঘটনার নানা রকম ইতিহাস রচিত হয়, এবং সেটা ঘটে ইতিহাসের দর্শন থাকে বলেই; সেই দর্শন আসলে ইতিহাস রচকদেরই।

১ জুন ২০০৯

ইতিহাস ও তার ভিত্তি

আদিত্য চৌধুরী

ইতিহাসের দর্শন বলতে আসলে আমরা কী বুঝব? ইতিহাসের অনেকগুলো ধারা রয়েছে। ধারাগুলোর মধ্যে এরিস্টটল যেটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন মূলধারা হিসেবে, সেটি হল, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সব কিছুই মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। মানুষই সব; মানুষ যাতে করে ভালো থাকতে পারে সে-জন্য যাবতীয় আয়োজন। তাহলে ইতিহাস বলতে মানুষের ইতিহাসই এক্ষেত্রে মূখ্য। মানুষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে হয়তো নানা বিষয় আসবে যার সব কিছুই সাজাতে হবে বা উল্লেখ করতে হবে মানুষের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনে। একইভাবে পৃথিবীর সকল ধর্মেই কিন্তু মানুষের মুক্তিই প্রধান। ধর্মের উদ্দেশ্যই মানুষের মুক্তি ঘটানো। সেখানেও ইতিহাসের দর্শন বলতে মানুষকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস তার দর্শনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়া নানা মত রয়েছে ইতিহাস ও তার দর্শন নিয়ে। কিন্তু মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী বা এলিমেন্টের কি ইতিহাস মানুষ আদৌ লিখতে যাবে? যাবে না। মানুষ তার নিজের ইতিহাসই লিখবে এবং সেটা করতে গিয়ে অন্যান্য এলিমেন্টের প্রসঙ্গ যতটা আসা দরকার সেটা আসবে। আর এটিই হল ইতিহাসের দর্শন।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Judgement বা বিচার; এই বিচার ইতিহাস লেখার সময় কে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করবে? ঐতিহাসিক হয়তো ইতিহাস লিখবেন কিন্তু তার ইধংরং বা ভিত্তিটি কী হবে? অর্থাৎ তিনি কি ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঘটনা বা বিষয়কে দেখবেন? নাকি সামাজিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে দেখবেন? নাকি ব্যক্তিগত নৈতিকতা দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করবেন? কাজেই এই ভিত্তি সুনির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। এই ভিত্তিস্তম্ভ ঠিক না করে ইতিহাস বা ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

দুই

যে-কোনো দেশ, বড় হোক বা ছোট হোক, সকল দেশেরই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী হতে পারে, আবার দীর্ঘমেয়াদীও হতে পারে। গৃহীত এই পরিকল্পনা অনুসারেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারেই আজকের কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় ভবিষ্যতের ইতিহাস। কাজেই আগামীর ইতিহাসের দর্শন হল আজকের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। ধরা যাক, আমেরিকার কথা, এই দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন হোক, জর্জ বুশ হোক বা ওবামাই হোক– মূল কথা হল এই আলাদা ব্যক্তি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং আগামী একশ বছরে এই দেশটি কী কী বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সেটা কিন্তু তারা পরিকল্পনা করে নিয়েছে। কোনো প্রেসিডেন্টই সেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন না বা করবেন না। বড়জোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলটা এক প্রেসিডেন্ট থেকে অন্য প্রেসিডেন্টের কিছুটা আলাদা হতে পারে।

সুতরাং যা দাঁড়াচ্ছে সেটা হল, আগামী একশ বছরে পৃথিবীতে বড় বড় কী কী ঘটনা ঘটবে সেটা আমেরিকা প্রশাসন এখনই ঠিক করে রেখেছে। এবং এই পরিকল্পনা অনুসারেই আগামী একশ বছরে পৃথিবীর ইতিহাসটা কী কী ঘটনা দ্বারা পূর্ণ থাকবে তার দর্শন আমেরিকার পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশের কিন্তু দশ/বিশ বছরের পরিকল্পনাও নেই। সে কারণে আমরা জানি না আমাদের ইতিহাসটা কীভাবে সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের সরকার বা দেশের নির্বাহীদের কোনো দর্শনও নেই যার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আমাদের ইতিহাস সৃষ্টি হবে। বরাবরের মতো অন্যদের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের ওপর ভর করেই আমাদের ইতিহাসটা তৈরি হবে। দৈবক্রমে হয়তো সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটতে পারে। নিজেদের আমরা স্বাধীন বলছি বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি স্বাধীন হতাম, তাহলে অবশ্যই জানতাম আগামী অন্তত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ কী কী বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেটা যেহেতু আমরা জানি না, তাই আমাদের আজকের দিনের যে ইতিহাস ভবিষ্যতে লেখা হবে তার দর্শনও কী হবে তা আমরা জানি না। কিন্তু এটা বলা অতিরিক্ত হবে না যে, বাংলাদেশের ভাগ্যে আগামী একশ বছরে কী আছে সেটা নিশ্চয়ই আমেরিকা জানে। ফলে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ইতিহাস ও তার দর্শন আমরা খুব একটা না-জানলেও, আমেরিকা ও উন্নত দেশগুলো ভালোই জানে।

আমেরিকার যে জনসংখ্যা সেটা ঘনত্বের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম, অর্থাৎ ইচ্ছা করলে বাইরে থেকে জনসংখ্যা নিয়ে আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ এখনও তাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দ্বিতীয়ত আমেরিকায় এখনও যে পরিমাণ সম্পদ আছে সেটা দিয়ে আরও বহুদিন পর্যন্ত আত্মনির্ভর থাকার সুযোগ তাদের হাতে আছে, তৃতীয়ত তাদের হাতে যে সামরিক শক্তি আছে শুধু তাই নয় তারা ইচ্ছা করলে আরও যে পরিমাণ মিলিটারি পাওয়ার বাড়াতে পারে তাতে করে আগামী দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে সামরিক শক্তিতে আমেরিকা এখনকার মতোই দাপটের সঙ্গে চলতে পারবে। অন্যদিকে পণ্য-বাজারের দিকে তাকালে দেখা যাবে, পৃথিবীর কোনো দেশ চাইলেই কিন্তু আমেরিকার বাজারকে উপেক্ষা করতে পারে না, ভবিষ্যতেও অনেক কাল পর্যন্ত পারবে না। ধরা যাক চীনের কথা, উৎপাদন ও রপ্তানীর মাধ্যমে চীন এত প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি অর্জন বা ধরে রাখা আমেরিকার বাজারকে উপেক্ষা করে কখনোই সম্ভব নয়। হয়তো মনে হতে পারে চায়নার নিজের যে জনসংখ্যা আছে সেটাই তাদের আন্তঃবাজার সৃষ্টির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু বাস্তবে শুধু আন্তঃবাজারের ওপর নির্ভর করে এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বাজার বিশেষজ্ঞের মতে শুধু চায়না নয়, পৃথিবীর যে-কোনো দেশকে পণ্য উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার বাজারের ওপর নির্ভর করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং আমাদের সামনে আমেরিকার দর্শনটা কী, তার অতীত ইতিহাসটা কী তার ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। একইভাবে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা যে নানা সেক্টরের দার্শনিক ভিত্তি পাব তার মধ্যেই কিন্তু আমাদের গলদটাও নিহিত। আমরা বলছি না যে, হুবহু আমেরিকার মতো করেই আমরা করব; কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন সেক্টরের যে ইতিহাস এবং সেগুলোর দার্শনিক ভিত্তি, সেখান থেকে আমাদের নেয়ার আছে অনেক কিছুই।

আমাদের সার্বিক যে ইতিহাস সেখান থেকে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ইতিহাসটাকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে কিন্তু খুব ভালো কিছু পাব না। বাঙালি স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে খুব বেশি দিন হয়নি, যেসব ব্যবসা তারা করছে সেগুলোও কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে থাকে না বরং দেখা যায় এক প্রজন্মের বেশি সেগুলোর ধারাবাহিকতা থাকে না। অর্থাৎ বাঙালি কিন্‘ Institution করার ক্ষেত্রে পারদর্শি নয়। সুতরাং বাঙালির দুর্বল এই সকল জায়গা তার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে এবং সেই দুর্বল দিকগুলোর পেছনে কী ধরনের দর্শন কাজ করেছে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

আমরা নিজেদের সমালোচনার তাগিদ থেকে আরেকটি প্রসঙ্গ তুলতে পারি, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত, আরেটি বড় অংশ শুধু ডিগ্রীধারী ; কিন্তু পেশাগত দিক থেকে অভিজ্ঞ কিংবা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের ভীষণ অভাব। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশে যে পরিমাণ সম্ভাব্য সম্পদ আছে সেটা কী পরিমাণে এবং কী অবস্থায় আছে? বিশেষ করে আবাদী জমির বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, স্থল ও জল ভাগের খনিজ সম্পদ-এর পরিমান নির্ণয় এবং সে অনুসারে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি। সর্বোপরি আমাদের দেশের ভেতরকার পণ্য-বাজার কতটুকু এবং অন্যান্য দেশে কী পরিমাণ পণ্য আমরা রপ্তানি করতে পারছি? আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিহাস কি আদৌ লেখা হয়েছে? হয়নি। সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসটা লেখা জরুরি এবং তার দার্শনিক ভিত্তি কী সেটা গবেষণা করে বের করা প্রয়োজন। এরপর আমাদের দুর্বলতাগুলো কী কী সেই অনুসারে সেখানে থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের করণীয় কী সেটা ঠিক করতে হবে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ভাবেই।

তিন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথাই যদি ধরি, তাহলে দেখা যাবে, যুদ্ধ হয়েছে একটি কিন্তু এর ইতিহাস লেখা হয়েছে নানা দল-গোষ্ঠীর নিজস্ব দৃষ্টি থেকে বহু রকমের। সে কারণে নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক কথাও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শোনা যায়। যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে এই জাতির জন্ম হয়েছে, সেই মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তো কোনো রকম বিতর্ক থাকা ঠিক নয়। নতুন প্রজন্ম এবিষয়ে বিভ্রান্তিতে পড়বে, যদি না প্রমাণাদি সহ বিষয়টিকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশ্ন হল এরকম একটি বিষয় নিয়ে তো বিভ্রান্তির মধ্যে থাকা ঠিক নয়। কাজেই ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তথ্য কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের অধিকাংশ গবেষণাই হয় রাজনৈতিক দলের অনুগামী হয়ে , ফলে সেই গবেষণার মাধ্যমে যে ইতিহাস লেখা হয়, সেটাও হয়ে যায় দলীয়, যা সাধারণ জনগণের ইতিহাস নয়। এতে মানুষের আস্থা অর্জিত হয় না। অথচ ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে যে উপাত্ত ব্যবহার করা হয়, সেটা যদি নির্ভরযোগ্য গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে আনা না হয়– তাহলে ইতিহাসও মানুষের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হবে না।

আমরা তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলি যা অনেক মানুষের কাছেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তি কালে যদি ঐ বিষয়ের তথ্যপ্রমাণ তৈরি করতে যাওয়া হয় আর সেখানে যদি ভিন্নরকম তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে একটি বড় ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে। আবার তথ্যপ্রমাণ তৈরি করা না-হলেও ভবিষ্যতে এর সত্যতার ভিত্তি নিয়ে আরেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং বিষয়টি ইতিহাস লেখা ও চর্চার ক্ষেত্রে একটি সসম্যা, যার সমাধানের লক্ষ্যে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার সেটা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে রাজনীতি প্রভাবিত ইতিহাসের পাশাপাশি নিরপেক্ষ ইতিহাসও আছে। আমেরিকার একজন ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড জিন একেবারেই সাধারণ মানুষের ইতিহাস লিখেছেন যা অধিকাংশ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এমন ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সকল ইতিহাসই হল রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস। সে কারণে আমাদের এখানে প্রকৃত ইতিহাসটা লেখা হয়নি। আমরা তো আমাদের পরিচয়ই ঠিক করতে পারিনি। ৪৭-এ আমরা হলাম মুসলমান, ৭১-এ আবার হলাম বাঙালি। আমরা মুসলমান নাকি ধর্মনিরপেক্ষ অথবা আমরা বাংলাদেশী নাকি বাঙালি– এরকম বিতর্কই তো আমাদের শেষ হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় জাতি হিসেবে আমরা এখনো পরিপক্ক হইনি। পরিপক্ক কোনো জাতি নিজেদের এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে দ্বিধার মধ্যে না থেকে দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে আমাদের এইসব বিতর্ক ও কলহ কবে মিটমাট হবে সেটাও কেউ জানে না। হয়তো আরও দীর্ঘকাল এই বিতর্কগুলো আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে এবং তাতে আমাদের যে সার্বিক উন্নয়ন হওয়া দরকার সেটা ব্যাহত হবে।

পৃথিবীর অনেক দেশ অতি অল্প সময়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। বাংলাদেশও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে খুব বেশি সময় অতিক্রম করেনি। তবে এই সময়ের মধ্যেও বাংলাদেশ যেখানে পৌঁছতে পারত, বাস্তবে তার ধারেকাছেও পৌঁছায়নি। তাহলে এর পেছনে কারণটা কী। অনেক কারণই হয়তো আছে; অনেক কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হল আমাদের মধ্যে সবার আগে কাজ করে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা, এরপর নিজের দল ও গোষ্ঠীর কথা ভাবা হয়। দেশের স্বার্থের কথা ভাবা হয় সবার শেষে। কিন্তু অল্প সময়ে উন্নতি করা দেশসমূহের মানুষের মধ্যে এই চিত্র ঠিক উল্টো। অর্থাৎ তারা সবার আগে ভাবে নিজের দেশ সম্পর্কে; তারপর নিজের দল-গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত বিষয়আশয় নিয়ে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিস্বার্থ নেই আমি তা বলব না তবে সেটা আমাদের মতো প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে না। সে কারণে তাদের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন ধরনের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। আমাদের জাতীয় স্বার্থ যেহেতু প্রধান বিষয় নয় সে কারণে আমরা ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির বিষয় ও উপাদানকে এড়িয়ে গিয়ে দলীয় ও ব্যক্তিগত বিষয়কে প্রাধান্য দেই। যা প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নয়। ফলে 'আমাদের ইতিহাস' নামক আয়নার দিকে তাকালে আমাদের কুৎসিৎ প্রতিবিম্বই দেখা যায়। এখান থেকে অবশ্যই উত্তরণ প্রয়োজন।

অনুবাদ

ইতিহাসের দর্শন: মার্ক্সের রচনায় বস্তুর অধিবিদ্যা

স্কট মাইকেল/অনুবাদ শওকত হোসেন

[স্কট মাইকেল স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অভ গ্লাসগো'র দর্শনের প্রভাষক। তিনি *এসেনশিয়ালিজম ইন দ্য থট অভ কার্ল মার্ক্স* [১৯৮৪] ও ইতিহাসের দর্শন ও মার্ক্সের ওপর আরও অনেক প্রবন্ধের রচয়িতা।]

প্রাচীনকাল থেকেই অ্যারিস্টটলের মতবাদই ইউরোপীয় দর্শনের প্রাথমিক ঐতিহ্য হয়ে আছে। অধিকাংশ দার্শনিকই এর একই ভাষ্যের অধীনে কাজ করে গেছেন। এটা বললে অতিশয়াক্তি হবে না যে দর্শন অ্যারিস্টটল ও বিশেষ করে বস্তুর আধিবিদ্যামূলক মতবাদের পাদটীকা হয়ে আছে। তবে এই ঐতিহ্য অবশ্যই অপরিবর্তনীয় একরৈখিক কোনও ব্যাপার নয়, বরং অধিবিদ্যামূলক নীতিমালার সম্মিলন থেকে সৃষ্ট ঐক্য ও ধারাবাহিকতার এক বৈচিত্র্য যা অ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুগামী থেকে শুরু করে আরবরা, আল-ফারাবি ও আবু রুশদ হয়ে সেইন্ট টমাস ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক ও বারুচ স্পিনোযা, গত্রিদ লেইবনিয, জি.ডব্লু. এফ. হেগেল এবং মার্ক্স পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অধিবিদ্যার দিক থেকে মার্ক্স ছিলেন অ্যারিস্টটলবাদী, একথা মনে না রাখলে আমরা তাঁর কাজ উপলব্ধি করতে পারব না। মার্ক্সের সময় থেকেই এই বিষয়টি বিস্মৃত হওয়ার কারণ শতাব্দী জুড়ে বিশেষ করে ইংরেজিভাষী দেশে, পাণ্ডিত্য ও চিন্তাধারায় ডেভিড হিউমের মতো অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের বেশি প্রভাব ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের লেখকদের অভিজ্ঞতাবাদী অধিবিদ্যমূলক নীতিমালার অধীনে পুনর্ব্যাখ্যা করাই ছিল বেশ কয়েক দশকের দস্তুর। অ্যারিস্টটল ও মার্ক্স এই রেওয়াজের অধীন দুজন প্রধান ব্যক্তিত্বমাত্র, তাই তাঁদের বুঝতে হলে সাম্প্রতিক অধিকাংশ লেখালেখি থেকে আমাদের একটু পিছিয়ে আসতে হবে।

কোনও না কোনও অধিবিদ্যা দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচলিত হয়ে থাকে। মার্ক্স কোনওদিনই অধিবিদ্যামূলক নিবন্ধ লেখেননি। পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্ত পর্যবেক্ষণ কদাচিত একপেশের চেয়ে বেশি। তাত্ত্বিক রচনায় তাঁর অধিবিদ্যা অপ্রকাশিত যা প্রধানত তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় মেলে, সেখানে পৌঁছুনোর স্বার্থে আমাদের উদ্ধৃতি বের করতে হবে। আমি মার্ক্সের বেশিরভাগ মৌল ধারণায় অ্যারিস্টটলের প্রভাব বিবেচনা করতে আগ্রহী। অভিজ্ঞতাবাদী বিকৃতকারী প্রিজমের ভেতর দিয়ে তাঁকে পাঠ করার অনুপযোগিতা দেখাতে চাই আমি। সেকারণে আমাদের অবশ্যই বস্তুর অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বের কিছু উপাদান বিবেচনা করে সেগুলোকে হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের বিপরীতে স্থাপন করতে হবে, যা একে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিল। আমি বিশেষ করে মার্ক্সের মূল্যের তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দেব। এই তত্ত্ব সামঞ্জস্যতার অন্তর্নিহিত নীতি তুলে ধরে ও পুঁজি সম্পর্কে মার্ক্সের চিন্তাভাবনাকে তত্ত্ব বলে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। দর্শনের ছাত্ররা মূল্যের তত্ত্বকে দর্শনের চেয়ে বরং অর্থনীতির মৌল বিষয় বলে ধারণা করতে প্রণোদিত হয়। এটা বিরাট ভুল–পরে যেমন দেখতে পাব আমরা।

বস্তু, প্রকৃতি ও ক্ষমতা

অধিবিদ্যা অর্থাৎ *মেটাফিজিক্স* অ্যারিস্টটলের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান, যদিও তিনি এই নাম ব্যবহার করেননি। নামটি এসেছে গ্রিক বাগধারা *তা মেতা তা ফিজিকা* থেকে, অ্যারিস্টটলের প্রাচীন সম্পাদকগণ তাঁর রচনাবলির ওই অংশে অন্তর্ভুক্ত একগুচ্ছ রচনার নামকরণে ব্যবহার করেছিলেন। ওই প্রবন্ধগুলোর প্রধান বিবেচ্য প্রশ্ন ছিল কোন জিনিসগুলো বাস্তব? সত্তা কী? জগত সম্পর্কে কথা বলার সময় আমরা প্রায়ই কোনও জিনিসকে বোঝানোর জন্যে তাতে কোনও গুণ বা ক্ষমতা আরোপ করি। বস্তুর যে মৌল বিষয়কে আমরা আমাদের অনুমানের বিষয়ে পরিণত করি অ্যারিস্টটল তাকেই বলেছেন *বস্তু*। আমরা সেগুলোর নামকরণের জন্যে যে পরিভাষা ব্যবহার করি সেগুলো সাধারণভাবে *জিনিসটা কী?*–এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অস্তিত্ববান, বাস্তব। সবই 'একটা কিছু' এবং অস্তিত্ববান প্রতিটি জিনিসের বেলায় *সেটা কী?* এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। মূল পরিভাষা এই প্রশ্নে সবচেয়ে মৌল ও সেরা উত্তর যুগিয়ে থাকে। [উইগিন্স, ১৯৮০: ২৪, ৬২]।

বস্তুর চরিত্র, গুণাবলি আর প্রবণতা রয়েছে; রয়েছে সেইসব গুণ সেগুলো যে ধরনের বস্তু, বা অ্যারিস্টটল ও অ্যাকুইনাস যেমন বলেছেন, তাদের প্রকৃতি বা সত্তার কারণে থাকতেই হবে। আমাদের কাজ হল এইসব প্রকৃতি উপলব্ধি করা, সেগুলোর গঠন এবং সেগুলো কীভাবে আমরা যেভাবে সেগুলোকে কাজ করতে দেখি সেভাবে কাজ করে তা বোঝা। এসবই বস্তুর প্রকৃতি থাকার কথা ও এমনকি সেগুলো সত্যিকারের অর্থে বস্তু যদি বস্তু বলতে 'কিছু গুণের

সমাবেশ' থেকে বেশি কিছু বুঝিয়েও থাকি তাকে অস্বীকারকারী অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের বিপরীত ধারায় চলে। অভিজ্ঞতাবাদ বলে আমরা বস্তুর প্রবণতা বা ক্ষমতা নয় কেবল বস্তু যা করে তাই লক্ষ্য করতে পারি। অ্যারিস্টটল ও অ্যাকুইনাস এখানে দ্বিমত পোষণ করতেন না যে আমরা বস্তু কী করে কেবল তা পর্যবেক্ষণ করেই তার প্রবণতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারি। তবে তাঁরা এই কথার আপত্তি করতেন, মার্টিন যেমন উল্লেখ করেছেন, 'অভিজ্ঞতাবাদীদের দাবি যে আমরা কেবল বস্তু কী করে তাই লক্ষ করতে পারি, এবং আমরা সেটাই করছি; বস্তু কী করতে পারে কেবল সেটাই আমরা লক্ষ করছি না, কী করার প্রবণতা রয়েছে সেটাও লক্ষ করছি।' *অ্যাকুয়া রেজিয়া* সোনাকে গলায়, আফিম মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, কারণ এই বস্তুগুলোর এই কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে...আপনি সেই ক্ষমতাই প্রত্যক্ষ করেন [গিচ, ১৯৬৩:১০১-৪; মার্টিন, ১৯৮৮;৩-৫; ৭৩-৫]।

উপযোগিতা ও বিনিময় মূল্য

মানবীয় শ্রমের সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে কোনও একটা উদ্দেশ্য পূরণ করা। সেই সৃষ্টির নকশা এমনভাবে করা হয় যাতে সেগুলোর সেই গুণই থাকে যেগুলো তাদের উপযোগী করে তুলবে। সেকারণেই এসবকে মূল্যবান বলে উল্লেখ করা হয়। তবে পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতিতে সৃষ্টির দ্বিতীয় এক ধরনের মূল্যও আছে: বাজারের আরোপিত বিনিময়যোগ্যতার কারণে বিনিময় মূল্য। যেমন, ১০০ ডলার উৎপাদিত যেকোনও বস্তুর একটা পরিমাণ বোঝায়: কয়েক হাজার পিন, বিএমডব্লু গাড়ির একটা অংশ, কয়েক বুশেল গম, ইত্যাদি। এসব একই ধরনের বস্তুর সমান, আবার এগুলো পরস্পরের সমান। অনুপাত ঠিক থাকলে এগুলো একে অন্যের সমান। ক পরিমাণ গম = খ পরিমাণ তামা। এই ধরনের সমীকরণ আমাদের নিত্যদিনের জীবনে এতই সাধারণ যে তা দার্শনিকভাবে তা কতটা বিভ্রান্তিকর সেটাকে অস্পষ্ট করে তোলে। এটাই মূল্যের সমস্যার মূল কথা।

নিকোমাচিয়ান এথিক্স-এর খ -৫, অধ্যায়-৫-এ অ্যারিস্টটল অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এই সমস্যাটি সূত্রবদ্ধ করেছেন। [তাঁর পলিটিক্স-এর খ -১, অধ্যায় ৮-১০ও দেখুন]। তবে তিনি তাঁর কোনও সমাধান দেননি। সূত্রটি এরকম: ক ও খ-এর নিজস্ব প্রকৃতি আছে, অতএব তাদের বিশেষ গুণও আছে। গুণের বিচারে কোনও জিনিসকে সমরূপ বা ভিন্ন বলা যেতে পারে। অ্যারিস্টটল বলছেন, [*ক্যাটাগোরিজ* ১১এ১৫-১৬] কিন্তু সমীকরণ একথা বলছে না যে ক ও খ একই রকম। এটা বলছে এগুলো সমান। 'পরিমাণের বেলায় বিচিত্র ব্যাপার হল এগুলোকে সমান বা অসমান বলা যেতে পারে।' [*ক্যাটেগোরিজ* ৬এ২৬] সুতরাং এই সমীকরণে তামা ও গম এসেছে পরিমাণ হিসাবে; নিজস্ব গুণাবলী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসাবে নয়, কোনও বস্তুর বিশেষ পরিমাণ হিসাবে। মার্ক্স একে বলছেন মূল্য। সমস্যা হচ্ছে কোনও বস্তুর মূল্য বের করা। এখানে সমস্যার মার্ক্সীয় সূত্রের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ যৌক্তিক রূপে তা অ্যারিস্টটলেরই অনুরূপ।

মার্ক্স শ্রমকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী সাধারণ প্রকৃতি হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন। তাঁর এই শনাক্তকরণের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। তবে আমাদের সমালোচনা মার্ক্সের মূল্যের ধরন সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রতি নয়, বরং মূল্য বলে আদৌ কিছুর অস্তিত্ব থাকার ধারণার প্রতি–তার উপর যেমন প্রকৃতিই আরোপ করা হোক না কেন। সমালোচকগণ পণ্যের একটা সাধারণ প্রকৃতি তুলে ধরার কোনও প্রয়োজন বোধ তো করেনই না, বরং প্রায়শই একে 'অধিবিদ্যামূলক' সত্তা বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

যৌক্তিকভাবে এমন সমালোচনা করা কতটা সম্ভব বোঝা সহজ নয়। কারণ সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত করার আগে বস্তুকে অবশ্যই তুলনাযোগ্য হতে হবে। কেউ বলতে পারবে না কতগুলো মাছ মিলে প্লুটো গ্রহের সমান হবে, কারণ মাছ আর গ্রহ তুলনাযোগ্য নয়। তুলনাযোগ্য হতে হলে তাদের কিছু সাধারণ গুণ থাকতে হবে। সেটা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত আমরা তাদের পরিমাণের মধ্যে কোনও তুলনা করতে পারব না। তা সত্ত্বেও সমালোচনার মূল কথা হচ্ছে, বিনিময় মূল্যের সমীকরণে কোনও সাধারণ প্রকৃতি নেই, আছে কেবল সমীকরণ।

বাজার অর্থনীতিতে সকল পণ্য ও পণ্য নয় এমন সব কিছুরই নিরাবেগ অনুপাতে বিনিময় হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করাই মূল সমস্যা। শুমপিটার বলছেন, কোনও জিনিসের এই ক্ষমতা আছে বলার মানে তা সেই কাজগুলোই করে যা করার ক্ষমতা এর আছে বলে বলা হয়ে থাকে। বস্তুর বিনিময় হওয়ার ক্ষমতা থাকার মানে 'এটা বিনিময় হয়' বলা ছাড়া আর কিছু না। এই ক্ষমতা তার প্রয়োগের চেয়ে ভিন্ন কিছু ভাবা বিভ্রম মাত্র। এ ক্ষেত্রে সাধারণ হিউমীয় অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি হল ক্ষমতা ও এর প্রয়োগের ভেতর পার্থক্য টানা যেতে পারে। [হিউম, ১৯৬০: ১৬৬, ১৭৩]।

শুমপিটারের যুক্তির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত স্যামুয়েল বেইলির *ক্রিটিকাল ডিসারটেশনে* এর আদি ভাষ্য পাওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: 'মূল্য হচ্ছে পণ্যের বিনিময় সম্পর্ক এবং সে হিসাবে এই সম্পর্ক থেকে ভিন্ন কিছু নয়।' এবং 'কোনও জিনিসের মূল্য এর ক্রয়ক্ষমতা হয়ে থাকলে ক্রয় করার মতো অবশ্য কিছু থাকতে হবে। সুতরাং মূল্য ইতিবাচক বা ক্ষণস্থায়ী কিছুই বোঝায় না, বরং স্রেফ বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসাবে দুটো বস্তুর অবস্থান তুলে ধরে।' [মার্ক্স উদ্ধৃত, ১৯৭২, ১৪০]।

মার্ক্স-এর সূত্রায়িত মূল্যের সমস্যা কোনও ক্ষমতাকে, অর্থাৎ বিনিময়ের সময় বস্তুসমূহের যে ক্ষমতা থাকে, তাকে ব্যাখ্যা করা [মার্ক্স, ১৯৭২: ১২৫-৪৭, ১৬০-৫]। ক্ষমতা বা শক্তিসংক্রান্ত বস্তুর অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের অভিযোজন থেকে তাঁর এই চিন্তা এসেছে। এই মতবাদ অনুসারে ক্ষমতাকে তার প্রয়োগ থেকে আলাদা করতে হবে। যেমন, ফরাসি ভাষা জানে এমন কাউকে সাধারণভাবে ঘুমন্ত বা ইংরেজিতে কথা বলার সময় কিংবা স্রেফ নীরব অবস্থায়ও সেই গুণের অধিকারী বলে ধরা হয়। ক্ষমতা থাকা এবং ফরাসি ভাষায় কথা বলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। মার্ক্সের যেসব সমালোচক মূল্যের ধারণা ও একে যে সমস্যার সমাধান মনে করা হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তাঁরা ক্ষমতা সম্পর্কে হিউমীয় ধারণা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানকালেও মার্ক্সের এমন সমর্থক আছেন যাঁরা তাঁর মূল্যের তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁরা তাঁর মতো অ্যারিস্টটলীয় অধিবিদ্যা ধারণ করেন না এবং সচেতন বা অবচেতনভাবে তাঁরা এই সমালোচকদের মতো হিউমীয় অধিবিদ্যায় প্রভাবিত। শুমপিটার উপসংহার টেনেছেন, 'মূল্যের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারলে আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বা অর্থহীন প্রতীয়মান হওয়া তাঁর তত্ত্বের অনেকটাই আর তেমন থাকবে না।' [শুমপিটার, ১৯৫২, ২৩, টীকা ২]।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা-সংক্রান্ত এইসব অধিবিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর কোনটা বেশি সমর্থনযোগ্য। সাধারণভাবে ক্ষমতা ও এর প্রয়োগের অ্যারিস্টটলীয় পার্থক্য পছন্দসই বলে মনে হয়। এই বিষয়ের ওপর সাম্প্রতিক লেখালেখি এই দৃষ্টিভঙ্গিরই সমর্থক। [আয়ারস, ১৯৬৮: ৫৫-৭৫, ৮০-৯৫; কেনি, ১৯৭৫: ১২৩-৪৪]। অর্থনীতিতে মূল্যের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হিউমীয় পদ্ধতি মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

পরিচয় ও বস্তু

বস্তু অস্থায়ী ও নানান পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়; অস্তিত্ব পায়, বিকাশ লাভ করে, তারপর বিস্মৃত হয়। মান, পরিমাণ ও স্থানের দিক থেকে এদের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তারপরেও অবিরাম পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তা টিকে থাকে। আমরা বলতে পারি বস্তু বদলায়, কিন্তু একই রয়ে যায়, পরিচয় ধরে রাখে। এই পরিচয় নির্ধারণে বিরাট দার্শনিক সমস্যা রয়েছে; বর্তমানে এর সবচেয়ে শক্তিশালী বিবরণ চারিত্র্যের দিক থেকে অ্যারিস্টটলীয় [ফ্ল্যাকিং, ১৯৭২; স্ট্রসন, ১৯৫৯; উইগিন্স, ১৯৮০]।

বস্তু স্বাভাবিক পদার্থ, এগুলো তারা যে বস্তু তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাজ করে [গিচ, ১৯৬৩, ১০১-৪]। অ্যাকুইনাস কোনও বস্তু কী করে ও তার স্রেফ কী ঘটে তার পার্থক্য করেছেন। পানির অনেক রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এর যেকোনও একটা রূপ ধারণ করার বিশেষ কোনও প্রবণতা নেই, তবে এর নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কোনও বস্তুর কার্যধারার ধারণা কোনও বিশেষ ধরনের বস্তু হিসাবে শনাক্তযোগ্যতার ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। অ্যাকুইনাসের মতে বিশেষ কোনও বস্তু যা তা হচ্ছে ওই বস্তু টি ঠিক কোন ধরনের কাজ করে থাকে। এভাবে পৃথিবীর বিধি-বিধান এর বস্তুসমূহের পরিচয় ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক অ্যারিস্টটলীয় ঐতিহ্যে অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে লেইবনিয হয়ে চলমান রয়েছে (ফ্ল্যাকিং, ১৯৭২; উইগিন্স, ১৯৮০, ৭৭-৯০)।

অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন মনে করে বস্তু চিরন্তন এবং তাদের আচরণে কী কী নিয়ম লক্ষ করা যেতে পারে সেটা বিবেচনা করে। কিন্তু আমরা প্রথমে কেবল বস্তুর মুখোমুখি হই ও তারপর সেগুলোকে তাদের স্বগোত্রীয়দের মাঝে বণ্টন করি, অভিজ্ঞতাবাদীদের এই ভাবনা ঠিক নয়। আসলে বস্তু আগে থেকেই স্বগোত্রীয়দের অন্তর্ভুক্ত থাকে বলেই আমরা সেগুলোকে শনাক্তযোগ্য একক বস্তু হিসাবে চিনতে পারি। কোনও একটি গোত্রের বস্তু হিসাবে শনাক্তযোগ্য না হলে একক বস্তু হিসাবে তা শনাক্ত হতে পারে না। বস্তুর প্রকৃতি, প্রবণতা ও ক্ষমতা থাকার বিষয়টি অগ্রাহ্য করে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন বস্তুকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। এটা কোনও বস্তু যা করে তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

কেবল পরিচয়ই নয়, ব্যাখ্যাও এই বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটি অবস্থা ব্যাখ্যা করার মানে একে কোনও সত্তা ও সেই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে তার ক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা। অভিজ্ঞতাবাদী অধিবিদ্যা এই ব্যাখ্যাকে স্থান দিতে পারে না।

কোনও প্রবণতার ধারণা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও চর্চার মৌল বিষয়। একে মুছে ফেলা যাবে না [গিচ, ১৯৬৩: ১০১-৪; মার্টিন, ১৯৮৮: ৭১-৫]। এটা একটা কারিগরি ধারণা, কারণ প্রবণতাসমূহকে তাদের 'ফল' অর্থাৎ প্রবণতাসমূহের কী করার প্রবণতা আছে সেই প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়। হস্তক্ষেপের ধারণাও, পি.টি. গিচ যাকে আইনের হিউমীয় ধারণার অনিবার্য বিধানের বিনাশ হিসাবে তুলে ধরেছেন, সেটাও চরিত্রগত দিক থেকে উদ্দেশ্যবাদী (ঃবষবড়ষড়মরপধষ)। বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে এই ধারণার উপস্থিতি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের অনীহা রয়েছে, কারণ উদ্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এক ধরনের সংস্কার কাজ করছে। এই সংস্কারের কারণ, অংশত মনে করা হয়ে থাকে যে উদ্দেশ্যবাদ বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে, আজকাল কেউ যাকে মানতে চায় না এবং তার কারণ অংশত এতে 'কারণে'র আগেই 'ফল'কে বসানোর দ্বিধান্বিত বিশ্বাস; এবং অংশত এখানে কার্যকারণের হিউমীয় ধারণা ও এ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন ঘটনার ধরনের অনিবার্য নিয়ামক হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিধির শক্তির উপর ভ্রান্ত আস্থা স্থাপনের ধারণা [হাল, ১৯৭৪, ৮৭-৯৭, ১০১-২৪]।

বস্তুর আকার আছে। আকার এভাবে বোঝা যেতে পারে: কোনও টেবিল বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের–ধরা যাক কার্বন আর হাইড্রোজেন–নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়ে তৈরি। এগুলোই তার উপকরণ। পরীক্ষাগারে একজন বৈজ্ঞানিক স্রেফ একটা বোতলে এই একই উপাদানের একই পরিমাণ সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। বোতলের উপাদান এক অর্থে টেবিলের উপাদানের অনুরূপ, কিন্তু সেগুলো কোনও বস্তুর উপকরণ বোঝায় না। টেবিল আর বোতলের উপকরণের পার্থক্য হচ্ছে টেবিলের আকার। টেবিল আকার বিশিষ্ট বস্তু, আর বোতলের পদার্থটুকু কেবল কিছু বিন্দুর সমাবেশ, কিন্তু নিজে কোনও বস্তু নয়, কারণ এর কোনও আকার নেই। আকার কোনও বস্তুকে সেই বস্তুতে রূপান্তরিত করে। আকার এবং কোনও জিনিসের উপাদান এর প্রকৃতি বা মৌল সত্তা তৈরি করে।

বস্তু ও সমাজ

অ্যারিস্টটল সমাজকে বস্তু হিসাবে দেখেছেন, মার্ক্সও তাই। এর স্বাভাবিক বিকাশ, আকার ও সারবত্তা আছে; এটা একটা একক, অনুমাননির্ভর; এর উন্নতি, সংজ্ঞা ও মূল সত্তা আছে। তবে সমাজ উপাদানের দিক থেকে আসলে অস্বাভাবিক বস্তু। আমরা সাধারণ কোনও বস্তুকে ভেঙে এর উপাদানে বিভক্ত করতে পারি, তাতে করে প্রতিটি খণ্ড নিজস্ব প্রকৃতিসমৃদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে। কিন্তু সমাজকে বস্তু হিসাবে কল্পনা করতে গেলে আমরা এর উপকরণ নিয়ে সমস্যায় পড়ি। টেবিলের মতো এর মূল সত্তা অন্যান্য বস্তুতে তৈরি; তবে এই বস্তুগুলো মানুষ; তারা সমাজের বস্তু হিসাবে কোনও পরোক্ষ উপায়ে সমাজের উপকরণে পরিণত হয় ভাবতে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। সমাজ বস্তু হলে এবং আচরণের প্রবণতা থাকলে এর উপাদানসমূহের প্রকৃতি ও আচরণও উচ্চতর পর্যায়ের সত্তার প্রকৃতি ও আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা সেটা ভাবতে তৈরি নই। মানুষ ভাবতে পারে, নিজের গন্তব্য বেছে নিতে পারে এবং মুষ্টিমেয় এই সত্যের অস্বীকারকে ভালোভাবে নেয়। সমাজ একটা বস্তু এবং মানুষ স্বাধীন সত্তা, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর অনস্বীকার্যভাবে একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে।

এই সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুটো খারাপ উপায় রয়েছে। একটা হচ্ছে সমাজকে প্রকৃতি, বিকাশ ও প্রবণতাসমৃদ্ধ কোনও কিছু হিসাবে ধরে নেওয়া, কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে ছোট করে দেখা। ১৯৩০, ১৯৪০ এবং ১৯৫০'র দশকে সোভিয়েত লেখকগণ এই ধরনেরই একটা কিছু তুলে ধরতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। এরই একটা ভাষ্য লুইস আলতহুসার এবং তাঁর অনুপ্রাণিত মতবাদে অব্যহত ছিল [আলতহুসার, ১৯৬৯: ২১৯-৪১; ১৯৭৭; ১২১-৭৩]। অপর খারাপ উপায়টি হল মানুষকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া কিন্তু সমাজের বস্তুগত প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা; যেমন, এটা আসলে বস্তু নয় এবং একে অগ্রহণীয় 'জৈবিক' বা 'প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক' তুলনা হিসাবে ভাবা সম্ভব নয় বোঝাতে এর আকারকে সমাবেশ হিসাবে তুলে ধরা। [কার, ১৯৮১: ৫৬; ম্যান্ডেবঅম, ১৯৭১: ৪১-৮, ৫৭-৮; টম্পসন, ১৯৭৮: ১২১]।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই দুটো ধারণার ভেতর বিকশিত বিতর্কে বিশেষ গুরুত্বে ঘাটতি ছিল। উভয় পক্ষই যুক্তির এক দিককে গুরুত্বের সাথে নিয়ে আরেক দিক উপেক্ষা করেছে। বিতর্কের প্রকৃতি ছিল আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক নয়। উভয় পক্ষই সমস্যাকে এড়িয়ে গেছে। যুক্তির কোন অংশ বেশি গ্রহণযোগ্য সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, বরং পরস্পরের সাথে খাপ না-খাওয়া দুই ধরনের সত্যকে–সমাজের বস্তুগত প্রকৃতি এবং মানুষের চিন্তা ও স্বপ্রণোদিত আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতা–সমন্বিত করা।

উভয় পক্ষই বিতর্ককে মার্ক্সের পক্ষ-বিপক্ষের বলে বিশ্বাস করে আসছে, কিন্তু অ্যারিস্টটলের খুব কাছাকাছি মার্ক্সীয় ধারণা কোনও পক্ষেই যায় না। মার্ক্সের ধারণা অ্যারিস্টটলের ধারণার চেয়ে ভালোভাবে ফল দিয়েছে। তবে অ্যারিস্টটলের ধারণা আর সেগুলোর মাঝে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক অনেকটা মার্ক্স প্রণীত সূত্রের মতোই ।

অ্যারিস্টটলের *পলিটিক্স* মানবীয় সামাজিক অস্তিত্বের প্রকৃতি ও আকার বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস। প্রথম খণ্ডে তিনি এই বিশ্লেষণে ব্যবহৃত সাধারণ নীতিমালা তুলে ধরেছেন। এই নীতিমালার ধারাক্রম এই রকম: সমাজ একটি স্বাভাবিক বিকাশ, প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট কিছু; মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক জীব; সমাজ স্বাভাবিক মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম কোনও সৃষ্টি নয়, বরং খোদ মানবীয় প্রকৃতিরই প্রতিবিম্ব। সমাজ মানুষের অস্তিত্বের স্বাভাবিক আকার। সামাজিক জীবন যাপন যূথবদ্ধ প্রাণীদের ভেতর কেবল মানুষেরই বিশেষ ক্ষমতা। বিশেষত মানবীয় ক্ষমতা কেবল সমাজের বিকাশ এবং বিশেষ করে *পলিতিকন বায়ো*-র [রাজনৈতিক জীবন] বিকাশের ভেতর দিয়েই অর্জন করা যেতে পারে; যেখানে নাগরিকরা প্রকৃতই তাদের সাম্প্রদায়িক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে থাকে। *ইউদাইমোনিয়ো, প্রোএয়াসিস ও থিওরিয়া*-র মতো মানবীয় লক্ষ্য ও ক্ষমতা এটা ছাড়া সম্ভব নয়; এগুলো তারই অধীন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জীবন ধারণ করতে পারে সে হয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা সন্ন্যাসী, মানুষ নয়। অন্যান্য প্রাকৃতিক সত্তার মতো সমাজের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য ক্ষতি এড়ানো বা বাণিজ্য বৃদ্ধি নয়, বরং উন্নত জীবনের অংশ নেওয়া।

মার্ক্সের সবচেয়ে মৌলিক অবস্থানের চিত্র হিসাবেও এটা পুরোপুরি কাজ দেবে। মহান সুপ্ত ক্ষমতার ধারণায়ন এটা এবং অ্যারিস্টটলের কালের মহত্তম চিন্তাবিদ একে প্রয়োগ করার মতো যেকোনও অবস্থানে ছিলেন। তারা কেউই বিশেষ করে মানুষের চিন্তা ও নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সমাজের প্রকৃতি ও বিকাশলাভের ভেতর কোনও সমন্বয়ের অতীত দূরত্ব লক্ষ করেননি। তাঁরা সমস্যাকে এড়িয়ে যাননি, বরং তাঁদের তত্ত্বে এই সমস্যাই দেখা দেয়নি। অ্যারিস্টটল এবং মার্ক্স কার্যত সমাজকে বস্তু হিসাবে দেখেছেন। সমস্যাটি বিবেচনার ক্ষেত্রে বস্তু হওয়ার সাথে

এর পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই সমাজকে বস্তুর অসংখ্য গুণাবলীসমৃদ্ধ সামগ্রিক সত্তা হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তাদের কেউই একে কঠোরভাবে বস্তু বিবেচনা করেননি। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল সামাজিক বাস্তবতা কেবল একটি বস্তু–মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। মানুষ ও সমাজ মূলত এক। মানুষের সামাজিক হওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, সমাজ সেই ক্ষমতারই সাধারণ বিকাশমাত্র। সমাজ স্বাভাবিক বলার মানে এই নয় যে সামাজিক উন্নয়ন এমন কিছু যা মানুষের অজান্তেই ঘটে যায়। এটা ঘটার কারণ তাদের ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত [এভারসন, ১৯৮৮, xv-xxvii]।

অ্যারিস্টটলের মতো মার্ক্সও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দুটি মৌল প্রকৃতিকে স্বীকার করেছেন: সমাজ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি [ক্লার্ক, ১৯৭৫: ১৪-২৭; ৯৩-১১৩; উড, ১৯৮১: ১৬-৪৩]। সামাজিক উন্নয়নের ভেতর দিয়ে বাস্তবায়িত সামাজিক বিকাশের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন মানুষ হওয়ার কারণে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষের চিন্তা ও মেধার প্রয়োগের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়ে থাকে। আকাঙ্ক্ষা ও মেধা সমাজবিকাশের চালিকাশক্তি ও উপায়।

মার্ক্স সাধারণভাবে সামাজিক উন্নয়নের এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অর্থের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি এর একটি নজীর তুলে ধরেছেন [মার্ক্স, ১৯৭৭: ১২৫-৬৩, ১৭৮-২০৯; মাইকেল, ১৯৭৯: ৬১-৪]। বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তুসমষ্টির পর্যাপ্ত উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রম ভাগ করে নিয়েছিল। এতে করে তারা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে সেই পণ্যটি উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এই উদ্বৃত্তটুকু বিনিময়ের ভেতর দিয়ে ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল ছিল। তবে বিনিময় ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। একজন কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত পণ্য না-ও পেতে পারত। ফলে এই ব্যবস্থায় বিকল্পসমূহ সন্তোষজনক ছিল না।

মানুষের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা থেকেই সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছিল; এইসব সমস্যা সমাধানে তাদের নেওয়া পদক্ষেপগুলো ছিল একই সময়ে সেই বিনিময় মূল্য ব্যবস্থারই আরও উন্নত বিকাশ। বিনিময়ের ব্যাপারটিকে ভিন্ন ভিন্ন কেনা-বেচায় পরিণত করার প্রয়োজন ছিল তাদের, যাতে লোকে তাদের সুবিধামতো কোনও একটি পণ্য কিনতে বা বিক্রি করতে পারে। আবার অপচনশীল উপায়ে পণ্যের মূল্য ধরে রাখার একটা কৌশলেরও প্রয়োজন ছিল তাদের। সোনা বা রূপার মতো কোনও অপচনশীল পণ্যকে বেছে নিলে তাদের এই দুই উদ্দেশ্যই পূরণ হতে পারত। মেধাই তাদের প্রথমে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল, আবার সেই মেধাই তাদের এ থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেছে। বিনিময়ের একটি মাধ্যম টাকা উদ্ভাবন করেছে তারা। এটা আবার বিনিময় মূল্যের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রধান উন্নয়ন ছিল: অর্থের রূপ, পণ্যকে তাদের নিজস্ব ভৌত রূপে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্য করার উপায় [আর্থার, ১৯৭৯]। মার্ক্সের *ক্যাপিটাল* মূল্যের বিকাশ–এর পরম রূপ পুঁজি পর্যন্ত–ও খোদ পুঁজির বিকাশ ও আচরণ প্রক্রিয়া-সংক্রান্তব্যাখ্যাসহ একটি তত্ত্ব তুলে ধরে [মার্ক্স, ১৯৭৭: ২৪৭-৮০]। মানুষ কী সৃষ্টি করেছে তার প্রকৃতি শনাক্তকরণ ও এর বিকাশের ধরন উপলব্ধির ভেতর দিয়ে আমরা তার অর্জনকে বুঝতে পারি [উড, ১৯৮১: ৬৩-৮১, ১০১-১০]। উদাহরণ থেকে এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে মার্ক্স অর্থকে অসাধারণ উপায় ধরে নিয়েছিলেন। তিনি এর ব্যবহারের সীমা আছে বলে মনে করেছেন। মানবীয় ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানোই সামাজিক উৎপাদন। এই উদাহরণে অর্থের উপযোগিতা, প্রয়োজন ও ক্ষমতার ভেতর এমনভাবে সমন্বয় আনার ভেতর নির্ভর করছে যা অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়। তবে তা প্রয়োজন ও ক্ষমতার ঐক্যের নিখুঁত নিশ্চয়তাদানকারী নয়; বরং, উল্টো, মূল্য উৎপাদন যখন পুঁজিবাদী ধরনে বিকশিত হয়, অর্থ তখন অর্থনৈতিক সংকটে জটিল ভূমিকা পালন করে, তাতে ক্ষমতা ও প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে [মার্ক্স, ১৯৭৭: ২৩৫-৬]।

ইতিপূর্বে আমি সমাজকে বস্তু হিসাবে বিবেচনা করার কারণগুলোর উল্লেখ করেছি। এখন সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণ বা সমাবেশের বিপরীতে কোনও কিছু বস্তু কিনা সেটা একটি অভিজ্ঞতাবাদী জিজ্ঞাসা। বস্তু কেমন আচরণ করছে সেটাই নীতিগতভাবে এই প্রশ্ন স্থির করে দেয়। আচরণ পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব বিধান আছে দেখা গেলে আমরা বলতে পারব যে তা বস্তু। অন্যদিকে কেবল এর উপাদানসমূহেরই আইন লক্ষ করা গেলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটি একটি সমাবেশ মাত্র ও এর ইতিহাস কিছু দুর্ঘটনার যোগফল মাত্র, কোনও বিকাশ নয়। ইতিহাস একটি দুর্ঘটনার অধ্যায় মাত্র, সাম্প্রতিককালে এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে একেবারেই ভিন্ন হলে, দুর্ঘটনা ও প্রয়োজনের মিশ্রণ না হয়ে থাকলে, সেটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। মার্ক্স এভাবেই এগুলোকে দেখেছেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। ঠিক যেমন দুর্ঘটনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে প্রমাণ রয়েছে। অনুসন্ধান সমাজ বস্তু নয়, এই উপসংহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে বটে, তবে সেটা অনুসন্ধানেরই ফল হতে হবে [ম্যান্দেলবঅম, ১৯৭১: ৪১-৮]।

ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজ

সমাজ কোনও বস্তু নয়,এই তত্ত্বটি খোদ পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে গড়ে উঠেছে। টমাস হবস এবং জন লকের মতো চিন্তাবিদদের মাঝে এর দেখা পাওয়া যায় [ম্যাকফারসন, ১৯৭৩: ারর, ২৫-৩১]। এই ঐতিহ্য আবার সমাজের অবস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করেছে। প্রাচীন আমল ও সামন্তবাদীকাল জুড়ে চিন্তাবিদগণ সমাজকে বস্তুগত পরিভাষায় দেখেছেন। সমাজের শাসক থেকে শুরু করে প্রজা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ আছে বলে মনে করা হত, এইসব অংশ মানুষের দেহ আর বিভিন্ন অঙ্গের মতো একসাথে মিলে একটি একক কার্যক্ষম সত্তা নির্মাণ করে বলে ধারণা করা হত।

পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে এই সবই বদলে যেতে শুরু করে। বিনিময় মূল্য প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে মুছে দেওয়ার ফলে আইনী অধীনতা হতে মুক্ত এবং পণ্যের মালিক হিসাবে সামাজিকভাবে সমান তালে প্রতিযোগিতা করার অধিকারী হয়ে ওঠায় সমাজকে কোনও জীবন্ত প্রাণীর সাথে তুলনা করার বিষয়টি আর তেমন মানানসই রইল না, সেই সঙ্গে এর সাথে সম্পর্কিত অধিবিদ্যাও গুরুত্ব হারাল।

আরেকটি তুলনা আরও বেশি জুতসই পরিগণিত হল। সেটি হচ্ছে সমাবেশের সাথে তুলনা। বালির স্তূপ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার সমাবেশ মাত্র, অনেক অংশ ও প্রবণতা বিশিষ্ট কোনও সামগ্রিক সত্তা নয়; তেমনি সমাজও অন্তর্গত সম্পর্কহীন কেবল বাহ্যিকভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির সমাবেশ মাত্র। সমাজের সত্তাকে সরিয়ে নেওয়া হলে বালির স্তূপের মতো এরও কোনও বিকাশ বা আকার থাকবে না। সমাজের চরিত্রকে জমায়েত হওয়া উপাদানসমূহের, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র দিয়ে স্থানান্তরিত করা হয় [ম্যাকফারসন, ১৯৬২: ১৭-৪৯]। মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে পণ্যমালিকের অধিকারবাহী বলা হয়ে থাকে এবং স্বভাবগতভাবেই পণ্যমালিকদের মতো আচরণ করে থাকে। আরামদায়ক জীবন যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধা লাভের জন্যে প্রতিযোগিতা করা, অন্যের ক্ষমতা দখল করার প্রয়াস পাওয়া, স্বার্থপর আচরণ করা, ইত্যাদি। এমন স্বভাবের প্রাণীদের নিজেদের ভেতর সংগ্রাম করার সম্ভাবনা অসীম, 'সামাজিক চুক্তির' মাধ্যমে এখানে একটি সীমা আরোপ করা হয়; এখানে প্রত্যেকে তার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার এড়িয়ে গিয়ে তাকে এই উদ্দেশে গঠিত একটি একক সত্তার উপর ন্যস্ত করে যার এই শক্তির উপর একচেটিয়া অধিকার থাকবে এবং শৃঙ্খলা ও চুক্তি বজায় রাখার কাজে তাকে ব্যবহার করবে। এটাই রাষ্ট্র। এভাবে সমাজকে বাদ দিয়ে এর বিভিন্ন উপাদানকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ধারণার মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক জীবনের এই অন্টোলজির ধারণা হবস প্রথম গড়ে তোলার পর থেকেই নানা রূপে বারবার বিভিন্ন ভাষ্যে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অ্যারিস্টটলীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যত কমই সমর্থনযোগ্য হোক, নৈতিকতার দিক থেকে যত অগ্রহণযোগ্য হোক, পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃত ক্ষমতা বণ্টন ও পুঁজিবাদের অধীনে মানুষের যে পরিণতি হয়েছে–জৈব সম্পর্কবিহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যাযাবরের জীবন–তাতে এটা অনেক বেশি মানানসই, এই বাস্তবতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। এমন এক সমাজে মানবীয় প্রকৃতি ও তাদের সামাজিক অস্তিত্বের লক্ষ্য বিনিময় মূল্যের অমানবীয় প্রকৃতির চাহিদার অধীন হওয়ায় অ্যারিস্টটলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন জীবন দারুণভাবে সমালোচনার শিকার হত। অ্যারিস্টটলীয় দার্শনিকরা সব সময় সামলোচনামুখর হতে চাননি, তাঁরা জোর দিয়ে এটা বলতে চাননি যে অ্যারিস্টটল সমাজকে বস্তু হিসাবে দেখেছেন, বরং তারা *মিশ্রণের* মতো শব্দ প্রয়োগ করতে চেয়েছেন যাতে একে আধুনিক তত্ত্বের সমাবেশ বলে মনে হয়।

মোটামুটি একই কায়দায় ও একই ধরনের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাঁরা মার্ক্সের ব্যাখ্যায় আবির্ভূত হয়েছেন যেখানে সমাজ সম্পর্কে তাঁর বস্তুগত ধারণাকে ছোট করে সামগ্রিকের ধারণা তাঁর উপর আরোপ করে (এলস্টার, ১৯৮৫: ৪-৮ ও অন্যত্র)। এই রচনা অধিবিদ্যার প্রশ্নে খুব একটা উচ্চকণ্ঠ নয়, তবে তেমন কিছু হলে তা বিশপ বার্কলি ও বার্নার্ড শ' ও ডব্লু. ভি. কুইনের মতো বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাবাদীদের রচনায় সমর্থন লাভ করত। বার্কলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বস্তুকে কতগুলো গুণাবলীর সমষ্টিতে টেনে আনা ও বস্তুর ধারণাকে বিসর্জন দেওয়া। রাসেল এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গেছেন।

বস্তুকে গুণের পক্ষে বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের, উদাহরণ স্বরূপ, দুটো জিনিস ক ও খ-কে একই গুণাবলীবিশিষ্ট বস্তু হিসাবে শনাক্তকারী বিবৃতির অর্থ বোঝার দিকে চালিত করেছে। যাতে ক ও খ-কে একই বস্তু বললে যাতে বোঝা যায় য়ে তারা একই গুণের অধিকারী। কিন্তু ক ও খ এক হলে, কেমন করে ক'র এমন কিছু থাকতে পারে যা খ'র নেই? তারা তো একই! ক ও খ একই জিনিস হলে তার মানে দাঁড়ায় তাদের উপাদানসমূহ সাধারণ [উইগিন্স, ১৯৮০: ৩-৪, ৪৯]। কিন্তু বস্তুর সমরূপতার ধারণাকে অভিজ্ঞতাবাদীরা মেনে নিতে অনীহ, যদি না একে তাদের পছন্দসই অন্টোলজি, যেমন, গুণে নামানো হয়। এই ধরনের বিবেচনা অ্যারিস্টটলীয় দার্শনিকদের বস্তুর ধারণা ছাড়াই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে লেগে থাকার ধারণার ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতাবাদীদের সাফল্যের ব্যাপারে কম সংশয়বাদী হতে উৎসাহিত করেনি। বিপরীতে তাঁরা বরং তাদের এই ধারণাকেই নিশ্চিত করতে চালিত হন যে পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে লেগে থাকা ধারণা এতটাই মৌলিক ও মানুষের ভাষায় প্রোথিত যে একে যৌক্তিকভাবে তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এমন কিছু নয় দর্শন যাকে আরও মৌলিক কিছু হিসাবে বিশ্লেষণ করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

সমাজের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, যেমনটা হয়তো আমি আভাস দিয়ে থাকতে পারি। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের তুলনায় বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী লেখকদের ভেতর প্রকাশ্য তুলনা টানার ব্যাপারটা বেশি লক্ষ করা যায়। সম্ভবত এই কারণেই সামগ্রিকতাবাদী লেখকদের মাঝে এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা মাত্র, কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নয়। ম্যাক্সওয়েবার [১৯৭৫, ৬৩] প্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আধুনিক আক্রমণের সূচনা করেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করেন বলে মনে হয়: প্রাণীসত্তা বস্তুর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীও আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনওটাকেই অন্য শ্রেণীর বস্তুর সাথে কোনও সাদৃশ্যের কারণে একই শ্রেণীর বস্তু হিসাবে ধরা হয় না। সমাজ ও প্রাণী সত্তার ভেতর 'জৈবিক তুলনা' তুলনা বটে, কিন্তু সমাজ একটি বস্তু, এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই তুলনা

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার সমাজের সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গিও বালির স্তূপের সাথে তুলনার উপর নির্ভরশীল নয়। তুলনা নয়, বরং অধিবিদ্যার পছন্দই দুটো দৃষ্টিভঙ্গিকে পৃথক করে।

পণ্য ও বিরোধ

মার্ক্স দুটি বাক্য দিয়ে *ক্যাপিটাল* শুরু করেছেন: 'পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে ক্রিয়াশীল সেই অর্থনীতিতে সমাজের সম্পদ "পণ্যের বিপুল সমাবেশ" হিসাবে প্রতিভাত হয়; পণ্যবিশেষ এর প্রাথমিক রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান পণ্যের বিশ্লেষণ থেকে শুরু হবে।'

শ্রমের উৎপন্নে যখন উপযোগ মূল্য থাকে তখন তাকে *পণ্য* নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর বিনিময় মূল্যও আছে। সুতরাং পণ্যকে বুঝতে হলে মূল্যের উভয় ধারণা সম্পর্কে জানতে হবে। উপযোগ মূল্য যথেষ্ট স্পষ্ট, কারণ একে উৎপন্নের প্রাকৃতিক গুণাবলি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু বিনিময় মূল্য তত সহজ নয়, এবং ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত পণ্যের প্রকৃতি স্পষ্ট হয় না। তবে একে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা জড়িত রয়েছে।

মার্ক্সের পুঁজিবাদের তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে পণ্য একটি বিরোধ ধারণ করে, এ দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্যের ভেতর বৈপরীত্য রয়েছে। ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুঁজিবাদের বিধিবদ্ধ আচরণ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের অধিকাংশই এ থেকে উদ্ভূত এবং এটাই মার্ক্সের তত্ত্বকে ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্ব থেকে আলাদা করেছে [মার্ক্স, ১৯৬৯: ৫০১; ১৯৭২: ১৩৭-৯]।

উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রকৃতি। উপযোগ মূল্য আবশ্যিকভাবে গুণবাচক ও বিনিময় মূল্য আবশ্যিকভাবে পরিমাণবাচক। সুতরাং পণ্য দুটো ভিন্ন প্রকৃতির বাহক। প্রশ্ন হচ্ছে পণ্য এদের সমন্বিতভাবে বহন করে কিনা। এই প্রকৃতিগুলো সংজ্ঞার দিক থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি ডেকে আনে না। তেমনি উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্যের ভেতরের পার্থক্যও তা করে না। যেসব চিন্তাবিদ এই বিশ্লেষণকে সংজ্ঞার ধারণায় ছেড়ে দিয়েছেন মার্ক্স তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন [কারভার, ১৯৭৫: ১৯৮-৯; ২০৫-৭]। বর্তমানেও এমনটা অব্যহত রয়েছে, এমনকি মার্ক্সের ভাষ্যকারদের হাতে পর্যন্ত [কারভার, ১৯৭৯: ৩৪৫-৪৮]। মার্ক্সের অভিযোগ হচ্ছে আমরা দুই ধরনের মূল্যকে চক বা পনিরের মতো অন্য কোনও ভিন্ন দুটি প্রকৃতির মতো একইভাবে দেখতে পারি না। চক এমন একটা আকার নয় যা পনির গ্রহণ করে থাকে। আবার চকও এমনভাবে তৈরি করা হয় না যে তা পনিরের আকার নেবে। এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ভিন্ন বস্তু। উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি, কিন্তু সেগুলো দুটো ভিন্ন বস্তুতে থাকে না, একই বস্তুতে সহাবস্থান করে। এগুলো একই প্রকৃতি বহনকারী দুটো ভিন্ন বস্তু, যা উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করে। তো পণ্য হচ্ছে 'হাইপোস্ট্যাটিক' ঐক্য।

এর গুরুত্বের দিকটি হল দুটি প্রকৃতির ভেতর কোনটার সন্ধান করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে থাকি। উপযোগ মূল্যের সন্ধান করলে তখন কী তৈরি হবে তার সিদ্ধান্ত আমাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থির হবে, তখন আমাদের ক্ষমতা সরাসরি সেই প্রয়োজনের নিরিখে ন্যস্ত হবে। তারা আর মানহীন তুচ্ছ পণ্য উৎপন্নের দিকে যাবে না।

তবে আমরা বিনিময় মূল্যের সন্ধানে থাকলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নেবে। এখানে ক্ষমতা কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হবে না, বরং ভিন্ন কিছু অর্জনের লক্ষ্যে চালিত হবে: সম্প্রসারণ মূল্য বা পুঁজির পুঞ্জীভবন। এই ভিন্ন উদ্দেশ্য স্থির করে দেয় আমাদের কোন ক্ষমতা উন্নত এবং সেগুলোকে নিয়োজিত করা হবে কিনা, এবং কোন প্রয়োজনগুলো মেটানো হবে, সেটা কতটা সন্তোষজনকভাবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল পরিচিত। কেবল অন্য একটি শর্ত পূরণ হলেই ক্ষমতা ও প্রয়োজন একত্রিত করা হয়: মূল্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। তা নাহলে উৎপাদন করা হবে না, ক্ষমতা ও প্রয়োজনকে বিচ্ছিন্ন করা হবে [মার্ক্স, ১৯৬৯: ৪৯২-৫১৫]।

ক্যাপিটাল-এর উপসংহার হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যতিক্রমহীন ধরনের আচরণ খোদ পণ্যের দ্বৈত প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। উপযোগ মূল্য ও এর সংস্থান এভাবে বিনিময় মূল্যও এ-জাতীয় উপাদানে আক্রান্ত হয়। উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্য কেবল সংজ্ঞার দিক থেকেই ভিন্ন নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও তারা বৈরী, কারণ পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যে কাজ করে এগুলো। দুই প্রকৃতির এই ভিন্নতাকে মার্ক্স বলেছেন *বিরোধ*। মার্ক্স মনে করেছেন তিনি খোদ পণ্যের ভেতরই এটি আবিষ্কার করেছেন; তাই একেই তিনি পুঁজিবাদের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উপযোগ মূল্য ও বিনিময় মূল্যকে গুণ বিবেচনা করলে সম্পর্কের প্রকৃতি বাদ পড়ে যাবে। অভিজ্ঞতাবাদী অধিবিদ্যায় যেমন মনে করা হয়। তাহলে আর কেউ সাধারণভাবে প্রাপ্ত দুটি গুণের ভেতর যেমন সম্পর্ক আবিষ্কার করে থাকে তার চেয়ে জটিল কোনও সম্পর্ক খুঁজতে যাবে না। এই কারণেই অনেক চিন্তাবিদ বিরোধের এই ধারণায় তেমন সারবত্তা না পেয়ে একে হেগেলীয় প্রতারণা বলে একপাশে ঠেলে দিয়েছেন বা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে মার্ক্স কেবল বিরোধের যৌক্তিক ধারণা ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতি ও মূল্য

মূল্য দিয়ে কেবল জীবনের বস্তুগত দিকই নয়, বরং আধ্যাত্মিক দিকও প্রভাবিত হয়। স্রেফ শ্রমের উৎপন্ন হিসাবে রূপ নেওয়ার পর বিনিময় মূল্য স্থির থাকে না। এটা এমন এক আকার যা মানুষ যা কিছু করে ও মূল্য দেয় তার প্রায় সবই রূপই গ্রহণ করতে পারে। সেটা যখন ঘটে, এর নিজস্ব বিচিত্র লক্ষ্য তাদের ওপর স্থানান্তরিত হয়। সমস্যা হচ্ছে, এইসব জিনিসের আগে থেকেই গন্তব্য বা লক্ষ্য রয়েছে। প্রতিটি কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যের নিরিখে নিজস্ব গন্তব্য থাকে। এর প্রায় সবগুলোই বিনিময় মূল্যের খাতিরে সন্ধান করা যেতে পারে। প্রতিটির উপর এই প্রকৃতি আরোপ করা যায়, সবগুলোই 'ব্যবসায়' পরিণত হতে পারে। বিনিময় মূল্য যখন কোনও ক্রিয়া শুরু করে তখন তা প্রকৃত লক্ষ্যকে নিজস্ব লক্ষ্যের উপায়ে পরিণত করে। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু হওয়ায় ক্রিয়াকে পরিবর্তিত করে এর প্রকৃত গন্তব্যকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। তো বিনিময় মূল্য চিন্তা মূল্য ও নৈতিকতায় প্রবেশ করে। এই সর্বজনীন প্রকৃতির কাছে সব প্রকৃতি গৌণ হয়ে আসে যেন। মার্ক্স যাকে বলেছেন পণ্য সংস্কার (commodity fetishism) [মার্ক্স, ১৯৭৭: ১৮৩-৭৭]। সকল ক্ষমতা একটি মাত্র সাধারণ ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োগে পরিণত হয়: উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা। প্রকৃত প্রকৃতিসমূহকে অবহেলা করা হয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বা প্রতিস্থাপিত হয়। খোদ *জীবনই* বিনিময় মূল্যের একটি উপায়ে পরিণত হয়, বিশেষ করে যারা মজুরির বিনিময়ে কাজ করে থাকে, যদিও বিনিময় মূল্যের সমর্থকরা একে বেঁচে থাকার সেরা উপায় বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এরচেয়ে অস্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না।

এটা পরিহাসের বিষয় যে মার্ক্সের চিন্তাভাবনাকে চরিত্রগতভাবে বেন্থেমীয় 'প্রগতিশীল' সাম্যবাদী চিন্তার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ মার্ক্স মানবীয় বলয়কে বিনিময় মূল্যের বলয় থেকে উদ্ধার করে আনতে চেয়েছিলেন, এই সংস্কারকরা সেই বলয়ে প্রবেশকে নিখুঁত করার প্রয়াস পান এবং অনেক সময় তা করেন মার্ক্সেরই নামে।

এটা এখন পরিষ্কার যে মূল্যের তত্ত্বকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত না ভেবে অর্থনীতির বিষয় ভাবা কতখানি ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। তবে মার্ক্সের তত্ত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করার চেয়েও আরও কিছু রয়েছে এখানে। দর্শনের একটি অন্যতম কর্ম সম্পাদনের আমাদের ক্ষমতাও হুমকির মুখে। দর্শন বরাবরের মতো জগৎ ও এখানে আমাদের অবস্থানের অর্থ খুঁজে বের করার বিষয়। এর মূল শাখাসমূহ সব সময়ই আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব উপলব্ধির প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। দর্শনের আদিকালেই অ্যারিটস্টল ও প্লেটো সুবিদিত রচনা নিবেদন করেছেন। আমরা যদি তাঁদের মতো সফলভাবে আমাদের কাজ শেষ করতে চাই, তবে পার্থক্যটুকু বুঝতে হবে। পার্থক্যটা হচ্ছে, আমাদের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে যেটা তাঁদের ছিল না। আমাদের সামাজিক বিশ্ব স্বাধীন বাজারের এক বিশাল সমাবেশ, যেটা তাঁদের ছিল না। তাঁদের জগৎ ছিল উপযোগ মূল্যের, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে 'প্রকৃতির খোলা গ্রন্থের সাথে' কাজ করেছেন। আমাদের জগৎ পণ্যের বিনিময় মূল্যের, আমরা পরোক্ষভাবে বাজারের মাধ্যমে প্রকৃত প্রকৃতির বলয়ে কাজ করি। বাজার ব্যবস্থা বা বিনিময় মূল্য ব্যবস্থার নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে, আমাদের যার সাথে তাল মেলাতে হয়। সূত্র ও চক্রে এর প্রকৃতি প্রকাশিত যাকে ভৌত প্রকৃতির মতো গবেষণার প্রয়োজন হয়। পার্থক্যটা বিশাল এবং দর্শনীয়; উদাহরণস্বরূপ, আমরা যাকে অর্থনীতি বলি প্রাচীন বিশ্ব তার সাথে তুলনীয় চিন্তার এমন কোনও সংগ্রহ নির্মাণ করতে পারেনি [ফিনলি, ১৯৮৫: ২০-৩; মাইকেল, ১৯৭৯: ৬৬-৭১]। বিনিময় মূল্যকে নিশ্চিত ধরে নিলে আমরা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে তেমন একটা সুবিধা করতে পারব না; কিন্তু মূল্যের তত্ত্বকে অর্থনীতির 'নীরস বিজ্ঞানে' ঠেলে দিয়ে একে আমাদের কোনও বিষয় নয় ভাবলে ঠিক সে কাজটাই করা হবে। সেকারণেই আমাদের যুগে সামাজিক দর্শনের ক্ষেত্রে মূল্যের তত্ত্ব জটিলতম সমস্যা।

[কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ]

[বি. দ্র. 'হালখাতা'র সম্পাদক ও উপরিউক্ত অনুবাদকের নাম হুবহু এক কিন্তু এরা আলাদা ব্যক্তি]

মহাভারতের ঐতিহাসিক সত্য ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা

জ য় ন্তা নু জ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

রামায়ণের মতো মহাভারতেও বাস্তবতা অর্থে সত্যের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়নি। পরাশর মুনির কবলে পড়ে ব্যাসের জন্ম দিয়ে সত্যবতীর আবার কুমারীত্ব লাভ, ব্রহ্মার সংগে ব্যাসের কথোপকথন, হাতির মাথাওয়ালা গনেশের অবিশ্রান্ত শ্রুতিলিখন, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পঞ্চপাণ্ডবের অলৌকিক জন্ম, দ্রোণ ও কর্ণের অসম্ভব জন্ম, কৃষ্ণের অলৌকিক সুদর্শন চক্র, কৃষ্ণ কর্তৃক বারবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং অন্যান্য মায়া ও কুহক সৃষ্টি, বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্রের আসাযাওয়া, দেবদেবীদের অবিরত গমনাগমন ও পুষ্পবৃষ্টি, সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি, অর্জুনের ইন্দ্রলোক অভিযান, একেকজন বড় যোদ্ধা দ্বারা বহু সহস্র সৈন্য নিধন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত সমস্ত ক্ষত্রিয়দের গঙ্গা থেকে উঠে এসে নিজ পত্নীদের সংগে বনের মধ্যে সুখে রাত্রিবাস, নাগকন্যা উলুপীর জলের তলায় পাতালে পিত্রালয়ে আসাযাওয়া, ব্রহ্মার রথে চড়ে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গরোহণ প্রভৃতি অসংখ্য অবাস্তব এবং অসম্ভব, অতএব অসত্য, ঘটনায় পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে এরকম অসংখ্য উপাখ্যান ও ঘটনাকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন মহাকাব্যে কল্পনাকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দিয়ে সত্যনিষ্ঠার সাহিত্যিক ভিত্তি নির্মাণ ছিল স্বভাবতই দুরূহ। অতএব সত্যনিষ্ঠ হিশেবে চিহ্নিত চরিত্রগুলোর মধ্যেই মহাভারতে সত্যের স্বরূপ সন্ধান করতে হবে।

কর্ণপর্বে মহাভারত কাহিনীর নায়ক এবং বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি মিথ্যে কথা বলা সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত। কৃষ্ণ বলেছেন: "সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।... কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"[১] তারপর কৃষ্ণ বলাক নামক ব্যাধ কিভাবে বহু প্রাণী হত্যাকারী এক অন্ধ শ্বাপদকে বধ করে সেই পুণ্যফলে দেবতাদের প্রেরিত বিমানে স্বর্গে গিয়েছিলেন, সে কাহিনী বললেন। আর এই উপাখ্যানও বললেন যে কৌশিক নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ দস্যুভয়ে বনে প্রবিষ্ট লোকেদের সন্ধান দস্যুদের বলে দিয়ে এই সত্যকথনের ফলে ঘোর নরকে পতিত হয়েছিলেন। ধর্মের সংগে সত্যের সম্পর্ক আরও ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ বললেন: "অনেকে শ্রুতিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা প্রাণীদিগের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলে উহা দোষাবহ হয় না। ধর্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম নির্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যরূপ হয়। ...ধর্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃতনিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"[২] সত্যাসত্য সম্বন্ধে একই তত্ত্ব শান্তি পর্বে ভীষ্ম এবং ভৃগুর মুখেও আরোপ করা হয়েছে।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে কৃষ্ণের এই সত্যাসত্য ব্যাখ্যাকে পাশ্চাত্য হিতবাদী দর্শনের সাহয্যে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। বহুর স্বার্থে একের কিংবা সংখ্যাল্পের বিনাশ ধর্মসম্মত, অতএব সে উদ্দেশ্যে মিথ্যা প্রয়োগও সত্যেরই সমতুল, এই ছিল বঙ্কিমী যুক্তির সারমর্ম।[৪] পাশ্চাত্য হিতবাদের বিভিন্ন গুরুতর ত্রুটি নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনেও নেই, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং হিতবাদী যুক্তি প্রয়োগ করেননি। কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় যে সব উদাহরণ দেয়া হয়েছে তার বেশির ভাগই শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের পরিপূরক এবং বহুজনের পক্ষে ক্ষতিকর। বিবাহের সময় মিথ্যাভাষণ মানবিক মূল্যবোধে গুরুতর অপরাধ এবং এর দ্বারা স্বার্থপ্রণোদিত নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও স্ত্রীর এবং অন্যান্য বহু লোকের সর্বনাশ হবার আশংকা। রতি সম্ভোগের উদ্দেশ্যে মিথ্যাভাষণের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। নিজের প্রাণসংশয় অথবা সর্বনাশ উপস্থিত হলে মিথ্যা বলা উচিত কিনা তা নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু এ মিথ্যাও বহুজনের হিতের জন্যে নয়, নিজ স্বার্থরক্ষার জন্যেই। ব্রাহ্মণের উপকারের জন্যে মিথ্যাকথনের পক্ষে তো কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। আর অহিংসাই যদি সত্যধর্মের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না করে পাণ্ডবেরা নিজ দাবি পরিত্যাগ করে কোনো উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেই পারতেন। অথবা প্রত্যেক ভাই একেকটি গ্রামের মানুষকে শোষণ না করে যদি তাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ নিতান্তই অসম্ভব ছিল, তবে তাঁরা অহিংস পন্থায় প্রায়োপবেশনে দাবি আদায়ের চেষ্টা করতে পারতেন। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে মহাত্মা গান্ধী সত্যাসত্যের কৃষ্ণব্যাখ্যার

সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কোনো অবস্থাতেই মিথ্যাভাষণ অকর্তব্য, এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। কৌশিকের উপাখ্যান নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যে এরকম অবস্থায় অসত্য কথা না বলে সত্য বলতে অস্বীকার করা এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করাই বিধেয়।[৫] প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের মুখে সত্যের এরকম সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা আরোপ করে অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সমর্থিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকেই সত্যনিষ্ঠ এবং চিরন্তন বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। অহিংসার প্রচলন অথবা সমস্ত জ্ঞাতিনিধন রোধে অসত্যের ব্যবহারের তত্ত্ব মহাভারত ও গীতায় প্রতিফলিত হয়নি। অর্জুনকে সমস্ত জ্ঞাতিনিধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই কৃষ্ণের গীতা প্রবচনের মূল লক্ষ্য। আর ভয়ংকর হিংস্র মহাযুদ্ধে সামূহিক বিনাশে সাহায্য করতে কৃষ্ণ নিজে অসংখ্য মিথ্যা এবং ছলনা প্রয়োগ করেছিলেন।

দুই

মহাভারতের আদিপর্ব থেকেই একটার পর একটা ছলনা এবং মিথ্যা মানবিক মূল্যবোধকে আঘাত দেয়। দ্রোণাচার্য প্রকৃতপক্ষে একলব্যের গুরু ছিলেন না। তিনি একলব্যকে জাতের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তথাপি ধনুর্ধর হিশেবে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি গুরুদক্ষিণার ছলে একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাবি করলেন। বিদ্যার্থী কিশোরের প্রতি এর চেয়ে মিথ্যা, ছলনাময় এবং নৃশংস ব্যবহার কল্পনা করা কঠিন। তারপর জতুগৃহদাহের সময় ঘটল পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা সংঘটিত আরেক বিরাট ছলনা এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ড। এক দরিদ্র নিষাদ জননী এবং তাঁর পঞ্চপুত্রকে নিমন্ত্রণ করে পাণ্ডবেরা তাঁদের সব উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তারপর তাঁদের জতুগৃহের ভেতরে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাণ্ডবেরা সুরঙ্গপথে পালিয়ে গেলেন, যাতে অস্থি দেখে দুর্যোধন সহ সকলে মনে করে যে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। নিষাদ জননী ও তাঁর পঞ্চপুত্রের প্রতি পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ মিথ্যা, তাঁদের পানভোজন ও আপ্যায়ন মিথ্যা। তাঁদের বীভৎস মৃত্যু পাণ্ডবদের দ্বারা নিজ স্বার্থে সরলপ্রাণ দরিদ্র মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা মাত্র। জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবেরা পালিয়ে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ভীম কর্তৃক বকরাক্ষস বধ প্রসংগে স্বয়ং কুন্তী একটা মিথ্যে কথা বলেন। যদিও কুন্তী জানতেন যে ভীম যুদ্ধ করেই বকাসুরকে বধ করবেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণকে এই মিথ্যে কথা বললেন যে তাঁর পুত্র মন্ত্রসিদ্ধ, সে মন্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেন সেকথা কাউকে না বলেন, কারণ তাহলে লোকেরা ভীমের কাছে মন্ত্র শিখতে আসবে। তারপর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডবেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন এবং সে পরিচয়েই অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন। লক্ষ্যভেদের পর কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও অর্জুন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন। আর ব্রহ্মতেজ অজেয় এই কথা মনে করেই কর্ণ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন। পরে দ্রৌপদীর সংগে যুধিষ্ঠিরের সহবাসকালে ঘরে ঢুকে পড়ে অর্জুন পূর্বশর্ত পালনের জন্য বারো বৎসর বনবাসের প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু বনবাস বিশেষ করলেন না। প্রথমে গঙ্গাদ্বারে গিয়ে নাগকন্যা উলুপীকে, তারপর মণিপুরে গিয়ে রাজকন্যা চিত্রাংগদাকে বিবাহ করেলেন। তিন বৎসর চিত্রাংগদার সংগে মণিপুরের রাজপ্রাসাদে বাস করবার পর দ্বারকায় গিয়ে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করলেন এবং এক বৎসর তার সংগে দ্বারকায় থাকলেন। তারপর 'বনবাসের' শেষ অংশ পুষ্করতীর্থে কাটালেন।

সভাপর্বের দুটি উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যথাক্রমে কৃষ্ণের প্ররোচনায় এবং কৌশলে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধবধ আর স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ। কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পেছনের দরজা দিয়ে জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং তারপর নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। জরাসন্ধ তাঁদের এই ছলনার নিন্দা করলেও ভীমের সংগে মল্লযুদ্ধে সম্মত হন এবং চৌদ্দদিন ধরে যুদ্ধ চলাকালে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনকে নিরাপদে অতিথি হিশেবে নিজ প্রাসাদে রাখেন। ক্ষত্রিয়রীতিতে ক্লান্ত এবং যুদ্ধবিমুখ যোদ্ধাকে বধ না করে সময় দেবার প্রথা ছিল। কিন্তু এরকম অবস্থাতেই কৃষ্ণের কুটিল ইংগিতে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেন। তারপর বন্দি রাজাদের মুক্ত করে কৃষ্ণ তাঁদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যথাশক্তি সাহায্য করবেন। তখন জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করে তাঁর শরণাপন্ন হলে কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। যখন ফিরে আসবার প্রস্তুতি চলছে তখন আরেকবার "এদিকে শ্রীমান পুরুষোত্তম ভূরিভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন।"[৬]

মহাভারতে কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, জরাসন্ধ তখন সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা, অতএব তিনি জীবিত থাকতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ক্ষত্রিয়রীতি অনুসারে উচিত ছিল সম্মুখযুদ্ধে যুধিষ্ঠির কর্তৃক জরাসন্ধের পরাজয়, ছলনার মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা নয়। দ্বিতীয় যুক্তি, জরাসন্ধ ছিয়াশি জন পরাজিত রাজাকে বন্দি করে রেখেছেন, আর চৌদ্দজন হলেই সবাইকে মহাদেবের উদ্দেশ্যে বলি দিতেন। কিন্তু জরাসন্ধকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি রাজাদের মুক্তি দিলেই প্রচলিত ক্ষাত্ররীতি রক্ষিত হত। মানবিক মূল্যবোধে এই যুক্তিকে হয়তো-বা কিছুটা সমর্থন করা যেত, যদি না কৃষ্ণের তৃতীয় যুক্তিতে জরাসন্ধ বধের প্রধান ও স্বার্থান্ধ কারণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। কৃষ্ণ বললেন যে জরাসন্ধের কাছে বারবার পরাজিত হয়ে তিনি এবং তাঁর জ্ঞাতিরা মথুরা থেকে পলায়ন করে দুর্ভেদ্য রৈবতক পর্বতের আড়ালে কুশস্থলী নগরীতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সর্বদা মথুরায় ফিরে আসবায় উপায় চিন্তা করছেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর জ্ঞাতিরা জানেন যে তিনশত বৎসর যুদ্ধ করেও তাঁরা জরাসন্ধকে পরাজিত

করতে পারবেন না। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে উপলক্ষ করে এবং ভীম ও অর্জুনের সহায়তায় মিথ্যা ও ছলনার সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। তাঁর এই অপকৌশলও ব্যর্থ হত যদি জরাসন্ধ এই ছলনার উত্তরে প্রাসাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধে সম্মত না হয়ে নিজ সৈন্যদের দ্বারা তিন অনুপ্রবেশকারীকে বধ করতেন। আর নিহত পিতার পুত্রের কাছ থেকে ধনরত্ন কেড়ে নেবার বৈষ্ণব যুক্তি কী থাকতে পারে? প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণ প্রধানত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই ছলনা দ্বারা ভীমের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করলেন।

শিশুপাল বধে কৃষ্ণের ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ আরও প্রকট। যুধিষ্ঠির সম্ভবত এই কারণে কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন যে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করে তাঁকে সম্রাট হতে সাহায্য করেছেন, আর তাই রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথি হিশেবে অর্ঘ্যদান করেছিলেন। শিশুপালের একমাত্র দোষ যে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দ্রুপদ, দ্রোণ, ব্যাসদেব, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য, কর্ণ ইত্যাদি যেখানে উপস্থিত, সেখানে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিশেবে যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্ঘ্য দানের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। শিশুপাল একথাও বলেন যে কৃষ্ণ যেহেতু রাজাও নন, ব্রাহ্মণও নন, তাই অর্ঘ্য পাবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। বিশেষত যে 'দুরাত্মা' কৃষ্ণ অন্যায় উপায়ে জরাসন্ধকে বধ করেছেন, তাঁকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মাত্মা পরিচয়ই নষ্ট হল। উপস্থিত রাজাদের মধ্যে অনেকেই শিশুপালকে সমর্থন করলেন। ফলে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হল। তখন কৃষ্ণ শিশুপালের অনেক কুকীর্তির কথা বললেন, যার মধ্যে এ-ও ছিল যে রুক্মিনীর সংগে তাঁর বিবাহের পূর্বে শিশুপাল রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তারপর কৃষ্ণ খাণ্ডবদাহের সময় বরুণের কাছে থেকে পাওয়া সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের শিরচ্ছেদ করলেন। প্রকৃতপক্ষে শিশুপাল কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব চ্যালেঞ্জ করবার ফলে এবং তাঁর সংগে কৃষ্ণের পূর্বশত্রুতা বশতই কৃষ্ণ তাঁকে বধ করলেন। জরাসন্ধ বধের বেলা বন্দি রাজাদের কথা স্মরণ করে হয়তো-বা বহুজনের হিতকে আংশিক যুক্তি হিশেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শিশুপাল বধের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তিগত কারণে কোনো প্রতিপক্ষকে বধ করাই কি ভগবানের অবতারের সত্যনিষ্ঠা? পরবর্তীকালে দ্রোণপর্বে ঘোর যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিকে তিনি অর্জুনের হিতার্থে আগেই বধ করেছিলেন। এরা জীবিত থাকলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিতেন। আর এরা সমস্ত দেবসেনা এবং সমগ্র পৃথিবীকে পরাজিত করতে সমর্থ ছিলেন। এই যদি জরাসন্ধ আর শিশুপাল বধের প্রকৃত কারণ হয়, তবে কি এদের বধের সময় কৃষ্ণ জ্ঞাতসারেই অন্য অনেক মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করেছিলেন? আর পাণ্ডবদের হিতার্থে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কৃষ্ণ এরকম আরও নানা অজুহাত সৃষ্টি করে আগে থেকেই যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন এবং কর্ণকে তাঁর অলৌকিক সুদর্শন চক্র দিয়ে অথবা অন্য কোনো কৌশলে বধ করে ফেলতেন, তবে কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা ধ্বংসলীলার তো প্রয়োজনই হত না।

তিন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা অনেক মিথ্যা এবং ছলনার আশ্রয় নেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পেরে এবং তাঁর পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে সংগে নিয়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন এবং তাঁর মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছ থেকেই তাঁর বধের উপায় জেনে নিলেন। তিনি স্ত্রীলোক কিংবা পূর্বে স্ত্রীলোক ছিলেন এমন কারও সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না জেনে কৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে শিখণ্ডী স্বয়ং এবং আড়াল থেকে অর্জুন শরাঘাতে ভীষ্মকে জর্জরিত করেন এবং এভাবেই ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হন। দ্রোণকে পাণ্ডবেরা পরাজিত করতে ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ বললেন: "হে অর্জুন! ধনুর্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উঁহাকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক কৌশল করিয়া উঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা কর। নচেৎ আচার্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অশ্বত্থমা নিহত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোনো ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।"[৭] প্রথমে ভীম দ্রোণকে এই মিথ্যা কথা বললেন। কিন্তু দ্রোণ তাঁকে বিশ্বাস না করে সত্যবাদিতার জন্যে বিখ্যাত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন। যুধিষ্ঠির ইতস্তত করছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন: "আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে।"[৮] সকলেই জানেন, যুধিষ্ঠির তখন উচ্চকণ্ঠে 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই ঘোষণা করে পরে অস্ফুট স্বরে 'ইতি কুঞ্জরঃ' বললেন। এই মিথ্যে কথা বিশ্বাস করে পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ অপরাজেয় দ্রোণাচার্য অস্ত্র ত্যাগ করে যোগস্থ হলেন। আর সেই অবস্থায় পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করলেন এবং তাঁর মুণ্ড তুলে নিয়ে কৌরবদের সামনে নিক্ষেপ করলেন। যুদ্ধের নিয়মবন্ধনের সময় স্থির হয়েছিল যে অস্ত্রহীন কিংবা যুদ্ধে বিমুখ কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করা হবে না। কিন্তু দ্রোণবধে মিথ্যাভাষণ ছাড়াও এই নিয়ম ভঙ্গ করে সরাসরি মিথ্যাচরণ করা হল। প্ররোচক স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার, মিথ্যাভাষী স্বয়ং ধর্মপুত্র, আর মুণ্ডচ্ছেদকারী যজ্ঞোত্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন। জয়দ্রথের পরাক্রম সহ্য করতে পাণ্ডবেরা ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ মায়া দ্বারা তমসা সৃষ্টি করে সূর্যকে আচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী অস্ত্রবরণ করে জয়দ্রথ আকাশের দিকে তাকালেন। আর সেই অবসরে অর্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করলেন। তারপর কৃষ্ণ আবার মায়াবলে অন্ধকার সরিয়ে দিলেন। যুদ্ধের নিয়মবন্ধনে উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিলেন যে অপরের সংগে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে কোনো তৃতীয় পক্ষ অস্ত্রাঘাত করবে না। কিন্তু সাত্যকিকে পরাজিত করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদনে উদ্যত ভূরিশ্রবাকে অর্জুন আক্রমণ

করলেন এবং কৃষ্ণের উপদেশে ভূরিশ্রবার ডান হাত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা এই বলে অর্জুনকে তিরস্কার করলেন যে অপরের সংগে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে আক্রমণ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম বিরুদ্ধ একথা জেনেও তাঁর বাহুচ্ছেদন করে অর্জুন অত্যন্ত গর্হিত এবং নৃশংস কর্ম করলেন। "এক্ষণে ক্ষত্রিয়ধর্মের বিরুদ্ধাচরণপূর্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্যভাব নাই, এমন কোনো ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে অর্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয়। তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্যানুষ্ঠান করে। তুমি কিরূপে তাহাদিগের মতানুসারে কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও?"[৯] তারপর ভূরিশ্রবা অস্ত্রত্যাগ করে যোগস্থল হলেন, আর তখন সাত্যকি উঠে এসে আবার যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেই পাণ্ডবদের হিতার্থে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত অভেদ্য বর্ম এবং কুণ্ডল দান হিশেবে চেয়ে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় কর্ণের কমজোর বিকল্প বর্ম ভেঙে যাবার পর অর্জুন যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে বর্মহীন অবস্থায় তাঁকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেন। তারপর কর্ণ যখন নিরস্ত্র অবস্থায় রথ থেকে নেমে মাটিতে বসে যাওয়া রথের চাকা তুলবার চেষ্টা করছিলেন, তখন অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে আবার যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে শরাঘাতে তাঁকে বধ করলেন। তার আগেই অর্জুনবধের উদ্দেশ্যে যে ইন্দ্রদত্ত শক্তি অস্ত্র কর্ণ সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ ছলনার সাহায্যে ঘটোৎকচের উপর সেটি প্রয়োগ করতে কর্ণকে বাধ্য করেন।

কর্ণবধের আগের একটি ঘটনায় কৃষ্ণ কর্তৃক মিথ্যা এবং ছলনা সমর্থনের বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্জুন তখনও কর্ণকে বধ করতে পারেননি শুনে শিবিরে বিশ্রামরত যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বললেন যে অর্জুনের উচিত গাণ্ডীব ধনু অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া। এই শুনে অর্জুন খড়্গহস্তে যুধিষ্ঠিরের দিকে অগ্রসর হলেন। কৃষ্ণ কারণ জিজ্ঞেস করলে অর্জুন বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কেউ যদি তাঁকে গাণ্ডীব অন্যকে দিয়ে দিতে বলেন তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে বধ করবেন। কৃষ্ণ এই ব্যাখ্যা দিলেন যে গুরুজনকে 'তুমি' সম্বোধন করলেই তাঁকে হত্যা করবার সমান হয়। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সম্বোধন করে কিঞ্চিৎ নিন্দা করলেন। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এভাবে অপমান করবার অনুশোচনায় আত্মহত্যার শপথ দিলেন। তখন কৃষ্ণ আবার এই ব্যাখ্যা দিলেন যে আত্মপ্রশংসাই আত্মহত্যার সমান। অর্জুন তখন নিজের প্রশংসা করলেন। আর এভাবেই কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় তাঁর দুটি প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হল। কিন্তু কৃষ্ণ এ ধরনের সহজ বিকল্প বিধান অন্য ক্ষেত্রে দেননি। ভীম নিজ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে জীবিত দুঃশাসনের বক্ষভেদ করে বারবার তার উষ্ণ রক্ত পান করে বললেন: "মাতৃস্তন্য, ঘৃত, মধু, সুরা, সুবাসিত উৎকৃষ্ট জল, দধি, দুগ্ধ এবং উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোনিত তৎসর্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল।"[১০] সমকালীন মূলবোধ অনুযায়ীও এ ঘটনা এমন বীভৎস ছিল যে এই দৃশ্য দেখে ভীমকে 'রাক্ষস' মনে করে সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে আরম্ভ করল। এরকম একটা বীভৎস প্রতিজ্ঞা পালনের কোনো সহজ বিকল্প কৃষ্ণ দিলেন না কেন? ভীম এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন: "বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায়যুদ্ধে কদাচ দুর্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্যোধন বিনষ্ট হইবে।... যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সংকটে নিপতিত হইবেন।... অতএব যদি বৃকোদর উহাকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জিত রাজ্যলাভ করিয়া ভূপতি হইবে।"[১১] সকলেই জানেন, তারপর অর্জুনের ইংগিতে ভীম অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। মনে হয় ভীম প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ শুধু যে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন তাই নয়, অন্য কোনো বিকল্প পন্থা না বলে সরাসরি অন্যায় যুদ্ধে উৎসাহ দিলেন।

মৃত্যুশয্যায় শয়ান দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভীষ্মবধ, দ্রোণবধ, কর্ণবধ, ভূরিশ্রবাবধ এবং কৃষ্ণের নির্দেশে তাঁর নিজের উরুভঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ করে বললেন: "হে কংসদাসতনয়! ... তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। ...অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভ সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই স্বধর্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।"[১২] কৃষ্ণ এসব অভিযোগ স্বীকার করে পাণ্ডবদের বললেন যে কৌরব বীরগণ অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন এবং পাণ্ডবেরা কখনো তাঁদের ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত করতে পারতেন না। "আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না।"[১৩] ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনবধে ক্রুদ্ধ বলরামকে কৃষ্ণ বুঝিয়ে বললেন যে এসব কাজ তিনি শুধু পাণ্ডবদের স্বার্থেই করেননি, মূলত তার ও বলরামের নিজ বৃষ্ণি বংশের (যাদবদের শাখাবিশেষ) স্বার্থেই করেছেন। শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার নিজ উন্নতির উদ্ধৃতি নিয়ে কৃষ্ণ বললেন যে মিত্রের উন্নতিতে নিজের উন্নতি, আর মিত্রের অবনতিতে নিজেরও অবনতি। পাণ্ডবেরা বৃষ্ণিদের আত্মীয় এবং সহজমিত্র। অতএব পাণ্ডবদের উন্নতিতেই বৃষ্ণিদের উন্নতি। আর এই উদ্দেশ্যে বৃষ্ণিবংশীয় হিশেবে তাঁর পক্ষে কপট নীতি প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত।[১৪] কৃষ্ণের ভাষা ও বক্তব্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সংগে হুবহু মিলে যায়। এই মিথ্যাচারী স্বার্থান্বেষী কপট কৃষ্ণই নাকি ঈশ্বরের অবতার।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও পাণ্ডবেরা আরেকটা গুরুতর অন্যায় করলেন। অর্ধেক রাজত্বের উপর তাঁদের প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সংগত কোনো দাবি ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যে তাঁরা অর্ধেক রাজ্য পেয়েছিলেন। এবং এই অর্ধেকের দাবি নিয়েই তাঁরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুদ্ধের পরেও ধৃতরাষ্ট্র জীবিত এবং তিনিই হস্তিনাপুরের রাজা। কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে কৃষ্ণের পরামর্শ যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুর সহ পুরো রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। এমনকি পুত্রদের শ্রাদ্ধ করবার জন্যে কপর্দকহীন ধৃতরাষ্ট্রকে যুধিষ্ঠিরের কাছে অর্থভিক্ষা করতে হল। আর কৃষ্ণের উপদেশ পাবার পরই যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ অর্থ ধৃতরাষ্ট্রকে দিলেন। সহায়সম্বলহীন অন্ধ বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র অগত্যা গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়কে নিয়ে বনে চলে গেলেন। তারপর সেখানে আগুনে পুড়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী মারা গেলেন। এভাবেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা ন্যায় ও সত্যের জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন।

প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মনুস্মৃতিতে নির্দেশিত ক্ষত্রিয়দের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ও পরে মূল ক্ষত্রিয় কাহিনীতে প্রতিফলিত। এর মধ্যে সত্যাদর্শের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া কঠিন। সত্যহীন, ন্যায়হীন, কুটিল রাজনীতির কৌশলই অর্থশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে এবং মহাভারতে প্রতিফলিত। কৃষ্ণ মহাভারতের এ ধরনের রাজনীতির আদর্শ প্রতীকী চরিত্র। পরবর্তীকালে মহাভারতের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে পাণ্ডবদের সত্যাদর্শের প্রতিভূ এবং কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে প্রচারের চেষ্টা মূল ক্ষত্রিয় কাহিনীকে মুছে দিতে পারেনি। কারণ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের আগেই মূল কাহিনী বহুল প্রচারিত এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল।

চার

মূল ক্ষত্রিয় কাহিনীর চারিদিকে মহাভারতে সমকালীন সামাজিক কাঠামোর যে বিন্যাস ফুটে উঠেছে তা প্রধানত মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সেখানে ক্ষত্রিয়ের নির্বিরোধ এবং ন্যায়নীতিহীন সার্বভৌমত্বের সংগে সংগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে শূদ্রের দাসত্ব এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর পরাধীনতার চিত্র পরিস্ফুট। আদিপর্বের এক জায়গায় গন্ধর্বরাজ পাণ্ডবদের আক্রমণ করে বললেন যে পাণ্ডবেরা একজন ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করে চলেন না বলেই তিনি তাঁদের আক্রমণ করলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্য ছাড়া শুধু বীরত্বে রাজ্যজয় করা যায় না, আর ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রাখলে চিরকাল রাজত্ব করা যায়। রাজসূয় যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণেরা আসামাত্র যুধিষ্ঠির তাঁদের শতসহস্র ধেনু, স্বর্ণ, শয্যা ও দাসী দান করলেন, আর স্বয়ং কৃষ্ণ "শ্রেষ্ঠ ফললাভের আশায়" তাঁদের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হলেন। বনপর্বের প্রথমেই যুধিষ্ঠির ঘোষণা করলেন যে তিনি ব্রাহ্মণের সেবার জন্যেই অর্থ কামনা করেন, নিজের জন্যে নয়। বনপর্বেই বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করছেন ব্রাহ্মণের দেবত্ব কী কারণে হয়, আর যুধিষ্ঠির সঠিক উত্তরে বলছেন, বেদাধ্যয়নের ফলে। শান্তিপর্বে চার্বাকবধ উপাখ্যানে স্বয়ং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে ব্রাহ্মণগণ ভূতলস্থ দেবতা এবং সতত অর্চনীয়। অনুশাসন পর্বের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম কীর্তন করা হয়েছে এবং কি কারণে ব্রাহ্মণসেবা রাজাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য, আর ব্রাহ্মণেরা সব মানুষের পূজনীয়, সে বিষয়ে ভীষ্ম বিস্তারিত উপদেশ দিয়েছেন। বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে কলিযুগের শেষে ব্রাহ্মণ কল্কি অবতার আবির্ভূত হয়ে শূদ্র এবং ম্লেচ্ছদের ধ্বংস করে ব্রাহ্মণদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করবেন, আর এ ভাবেই আবার সত্যযুগের সূচনা হবে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের এই আপাতশ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে ক্ষত্রিয়দের অগ্রাধিকার এবং তাঁদের উপর ব্রাহ্মণদের নির্ভরতার লাঘব করেনি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন লক্ষভেদে উদ্যত হলে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁকে এই বলে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন যে তাঁরা ক্ষত্রিয়দের বিদ্বেষভাজন হতে চান না। জ্ঞাতিবধ করে রাজ্যলাভের জন্য চার্বাক যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করলে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে চার্বাককে মেরে ফেললেন। শান্তিপর্বে ভীষ্ম রাজধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছেন: "বেদে কথিত আছে যে অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ম সমস্তই রাজধর্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে লীন হইয়াছে। ধর্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।"[১৫] শান্তিপর্বেই ইন্দ্রও বলছেন যে "অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"[১৬] দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও জীবিকার জন্যে কৌরবদের উপর নির্ভলশীল ছিলেন বলে তাদের পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন।

মহাভারতের সামাজিক কাঠামোতে ব্রাহ্মণদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান শূদ্রদের। একলব্য শূদ্র ছিলেন বলেই দ্রোণাচার্য তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার করতে পেরেছিলেন। পঞ্চপুত্র সহ নিষাদ জননীকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা পাণ্ডবদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এবং তৎকালীন মূল্যবোধে নিন্দনীয় হয়নি, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রহত্যা কোনো অপরাধ বলে গণ্য হত না। অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার সময় অর্জুন কর্ণের সংগে প্রতিযোগিতায় অস্বীকৃত হয়েছিলেন কর্ণের আপাত শূদ্রত্বের কারণেই। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী চিৎকার করে কর্ণকে বরণ করতে অস্বীকার করেছিলেন একই কারণে। যদিও দ্রুপদ শুধু ধনুর্বিদ্যা ছাড়া জাতপাত কিংবা অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেননি। বকরাক্ষসবধ উপাখ্যানে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলছেন যে ব্রাহ্মণ রাক্ষসের হাতে নিহত হলে শূদ্রের বেদশ্রুতির ইচ্ছার মতো অপাত্রেরা তাঁর কন্যাকে কামনা করবে। শিশুপালের

বধের সময় কৃষ্ণ বলছেন যে শূদ্রের বেদশ্রুতির বাসনার মতো মরণাভিলাষী শিশুপালের একবার রুক্মিণীর পাণিগ্রহণের বাসনা হয়েছিল। অনুশাসনপর্বে চ্যবন-নহুষ উপাখ্যানে ব্রাহ্মণ চ্যবন এবং ক্ষত্রিয় নহুষ পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করলেন এবং ধীবরদের সমস্ত ন্যায্য প্রাপ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলেন। শূদ্রদের হীনস্থান নির্দিষ্ট করে শান্তিপর্বে মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন: "ভগবান প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম। ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব ভোগবিলাসে তাহার অর্থ সঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে।... যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরনপোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উদ্‌বৃত্ত হইবে, প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে।"[১৭] একমাত্র রাজার আদেশে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য শূদ্রদের কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয়ের অধিকার কেন দেয়া হয়েছে তা অতি স্পষ্ট। কারণ ধর্মকর্মে ব্যয়িত অর্থ সবই ব্রাহ্মণেরা পাবে। বনপর্বে মার্কণ্ডেয় বলেছেন যে কলির সন্ধ্যায় অধর্ম যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছোবে, তখন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে নিজেদের পরিচর্যা করাবে, তাঁদের উপদেশ দেবে এবং 'ভো' বলে সম্বোধন করবে। এই চূড়ান্ত অধর্মের অবসানের উদ্দেশ্যেই কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন। মনুস্মৃতি নির্দিষ্ট শূদ্রদের আর্থসামাজিক অবস্থানের সংগে মহাভারতের এই চিত্রের হুবহু মিল আছে।

বৈদিক যুগের কাছাকাছি সময়ে লিখিত মূল ক্ষত্রিয় কাহিনীতে সম্ভবত নারীদের বেশ কিছুটা মর্যাদা এবং স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের যুগে, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের ফলে ক্রমশ মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট নারীর হীনস্থান মহাভারতেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে স্থির করা বর্তমানে অসম্ভব। পল্লবিত বেদব্যাসী মহাভারতে সামগ্রিকভাবে নারীর যে স্থানাংক নির্ধারিত হয়েছে তা সম্পূর্ণই অমর্যাদাকর। কাহিনীর সর্বত্রই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিংবা ক্ষত্রিয়দের সামনীতিতে প্রায়ই শত শত সালংকারা সুন্দরী যুবতীকে পণ্যের মতো দান এবং গ্রহণ করা হচ্ছে। বকরাক্ষস বধের কাহিনীতে ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলছেন, যে উদ্দেশ্যে লোকে ভার্যা গ্রহণ করে তাঁর সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়েছে, কারণ তিনি এক পুত্র ও এক কন্যার জনক হয়েছেন। ব্রাহ্মণী রাক্ষস দ্বারা নিহত হলে ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করতে পারবেন, কারণ পুরুষের বহুবিবাহ ধর্মসম্মত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুনর্বিবাহে ঘোর অধর্ম। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর সংগে বিবাহের সময় তাঁর নিজের মত জিজ্ঞেস করা হয়নি। কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখার আগেই লব্ধবস্তু পাঁচ ভাইকে ভাগ করে নিতে বলেছেন, আর এ কারণেই সকলে মিলে তাঁকে বিবাহ করলেন, এই প্রচলিত বিশ্বাসও ভ্রান্ত। দ্রৌপদীকে দেখবার পর কুন্তী নিজেই বললেন যে তিনি অধর্ম করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে পঞ্চপাণ্ডবও কুন্তীর কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন যে তিনি দ্রৌপদীকে জয় করেছেন বলে দ্রৌপদী তাঁরই প্রাপ্য। অর্জুন বিনয় সহকারে বললেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই আগে বিবাহ করা উচিত, অতএব যুধিষ্ঠিরই বিবাহ করুন। তবে তাঁর চার ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী তাঁরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু ততক্ষণে পাঁচ ভাই সকলেই দ্রৌপদীর রূপলাবণ্য দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়েছেন। "ভক্তিস্নেহকৃত অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট ও তদ্‌গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনংগবিকার প্রাদুর্ভূত হইল।...যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জনে লইয়া কহিলেন, 'দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হইবেন'।"[১৮] তারপর যুধিষ্ঠির ও ব্যাসদেব নারীর একাধিক স্বামীর সংগে বিবাহের কিছু পৌরাণিক উদাহরণ দিয়ে এই বিবাহকে সমর্থনের একটা উপায় বের করলেন। অর্থাৎ মহাভারতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কামাসক্ত হয়েই পঞ্চপাণ্ডব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে দ্রৌপদীকে ভোগ্যবস্তু হিশেবে সকলেই একসংগে বিবাহ করেছিলেন, মাতৃবাক্যের সম্মানে নয়। পরে ব্যাসদেব তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে সুন্দ-উপসুন্দের পরস্পরকে হত্যার উপাখ্যান বলে পাণ্ডবদের উপদেশ দিলেন যে তাঁরা যেন প্রত্যেকে সময় ভাগ করে আলাদা ভাবে দ্রৌপদীর সংগে সহবাস করেন। মাহাকাব্যের রচয়িতা দ্রৌপদীর নিজ অভিপ্রায়ের কোনো মূল্যই দেননি। প্রধান নারীচরিত্রকে পুরুষের কামচরিতার্থ করবার উপকরণ হিশেবেই চিহ্নিত করেছেন।

কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়েও দ্রৌপদী চরিত্রে নারীর হীনস্থান বার বার প্রকাশ পেয়েছে। পাশা খেলার সময় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর মতামত না নিয়েই তাঁকে পণ রাখেন। অবশ্য আগে নিজেকে পণ রেখে হেরে যাবার পরে। এ অবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ রাখবার তাঁর অধিকার ছিল কিনা, দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সহ সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরেরা নীরব থাকেন, কারণ তাঁরা নারীকে দ্রব্য হিশেবে গণ্য করতেই অভ্যস্ত। আর উপস্থিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নীরব থাকেন, কারণ তাঁরা ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজী। বনপর্বে কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে দ্রৌপদী জানাচ্ছেন যে পঞ্চস্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে তিনি সপত্নীদের সংগে কায়মনোবাক্যে তাঁদের সেবা করেন। স্বামীর স্নান, ভোজন, শয়ন করলে তারপরই তিনি করেন। স্বামীরা বাইরে থেকে আসামাত্র তিনি তাঁদের আসন ও জল দিয়ে সংবর্ধনা করেন। তাঁরা যা আহার বা পান করেন না তিনিও তা করেন না। তিনি সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সকলের পরে শুতে যান। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে এদেশের ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিশেবে নারীদের যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, দ্রৌপদীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু এত করেও স্বর্গারোহণের পথে তাঁর পতন হল, কারণ তাঁর মনের গহনে নাকি অর্জুনের প্রতি কিঞ্চিৎ

পক্ষপাত ছিল। বললেন কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয়, জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠির। এদিকে তাঁর স্বামীরা যত্রতত্র, সময়ে অসময়ে, বহু বিবাহ করেছিলেন বলে মহাকাব্যে তাঁদের কোনো বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী স্বয়ং কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে তার ষোল হাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এছাড়া তাঁর আরও দশ বার জন পত্নী ছিলেন। চোখে কাপড় বেঁধে গান্ধারীর স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের মাধ্যমে মহাকবি ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট পাতিব্রত্য ধর্মের চরম উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর জন্য স্বামীর আত্মত্যাগের কোনো উদাহরণ মহাভারতে নেই, কারণ তা ছিল ধর্মশাস্ত্রের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে গান্ধারীর চোখ খোলা থাকলেই স্বামীস্ত্রী উভয়েরই অনেক বেশি সুবিধা হত।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন যে অধর্মের ফলে কুলস্ত্রীরা ভ্রষ্টা হন, ফলে বর্ণসংকর হয়, আর পরিণামে সমস্ত কুল নরকে পতিত হয়।[১৯] কৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ে বলছেন, "আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি পাপযোনিও পরম গতি লাভ করে, ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষিদের মতো পুণ্যবান ভক্তদের আর কথা কী?"[২০] বিশেষত অনুশাসন পর্বে ভীষ্মের মুখে যে ভাষায় ও ভাবে স্ত্রীজাতির নিন্দা করা হয়েছে, তা থেকে ধর্মশাস্ত্রীয় যুগে সমাজে নারীদের হীনস্থান বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। প্রথমে অপ্সরা পঞ্চচূড়ার উপাখ্যানের মাধ্যমে ভীষ্ম বললেন: "কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়।...যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না।"[২১] এই উদ্ধৃতির বর্জিত অংশে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এমন আরও সব কথা আছে যা সম্পূর্ণ অশ্লীল এবং একমাত্র বর্বরের লেখনী কিংবা মুখ থেকেই বেরুতে পারে। তারপর যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করবার অজুহাতে এ ধরনের আরও কিছু কুৎসিত কথা ভীষ্মকে বলবার পর ভীষ্ম বললেন: "ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এসমুদয়ের সহিত উহাদের তুলনা করা যায়।...স্ত্রীগণের প্রতি কোনো কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্যবিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদিনী...মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।' [২২]

সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো সম্বন্ধে পরিশেষে উল্লেখ্য, ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠদের অকুণ্ঠ এবং অন্ধ আনুগত্যও পল্লবিত মহাভারত কাহিনীর একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। খলনায়ক হিশেবে চিহ্নিত দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতৃব্য ধর্মাত্মা বিদূরের কোনো কথাই শোনেন না। কিন্তু আদর্শ চরিত্র বলে চিহ্নিত পাণ্ডবেরা পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার নেশা অথচ খেলায় অপটুতা, দায়িত্বজ্ঞানহীন পণ রাখা, আপাতধার্মিকতা এবং দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তিত্ব পাণ্ডবদের প্রায় সব দুর্দশার উৎস। কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত চার অনুজ এবং দ্রৌপদী তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত। এমনকি পাশা খেলায় চার ভাইকে পণ রাখবার জন্যে এবং দ্বিতীয়বার বনগমনের পণ রাখবার জন্যে ভাইদের সংগে কোনো আলোচনা করবার প্রয়োজনও যুধিষ্ঠির বোধ করেননি। চার অনুজ এবং দ্রৌপদী অনেকবার যুধিষ্ঠিরকে দোষারোপ করেছেন এবং বলেছেন যে যুধিষ্ঠিরই তাঁদের সমস্ত দুঃখের জন্যে দায়ী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের কোনো ইচ্ছা বা কাজেরই তাঁরা বিরোধিতা করেননি। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর অপমানে ক্রুদ্ধ ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন: "হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না, তাহারা তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছেন। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি। অদ্য তোমার বাহুদয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।"[২৩] কিন্তু অর্জুন তাঁকে এই বলে শান্ত করলেন: "ধর্মাচরণ কর। ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না।"[২৪] এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ মহাভারতে আছে। রামায়ণে যেমন রামের প্রতি লক্ষণ ও ভরতের অকুণ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রের জয় ঘোষণা করা হয়েছে, মহাভারতেও তেমনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি চার অনুজ পাণ্ডবের অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসনের জয় সূচিত হয়েছে।

পাঁচ

মহাকাব্য মহাভারতে অতএব সত্যাদর্শের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া কঠিন। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি সত্যনিরপেক্ষ। সেখানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা জ্ঞাতিকুলের স্বার্থরক্ষার জন্যেই সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করা যায়। সেখানে ছলনা, কপটতা, যুদ্ধের পূর্বস্বীকৃত নিয়মভঙ্গ, অমানবীয় নরহত্যা এবং বীভৎসতা সবই ধর্মের অঙ্গ। ধনলাভ, জয়লাভ, রাজ্যলাভই প্রধান উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে কোনো অসত্য এবং অন্যায় নীতি অবলম্বনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত। সে ধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্ম, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম নয়। মহাভারতের কৃষ্ণ মিথ্যা এবং ছলনার উপর প্রতিষ্ঠিত কৌটিল্যীয় রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা এবং উপদেষ্টা। জরাসন্ধ বধের মন্ত্রণার সময় কৃষ্ণ নিজেকে কৌশলজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। এই কৌশলজ্ঞ কৃষ্ণকেই আমরা মহাভারতে বারবার দেখি,

সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণকে নয়। আর এই কৃষ্ণ-কৌটিল্য রাজনীতি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও এক শ্রেণীর রাজনীতিকের প্রেরণার উৎস, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতের যুগের ক্ষত্রিয়েরা যেমন নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য রাজ্য এবং ধন-সম্পত্তি লাভের উদ্দেশ্যে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন, আর মিথ্যাভাষণ, ছলনা, কপট যুদ্ধ অথবা যে কোনো অমানবিক আচরণ থেকে বিরত হতেন না, বর্তমানকালের এক ধরনের রাজনীতিও অনেকটা সেভাবেই পরিচালিত। এ ধরনের রাজনীতিতে সিংহাসনলোভীরা, আর তাদের চারিদিকে চেট, বিট, শকারেরা দ্রুত ধনসম্পত্তি লাভ তথা জনগণের উপর প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করেন। আর এই উদ্দেশ্যে যে কোনো অসত্য, অন্যায় এবং মানবতাবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধা করেন না। মহাভারতের রাজনীতির ট্রাডিশন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতেও সমানে চলেছে। এই রাজনীতির একমাত্র বিকল্প হতে পারে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত গণকল্যাণমুখী মানবতানিষ্ঠ কোনো রাজনৈতিক আদর্শ। যেখানে মানুষ নিজেকে শুধু এক সুউচ্চ মানবিক আদর্শ এবং ইতিহাসের অগ্রগতির নিঃস্বার্থ সৈনিক হিশেবেই গণ্য করবে। মহাভারতের অসত্য ক্ষত্রিয়াচারকে বর্জন না করলে সত্য ও মানবতার আদর্শে উজ্জ্বল কোনো নবতর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সমকালীন আর্থসামাজিক কাঠামোতে শূদ্র এবং নারীদের ধর্মশাস্ত্র নির্দেশিত যে হীনস্থান মহাভারতে প্রতিফলিত, তা-ও মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোও এই প্রাচীন কাঠামোকে পেছনে ফেলে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এদেশে নারী এবং শূদ্র মুষ্টিমেয় পরগাছা শ্রেণী দ্বারা আজও দিকে দিকে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, শোষিত, দগ্ধ। আর অচলায়তন এই আর্থসামাজিক কাঠামো শুধু যে বহু শতাব্দী ধরে ইতিহাসের পথের ধারে জগদ্দল পাথরের মতো ভারতবর্ষকে ফেলে রেখেছে তাই নয়। জনগণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশের শক্তি এবং মানবিক অধিকারকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে। অতএব মহাভারতের মানবতাহীন ও অসত্য সামাজিক মূল্যবোধকে ধর্মের আবরণে পুনরুজ্জীবিত না করে তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করাই হবে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রতিশ্রুতি। তেমনি ভাবে ব্যক্তিগত আনুগত্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র আদর্শের প্রতি আনুগত্যই মানবতানিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে। মহাভারতের কৃষ্ণকৌটিল্য রাজনীতি অনুসরণ করে নয়, শোষণ ও দমনমূলক সনাতন রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের ভিত্তিতে নূতন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণই শূদ্র ও নারী সহ গণমুক্তির একমাত্র উপায়।

বিষ্ণু নামক ঈশ্বরের কৃষ্ণ অবতার মহাভারতে নেই। আছে শুধু ধর্মবণিক বা স্বার্থান্বেষী সমাজপতিদের প্রচারে বিভ্রান্ত ধর্মান্ধ মানুষের অবচেতন মনের গহনে। আর ক্ষমতালোভী দলপতিদের মৌলবাদী রাজনীতির কপট আদর্শে। কৃষ্ণের কল্পিত জন্মস্থান নিয়ে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অশুভ উদ্যোগ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে ভারতের বুকে অন্ধকারের আবাহন।

পাদটীকা

১. বেদব্যাস বিরচিত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২১২। এরপর এই সংস্করণকে বেদব্যাসী মহাভারত নামে উল্লেখ করা হবে।

২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২২৩-২৪

৩. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪১৫-১৬, ৫১৩, ৫৬১

৪. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৮০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৬৫-৬৭

৫. সত্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামতের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Jayantanuja Bandyopadhyaya. Social and Political Thought of Gandhi, Allied Publishers, New Delhi, 1969, chs. 2-3.

৬. বেদব্যাসী মহাভারত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৩৪

৭. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১০৩৫

৮. ঐ, পৃ: ১০৩৬

৯. ঐ, পৃ: ৯২১-২২

১০. ঐ, পৃ: ১২৫৯

১১. ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৪৫-৪৬

১২. ঐ, পৃ: ১২৫

১৩. ঐ, পৃ: ১৫৩

১৪. ঐ, পৃ: ১৪৯

১৫. ঐ, পৃ: ৩৩৯

১৬. ঐ, পৃ: ৩৪১

১৭. ঐ, পৃ: ৩৩৬

১৮. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫
১৯. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১/৪০-৪১
২০. ঐ, ৯/৩২-৩৩
২১. বেদব্যাসী মহাভারত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৯৮৭-৮৮
২২. ঐ, পৃ: ৯৮৯-৯০
২৩. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৯০
২৪. ঐ

প্র ব ন্ধ

ইতিহাসের দর্শন: ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালীন নানা প্রভাব

শা হ্ আ ল ম সা র ও য়া র

কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা, আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে ওই ঘটনার ইতিহাস গড়ে ওঠে। আর ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি বিষয় থাকে; একটি হল, সমাকালীন ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলে। আরেকটি বিষয় হল, যখন দুই বা তিন প্রজন্ম পার হওয়ার পর কিংবা আরও দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পর কোনো ঘটনার ইতিহাস লেখা হয় তখন ওই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব অতটা প্রকট হয় না। তখন সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ যতটা প্রভাব ফেলে, তারচেয়ে ওই ইতিহাসের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে যিনি ইতিহাস লিখছেন তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী সেটা। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের নৈতিকতা, বিচারবোধ, দার্শনিকতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে তাদের লিখিত ইতিহাসের ওপর। ইতিহাসের দর্শন বলতে প্রধানত উল্লিখিত বিষয়গুলোকেই বোঝায়। ইতিহাসের এই দর্শন মানবতার বিপক্ষে থাকলে ইতিহাসও মানবতার বিপক্ষে চলে যেতে পারে। কাজেই ইতিহাস-এর মূল প্রতিপাদ্য শুধু তথ্য নয় বরং তথ্যগুলোকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে লক্ষ্য করে ইতিহাসে সাজানো হল বা উপস্থাপন করা হল সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দুই

আরেকটি বিষয় হল একটি লিখিত ইতিহাসকে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এই অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে যারা বাস করছেন তাদের জন্য এই অঞ্চলে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমন ছিল এক ধরনের আগ্রাসন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক থেকে বখতিয়ারের আগমনকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে দেখা হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখাতে 'যবন' বলতে কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়কেই বুঝিয়েছেন। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাবে, ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে যারাই শাসনের উদ্দেশ্যে এসেছেন তাদের সবাইকে উনি একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। কিন্তু বখতিয়ার খিলজি বা অন্য যারাই বাইরে থেকে এসেছেন, তাদের আসার কারণে হয়তো একটি শ্রেণী বা বিশেষ জনগোষ্ঠী উপকৃতও হয়েছেন। তাহলে উপকৃত শ্রেণীর দৃষ্টিতে বখতিয়ারের বা অন্য শাসকদের আগমন কিন্তু আগ্রাসন নয় বরং এরা এই আগমনকে সাধুবাদ জানিয়েছিল।

একটি বিষয় হয়তো অনেকেই মনে করেন যে, ইতিহাস বুঝি শুধু দায়বদ্ধতা থেকে লেখা হয়, একটা কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করার জনই ইতিহাস লেখা হয়। কিন্তু আমার ধারণা অনেক সময়ই এই ধারণাটি সঠিক নয়। সবসময়ই ঐতিহাসিকরা একটা দায়বদ্ধতা থেকে লেখেন কিংবা কিছু একটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই যে লেখেন তা ঠিক নয়। আর যদি সেটি করা হয় তাহলে সেই ইতিহাস দুর্বল হয়ে যায়; এ ধরনের লেখার ভিত্তি থাকে না বিধায় এর গ্রহণযোগ্যতাও হ্রাস পায়। একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মানুষের মুখে মুখে তার একটি বিচার-বিশ্লেষণ চলতে থাকে; এভাবে নানা

আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে যতই ঘটনা থেকে দূরবর্তী সময় আসে, ততোই ঘটে যাওয়ার ঘটনার দূরবর্তী সময়ে এসে যে-ইতিহাস লেখা হয় সেটা অনেক বেশি সত্য ও সঠিক তথ্যনির্ভর হয়। এধরনের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত কালোত্তীর্ণ হয় এবং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়।

তবে এটা ঠিক, সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কোনো-না-কোনো প্রভাব কম হোক বেশি হোক থাকবেই। ঘটনার অনেক দূরবর্তী সময়ে এসেও সেই ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে মানুষের সমর্থন ও বিরোধ থাকে; কাজেই ঘটনার যত দূরবর্তী সময়ে বসেই ইতিহাস লেখা হোক না কেন, লেখাকে একশত ভাগ প্রভাবমুক্ত রাখা সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রকৃত ইতিহাস বলতে যে বিষয়টিকে বোঝায় সেই প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান মেলা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত ইতিহাস বলতে কোনো কিছু নেইও। প্রকৃত ইতহিাস আমরা কোনটিকে বলব? এটুকু বলা যায়, নানা বিতর্কের ভেতর দিয়ে যে ইতিহাস উঠে আসে কিংবা যে-ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক কম থাকে বা মতভেদ কম থাকে, সেই ইতিহাসই টিকে থাকে।

আবার এটাও দেখা গেছে; কোনো কোনো ঘটনার প্রকৃত সত্য অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ কালেও বেরিয়ে আসে না। তখন ঘটনার প্রকৃত সত্য আর যে সময়কালে ইতিহাস লেখা হচ্ছে তখনকার সত্য– এই উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজ করে। এতে করে প্রকৃত সত্য ইতিহাসে ঠাঁই পায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তখনকার কোনো বিষয় বা ঘটনা যদি বর্তমান সময়ের সেন্টিমেন্টের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ঐ ধর্মের প্রকৃত সত্যকে হয়তো কোনো ঐতিহাসিক তার ইতিহাসে তুলে আনতে দ্বিধান্বিত হন বা বিব্রত বোধ করে। কাজেই এভাবেও অনেক সময় ইতিহাসে সত্যকে আড়াল করা হতে পারে।

তিন

ইতিহাসের দর্শন আলোচনা করতে গেলে একটি বড় বিষয় সামনে চলে আসে, সেটি হল আমরা যেসব ইতিহাস পড়ি সেগুলোর প্রায় সবই রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস। সারা পৃথিবীতেই সাধারণ মানুষদের জীবনপ্রবাহ নিয়ে সে অর্থে কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি। এর কারণ হল কোনো ঘটনা যদি বিশেষ হয়ে না ওঠে কিংবা বহু মানুষকে প্রভাবিত না করে, তাহলে সেই ঘটনা বা বিষয় ইতিহাসের অংশ হয় না; এজন্য যে, তা না হলে তো অসংখ্য সাধারণ বিষয়কে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে! কিন্তু সেটি বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়। সে কারণে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের কথাই বেশি বেশি ইতিহাসে স্থান পায়। সেদিক থেকে সাধারণ জনগণের কথা প্রচলিত ইতিহাস লেখার ধারায় স্বাভাবিকভাবেই বাদ পড়ে।

অবশ্য সাধারণ জনগণের মধ্যেও অনেক ঘটনা ঘটে যার বিশেষত্বও অনেক সময় থাকে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সার্বিক জীবন-প্রবাহ, নানা প্রবণতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মোটিভ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তাদের ইতিহাস রচিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিম বাংলার গৌতম ভদ্র যে নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখেছেন সেটি একটি ব্যতিক্রম এবং নতুন ব্যাপার নিঃসন্দেহে। এরকম কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন মধ্যবিত্তের ইতিহাস। কাজেই এক সময়কার শুধু উচ্চ বিত্তের কিংবা রাজা-বাদশাহদের যে ইতিহাস লিখিত হত সেই চিন্তারও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। রাজা-বাদশাহ বা নেতৃস্থানীয় কারও বা অন্য যে-কোনো দিক থেকে বিশেষ হয়ে ওঠা নায়কদের ইতিহাস যেমন দরকার, একইভাবে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবর্গের সামষ্টিক ইতিহাসেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কথা হল, যাদের ইতিহাসই লিখিত হোক না কেন, মূল বিষয় হল তার মধ্যে যেন সমকালীন বায়াসনেসটা না থাকে। সেটা থাকলে লিখিত ইতিহাস অবশ্যই দুর্বল হয়ে যায়, এবং মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও হ্রাস পায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই যুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বাঙালির ইতিহাসে এমন ঘটনা দ্বিতীয়টি নেই, যেখানে নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সকলেই একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এখন যদি বাঙালিকে আগ্রাসী বা ক্ষুব্ধ হতে বলা হয় তাহলে অল্প কিছুসংখ্যক লোক হয়তো একসঙ্গে আগ্রাসী হতে পারবে, কিন্তু একসঙ্গে সাত কোটি মানুষ কিন্তু এখন আগ্রাসী হয়ে জ্বলে উঠতে পারবে না। তখন এটা সম্ভব হয়েছিল; এই যে একসঙ্গে সবাই জ্বলে উঠতে পেরেছিল, এই বিষয়টি বাঙালির মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে। অর্থাৎ এই যুদ্ধ কিন্তু বাঙালির চিন্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সাত কোটি মানুষকে একত্রিত করা উদ্বুদ্ধ করার জন্য যিনি নেতৃত্ব দিলেন তাকে পরিবারশুদ্ধ মেরে ফেলা হল– এগুলো এই জাতির জীবনে অনেক বড় ঘটনা। এগুলো আমাদের মস্তিষ্ক গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও তো নানা রকম মত রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের অনেকে এখনও বেঁচে আছেন, সে জন্য নানা ব্যক্তি ও দলের নানা রকম স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা ধরনের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। আরও দীর্ঘকাল পরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তখনকার মানুষদের এত স্বার্থবাদিতা থাকবে না তখন যে ইতিহাস লিখিত হবে সেটা হবে অনেক বেশি নিরপেক্ষ, সত্য এবং গ্রহণীয়।

চার

হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব সেটা আবার খানিকটা ভিন্নরকম। আমাদের এখানকার মুসলমান আর আফগানিস্তানের মুসলমান কিন্তু এক নয়। আফগানের মুসলমানেরা কিন্তু রাজ্য শাসন করেছে। অথচ এখানকার মুসলমানেরা হল দরিদ্র। হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছে। সুতরাং দরিদ্র হিন্দুর ইতিহাস যে অর্থে উচ্চবর্গের হিন্দু ঐতিহাসিকরা লেখেনি, একই কারণে তারা মুসলমানদেরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এড়িয়ে গেছেন। এই উপেক্ষা বা এড়িয়ে যাওয়া কিন্তু শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। কাজেই ইতিহাসের দর্শন অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী-দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত। সুতরাং ইতিহাস লিখলেই হবে না বরং কে লিখছেন কী লিখছেন এবং কোন কালে বসে লিখছেন এই তিনটি বিষয় ইতিহাসের দর্শন বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি ।

ইতিহাস যতরকমভাবেই লিখিত হোক-না কেন, সেই লেখার মধ্যে যদি সত্যিকারের পর্যবেক্ষণ বা ন্যায়সঙ্গত পর্যবেক্ষণ না থাকে, তাহলে ইতিহাস মূল্যহীন হয়ে যায়; কাজেই উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সঠিক সমন্বয় ঘটলেই সেটা প্রকৃত ইতিহাস হয়ে উঠবে। অনেক ইতিহাস আছে যা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে বহুকাল পর্যন্ত টিকে ছিল। তারপর হয়তো সেটা লিখিত রূপে তুলে আনা হয়েছে। সেই তুলে আনার মধ্যেও সততার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে কোনো ঘটনা এক কাল থেকে আরেক কালে ভেসে আসে, সেই ভেসে আসার মধ্য দিয়ে সেই ঘটনা একটি বৈশিষ্ট্য বা রূপ নিয়ে নেয়। সেটা তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে যেভাবে প্রতিষ্ঠা পায় সেই রূপ বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই ঐ ঘটনার ইতিহাস লেখা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় সেভাবে লিখিত ইতিহাসের ঘটনাকেও ভিন্ন রূপে দেখা যায় সমসাময়িক সত্যের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। আর যদি বিরোধ সৃষ্টি না করে তাহলে প্রকৃত সত্যটাই ইতিহাসে ঠাঁই পেয়ে যায়।

মূল কথা হল, ইতিহাস আকারে আমরা যা কিছু পাই, তার সকল ধারা বা চিন্তার সাথেই পাঠক একমত হবেন এমন নয়। পাঠকের দায়িত্ব তাই একই বিষয়ের একাধিক ইতিহাসের মধ্য থেকে প্রকৃত ইতিহাসটা খুঁজে বের করা। সুতরাং ইতিহাসের দর্শন লেখকের কলমের সঙ্গে যতটা যুক্ত, একইভাবে পাঠক কোনটি বেছে নেবেন পাঠকের সেই নিষ্ঠার সঙ্গেও সমানভাবে যুক্ত।

পাঁচ

সর্বপরি আমরা বাঙালি হিসেবে সারা পৃথিবীর কাছে কীভাবে পরিচিত, সেটি একটি বড় প্রশ্ন; যে সকল দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণ হয়ে গেছে অনেক আগেই, যাদের মধ্যে সাধনা ও চ্যালেঞ্জ হলো নান্দনিক নানা বিষয় নিয়ে, তাদের তুলনায় আমরা কি আদৌ মানুষের মধ্যে পড়ি? বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-ধারণের যে মান, তার তুলনায় পৃথিবীর অনেক দেশের তুচ্ছ প্রাণীকূলের জীবন-মানও অনেক উঁচুতে। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, আমরা কিন্তু সেই আদি বা মধ্যযুগীয় স্তরের জীবন-যাপন করছি। এতে করে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর কাছে জীবন-যাপনের মানদণ্ডের দিক থেকে আমাদের অবস্থান কোথায়, সেটা কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে ভাববার দরকার রয়েছে।

আমাদের তো সবই ছিল; মাটি, পানি, খনিজ সম্পদ, মানব সম্পদ ইত্যাদি। তাহলে আমাদের এই অবস্থার কারণ কী? কারণ হয়ত অনেক কিন্তু প্রধান কারণ হলো, আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। সে কারণে ভবিষ্যতে আমরা কী করব, কোন্ পথে কোথায় গিয়ে পৌঁছব সেটা জানি না। যে জাতি নিজেদেরকে স্বাভাবিক মানুষের স্তরেই এখনও নিতে পারেনি, সে জাতির করণীয় কী সেটা সম্পর্কে আমরা এখনও সন্দিহান। আমাদের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎকর্ষের তাগিদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা দরকার। অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা, চর্চা ও বিস্তারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকটি যুক্ত করে চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরী। এতোদিন আমরা যে ইতিহাস পড়েছি তার মধ্যে এদেশের সাধারণ জনগণের সুখ-দুঃখের বিষয়গুলো ছিল না; সেখানে একটি জাতিগোষ্ঠির অবনতির কারণ যেমন ছিল না, একইভাবে তাদের উন্নতির পথ বা উপায়ও সেখান থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

তবু আশার কথা হলো যে দেশের মানুষ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছে, সে দেশের মানুষ নিশ্চয়ই তাদের অস্তিত্ব-সংকটকে গুরুত্ব দেবে; তারা অন্তত নিজেদের'গিনিপিগ' হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করাতে আর চাইবে না। সুতরাং আরও অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাস রচনা ও চর্চার পাশাপাশি আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা, চর্চা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা দরকার। যার ফল হিসেবে আমরা আমাদের অতীত-অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারব এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের অর্থনীতি কী হওয়া দরকার সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব।

ইতিহাসের চোরাবালি: উপলব্ধির শিথিলতা

ফ রী দু ল আ ল ম

অতীতের যে সব চিহ্ন বর্তমানে অবশিষ্ট আছে শুধুমাত্র তাদের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্তমানের মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকলে ভূ-বিবর্তনের মতো মানুষের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার কাহিনীও অজানা থেকে যেত। কিন্তু ঐতিহাসিক যখন লিখিত দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে কাজ করেন তখন তিনি অনেক বেশি অসুবিধার মুখোমুখি হন। সকল ধরনের ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে লিখিত দলিল-দস্তাবেজই সবচেয়ে মূল্যবান আবার সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চক ও প্রতারক। যে উপায়ে এসব দলিল-দস্তাবেজ ঐতিহাসিকের হাতে এসে পৌঁছায়, তার প্রভাবেই এগুলো প্রায় অনবরত, কম-বেশি সাংঘাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। প্রায় সব যুগেই ব্যক্তি অথবা সরকার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলিলের পাঠ পরিবর্তিত আকারে উপস্থাপন করে থাকে। এ কারণে যে কোনো ঐতিহাসিকের হাতে দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এসে পৌঁছার পর তাদের মূল্যায়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে–তার পরের কাজটি হচ্ছে দলিলাদির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণের কাজটি। এই বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণের কাজটির সফলতা নির্ভর করে সাক্ষ্যদাতার প্রশিক্ষণ, বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক মর্যাদার ওপর। সাক্ষ্যদাতা কী বলতে চায়, সে কথা বুঝে নেবার প্রচেষ্টার পাশাপাশি তার কথার মধ্যে কতটুকু সত্যতা রয়েছে, তাকেও বের করে আনতে হয় ঐতিহাসিককে। প্রধানত এ ধরনের অসুবিধার কারণেই যা কিছু ঘটেছিল, বহু চেষ্টা করেও ঐতিহাসিক সেই ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে জানতে অসক্ষম হয়ে থাকেন। এই সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেই ঐতিহাসিক প্রায়-অনিচ্ছুক মনে ঘটনাটিকে তাঁর ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে নেন– সার্বিকতার তুলনায় এটুকু কিছুই নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এটুকুও কম নয়।

স্থান ও কালের মধ্যে সীমিত মানব-সমাজগুলোর ক্রমবিকাশই ঐতিহাসিকের পর্যালোচনার বিষয়। এই ক্রমবিকাশ লক্ষ লক্ষ কোটি স্বতন্ত্র মানুষের স্বতন্ত্র ক্রিয়ার ফল– কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ক্রিয়া হিসেবে তারা ইতিহাসের আওতায় পড়ে না। সামগ্রিকতার নিরিখে এই ক্রিয়াগুলো যেভাবে সম্পর্কিত কিংবা এগুলো সামগ্রিকতাকে যে পরিমাণে প্রভাবিত করেছে–শুধুমাত্র সেই ভাবে বা সেই পরিমাণে ইতিহাস এগুলোকে বিবেচনা করে থাকে।

দুই

বাংলাদেশ নামের এই পাললিক জনপদ আর্যপূর্ব কাল থেকেই সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ছিল। সেই দূর অতীত থেকে নিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বের সুরক্ষা, জাতিসত্তার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। হাজার বছরের বহমান গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের অভিন্ন বোধ-বিশ্বাস, জীবনচেতনা, আচরণরীতি, স্বপ্নকল্পনা এবং অভিন্ন মানসিকতার ধারাবাহিকতা রচনা করেছে আমাদের জাতিসত্তার সুদৃঢ় কাঠামো। এই কাঠামো তার সুবিস্তৃত শেকড় ছড়িয়ে রেখেছে আমাদের ঐতিহ্যের গভীর মর্মমূলে। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের আগে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল পাল ও সেন শাসনামলে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণববাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈরাগ্যবাদ, মায়াবাদ ও নির্বাণবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পালি ও প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাঙালির সংস্কৃতিতে তার প্রকাশপথ রচনা করে নিয়েছিল। তারপর এল তুর্কি বিজয়– বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব যুগের অভ্যুদয় হল। বিজয়ী মুসলমানের দরবারে বিজিতের ভাষা বাংলা সগৌরবে স্থান করে নিল। দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা ভাষা বিকাশের নতুন পথ বের করে নিল। এর ফলাফল হিসেবে যে বিরাট লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য আমরা পেয়েছি, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও সার্বজনীনতার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে তখন থেকেই পড়তে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক লিখেছেন:

"ভারতে হিন্দু ধর্মের পার্শ্বে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা বলেন বা মনে করেন যে, ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ উঠিয়াছে, তাঁহাদের গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রশংসার সহিত বিভ্রান্ত দৃষ্টির যশোগাথাও ঘোষণা করিতে হয়। ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ইতিহাস, শান্তি প্রবর্তনারই ইতিহাস। এই ইতিহাস নরশোণিতে কলঙ্কিত নহে। .....ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে এদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব অনুভূত হইল। হর্ষবর্ধনের (মৃত্যু ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ) পর ভারতে কোনো হিন্দু রাজা একচ্ছত্র রাজত্ব করেন নাই। এই সময়ে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতী বিষ ভক্ষণ করে। তখনকার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস এক হইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতায় রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণেই আজও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং বাঙালি ব্রাহ্মণে, কিংবা মাদ্রাজী হিন্দু এবং মৈথিল হিন্দুতে এত প্রভেদ। এই কারণেই 'মনুসংহিতা' ভারতের সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই কিংবা করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা'-রও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই কারণেই ভারতের

হিন্দুদের মধ্যে দেশে দেশে নূতন শাস্ত্র, নূতন বিধান এবং নূতন আচার-বিচার প্রচলিত হইয়াছে।" [মনীষা মঞ্জুষা– ড. এনামুল হক]

মানুষ, সমাজ এবং সংস্কৃতি একই সঙ্গে বিকাশ লাভ করে। মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; এককভাবে কোনোটিরই উদ্ভব সম্ভবপর নয়। মানুষ সংস্কৃতির কতটা গ্রহণ করতে পারবে অথবা সংস্কৃতিকে কিভাবে নির্মাণ করতে পারবে তার ওপরেই নির্ভর করবে একটি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। মানুষ কর্মক্ষম হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে– এই ব্যবহারের ফলে মানুষ তার সমাজকে নির্মাণ করে এবং সমৃদ্ধ করে। আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক কালের ইতিহাস একেবারে সুস্পষ্ট না থাকলেও এটা অন্তত জানা যায় যে, এতদঞ্চলের মানুষ ভিন্নতর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আর্যরা একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষে এসে সমগ্র উত্তর ভারত তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে পরবর্তীতে আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করে সকল মানবগোষ্ঠীর কাছে। দুর্দান্ত সাহস নিয়ে বাঙালিরা এই আনুগত্য আদায়ের দাবি উপেক্ষা করে। বাঙালিরা আপন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমাবন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য নিজস্ব সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে চেয়েছে– যার ফলে এ অঞ্চলের সমাজবন্ধন এবং ভাষার বিকাশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভিন্নতর হয়েছে। এই ভিন্নতা যদিও সর্বক্ষেত্রে সবসময় রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু যতটা সম্ভব আপন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় এই অঞ্চলের মানুষ অনেকটা সফলকাম হয়েছে।

বৈদিক যুগে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের সাথে আর্যদের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বৈদিক সূত্রগুলোতে এ অঞ্চলের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এ এই অঞ্চলের লোকদের "অনার্য ও দস্যু" বলে উল্লেখ করা হয়েছে– এই গ্রন্থে "পুণ্ড্র" নামে যে অঞ্চলের নাম পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে বর্তমানের উত্তরবঙ্গ অঞ্চল। বৈদিক যুগের শেষদিকে রচিত "বৌধায়ন ধর্মসূত্রে" পুণ্ড্র এবং বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে আর্যরা ঐ দুটি অঞ্চলে গেলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ-সব শাস্ত্রীয় উল্লেখ হিসেব করে বলা যায় যে বঙ্গদেশ আর্য প্রভাবের আওতাধীন ছিল না; স্থানীয়রা তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে বহিরাগত আর্যদের প্রতিহত করেছে। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ বহুবার এ অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে চেয়েছে– মাঝে মাঝে সফলকামও হয়েছে কিন্তু দীর্ঘকাল তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ড. প্রবোধচন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলাভাষার রূপকল্প বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর্যগণ এদেশে আসবার পূর্বেই বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করতো যার স্বাক্ষর বর্তমান বাংলাভাষাতে বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলমানরা এ অঞ্চল অধিকার করবার পরে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববর্তী সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয়। সেন আমলে জাতিভেদ প্রথার কারণে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষেরা খুবই উৎপীড়িত ছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এই উৎপীড়ন বন্ধ হবার সুযোগ ঘটে এবং সমাজের ভেতরে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অসমর্থিত হতে শুরু হয়। বিভিন্ন কারণে সেনবংশীয় শাসনের প্রতি নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষোভ ছিল ব্যাপক মাত্রার। প্রথমত, সেন শাসকরা ছিল বহিরাগত এবং তারা সুদূর কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণ আমদানি করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। দ্বিতীয়ত, মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে সেনশাসকদের কঠোর নির্দেশ ছিল– নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ভয় দেখিয়ে দেশী ভাষার চর্চা থেকে এরা সাধারণ মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, রাজকীয় দরবারী ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর ফলে সংস্কৃতির একটি নতুন উচ্চমার্গ সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষদের সংস্কৃতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। চতুর্থত, সেনশাসকের নগর-পরিকল্পনা ছিল সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ– নিম্নবিত্ত মানুষদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে অর্থাৎ নগর ছিল সম্মানিত, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তথা ব্রাহ্মণদের জন্য। সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করা, তাদেরকে হীন-নীচ হিসেবে গণ্য করা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বঞ্চিত করার যে প্রবণতা তদানীন্তন শাসকদের মধ্যে বিরাজ করছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই সাধারণ মানুষ বখতিয়ার খিলজির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশের সমগ্র ভূ-খণ্ডই ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। মোগল সম্রাট আকবর ১৫৭৬ সালে পাঠান দাউদ শাহ্‌কে পরাজিত করে সমগ্র বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডকে পদানত করেন। ১৬০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চল মোগল শাসনের আওতাধীনে আসে। এর আগে অল্প কিছু সময়ের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এ অঞ্চলে পর্তুগীজদের আগমন ঘটেছিল।

মুসলমানদের শাসনামলে এদেশে দেশীয় ভাষার চর্চা হতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের মূলে মুসলমান শাসনকর্তাদের সমর্থন ও সহায়তা ছিল। গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ্ মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের আশ্রয়দাতা ও সমর্থক ছিলেন। তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে বিখ্যাত বাঙালি কবি শাহ্ মোহাম্মদ সগীর কাব্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের শাসনামলে (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) কৃত্তিবাস বাংলাভাষায় "রামায়ণ" রচনা করেন। কবি মালাধর বসু "ভগবত পুরাণ"-কে অবলম্বন করে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" রচনা করেন। শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের শাসনামলে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান ইউসুফ শাহ্ মালাধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করেছিলেন। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় "মহাভারত" রচনা করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর-এর আশ্রয়দাতা ও সমর্থক

ছিলেন হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ। এই তথ্যগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের শাসনামলে এদেশে সংস্কৃতির নতুন ধারা উন্মোচিত হয় এবং দেশীয় ভাষার চর্চা চলতে থাকে। এ আমলে রাজদরবারের ভাষা "ফারসি" হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার চর্চায় মুসলমান শাসকগণ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং হিন্দুত্ববাদী শাসন থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি ঘটে। শ্রীচৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রেমধর্মের একটি প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন, সুলতান হোসেন শাহ্ শ্রীচৈতন্যের ধর্মসাধনার সুবিধার্থে "রামকেলি" নামের একটি গ্রাম তাকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মানুষে-মানুষে ঐক্য এবং সম্প্রীতির ব্যঞ্জনা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং এই কাজে শাসকদের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের ঔদার্যে এবং সহানুভূতিতে এদেশের সকল সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল। সুলতান হোসেন শাহের দরবারের দুইজন মন্ত্রী রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হিসেবে সুফী মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালান। রূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সাধনপদ্ধতির এমন একটি রূপরেখা দান করেছেন যা মূলত সুফী সাধনপদ্ধতির সাথে পূর্বোক্ত পদ্ধতির এক অভূতপূর্ব চমৎকার মিশ্রণ। শ্রীচৈতন্যের চেষ্টায় সেন আমলের কুসংস্কার এবং বন্ধনদশা থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবার পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

উপরের তথ্যগুলোর ঐতিহাসিকতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে কোনো দিনই স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আসার আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কয়েকটি ঐতিহাসিক উক্তির দিকে নজর দেয়া যাক:-

* রবার্ট বায়রন তাঁর "দি স্টেটস্‌ম্যান অফ ইন্ডিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন–"কংগ্রেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে বলেছেন– এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হল বিদেশী দখলদার। কাজেই তাদের শারীরিকভাবে নির্মূল করতে হবে।"

* ১৯২০ সালে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ড. মুন্‌জে বলেছিলেন– "ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজ জাতির, জার্মানি যেমন জার্মান জাতির, তেমনি ভারতবর্ষ হল হিন্দুদের।"

* ১৯২৫ সালে বিখ্যাত হিন্দুত্ববাদী নেতা লালা হরদয়াল বলেছিলেন– "আমি ঘোষণা করছি যে হিন্দু জাতি তথা হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ চারটি নীতির ওপর নির্ভর করবে। ক. হিন্দুস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতি, খ. হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা, গ. ম্লেচ্ছদের শুদ্ধিকরণ এবং ঘ. আফগানদের দেশ জয় করে তাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের শুদ্ধিকরণ।

* অতি সাম্প্রতিককালে নেহরু পরিবারের সদস্য ভারতীয় বিজেপি দলের নেতা শ্রীযুক্ত বরুণ গান্ধী উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রসঙ্গে যে কটূক্তি করে শ্রীঘরে আবদ্ধ হয়েছিলেন আশা করছি পাঠকদেরকে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

এ সব তো গেল রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য– কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে যে সব একাডেমিক বক্তব্য বই-পুস্তকে এবং বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপন করা হয় সেগুলো হচ্ছে প্রধানত ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক পর্যায়ের ব্যক্তিত্বগণের উপস্থাপিত। এ সব বক্তব্য নিতান্তই রাজনৈতিক বক্তব্য বলে উড়িয়ে দেবার অবকাশ নেই। সেসব বক্তব্যে ইতিহাসের মূল দর্শনকে কীভাবে পায়ে দলিত-মথিত করা হয়েছে সেদিকে একটু নজর দেয়া যাক।

তিন

বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সঙ্গীত, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুমাত্রিক জ্ঞানের সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিশ শতক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই শতকে বাঙালির অর্জন পূর্ববর্তী এক হাজার বছরের চেয়েও বেশি। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কলা ও বিজ্ঞানে বাঙালি মনীষী ব্যক্তিরা এই সময়কালে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। ইতিহাস জ্ঞানের একটি প্রধান শাখা বিধায় যে কোনো জাতির বা জনগোষ্ঠীর উন্নতি কিংবা সচেতন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পেছনে একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে ইতিহাসচেতনা। অতীত মানুষের অভিজ্ঞতা, অর্জন এবং বিস্মৃত অতীতকালের সত্য ও সুন্দরের মেলবন্ধন ঘটাতে হয় বর্তমানের সাথে– অতীত-বর্তমান সম্মিলিতভাবে রচনা করবে এক সুন্দর ও কল্যাণকর ভবিষ্যৎ– এই লক্ষ্যেই চালানো হয় এই ইতিহাসচর্চার প্রচেষ্টা। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জাতি, রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এগিয়ে চলে গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান, অনুশীলন, পুনর্গঠন, পুনর্নির্মাণ এবং অন্বেষণ বিশ শতকের বাঙালি ইতিহাসবিদদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। বিশ শতকে বাঙালির ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি উনিশ শতকের ইতিহাস অনুশীলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই অগ্রসর হয়েছে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া, আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ, আধুনিক ইউরোপের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, জীবনধারা এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলায় আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। একই সঙ্গে ইউরোপের জীবন ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বাংলায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উন্মেষ ঘটে। এই প্রেক্ষাপটেই সূত্রপাত ঘটে বাঙালির আধুনিক ইতিহাসচর্চার।

১৭৮৪ সালে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ১৮০০ সালে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন প্রভৃতি বিষয় বাঙালির আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ১৮০১ সালে প্রকাশিত রামরাম বসু-র লেখা "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"-কে বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্ত-র লেখা "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়-১ম ভাগ" গ্রন্থটি যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বাঙালির প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত। অধ্যাপক এ.আর মল্লিক তাঁর এক প্রবন্ধে ১৮০০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে "পিরিয়ড অফ ইমিটেশন" বা অনুকরণের কালপর্ব হিসেবে অভিহিত করেছেন। [A.R. MULLICK-MODERN HISTORICAL WRITTINGS IN BENGALI] এশিয়াটিক সোসাইটির পথ ধরেই বাংলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস সন্ধানে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পথচলা শুরু হয়। ১৮০৬-১৮১৮ সাল সময়পর্বে রচিত এবং ছয় খণ্ডে প্রকাশিত জেমস্ মিল-এর HISTORY OF BRITISH INDIA গ্রন্থটি এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য এই গ্রন্থটি ছিল অবশ্যপাঠ্য। জেমস্ মিলের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণায় ও অনুসন্ধানে অগ্রণী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণের অন্যতম হলেন– ১. টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯), ২. জন ম্যালকম (১৭৬৯-১৮৩৩), ৩. জেমস গ্রান্ট ডাফ (১৭৮৯-১৮৫৮), ৪. জোসেফ ডেভি কানিংহ্যাম (১৮১২-১৮৫১), ৫. জেমস্ টড্ (১৭৫২-১৮৩৫), ৬. জন উইলিয়াম কে (১৮১৪-১৮৭৬), ৭. হেনরি বেভারিজ (১৮৩৭-১৯২৯), ৮. হেনরি ফার্ডিনান্ড ব্লকম্যান (১৮৩৮-১৮৭৮), ৯. উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০-১৯০০), ১০. আলফ্রেড লয়েল (১৮৩৫-১৯১১), ১১. ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ (১৮৪৮-১৯২০) এবং ১২. উইলিয়াম হ্যারিসন মুরল্যান্ড (১৮৬৮-১৯৩৮)। এই ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক কাজে এসেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে কোম্পানির শাসনের খারাপ-ক্ষতিকর দিকগুলো এদের লেখায় স্থান পায়নি। এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এ অঞ্চলে সুদৃঢ়ভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজদের অধিকতর প্রভাব বিস্তার এবং সর্বোপরি ইংরেজ শাসকশক্তির গুণকীর্তন করার দিকে। এরা তাদের লেখার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের ন্যায্যতা, প্রয়োজনীয়তা এবং অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

উপরে বর্ণিত এই ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচনার মধ্যে যতই সত্য গোপন করা এবং স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতা থাকুক-না কেন, এটা অনস্বীকার্য যে, এই ইংরেজ প্রশাসক ঐতিহাসিকেরাই এ অঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। উনিশ শতকের বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ১. অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), ৩. রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৮-১৯০০), এবং ৪. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। এ ছাড়াও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখদের ঐতিহাস ভাবনার কথাও উল্লেখ করা যায়।

উনিশ শতকে বাঙালির ইতিহাসচর্চায় প্রাধান্য পেয়েছিল স্বদেশের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস উদ্ধার ও আবিষ্কার। ইংরেজ ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করে তাদেরকে স্বদেশের ইতিহাস গবেষণায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। দু'টি বিপরীতমুখী প্রবণতা এ সময়কালের ঐতিহাসিকদের কর্মকাণ্ডকে আন্দোলিত করেছে। প্রথম প্রবণতাটি ছিল স্বদেশের অতীত উদ্ধারের জন্য অদম্য স্পৃহা এবং অপরটি ছিল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের নিজস্ব স্বার্থবোধ এবং দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলের ইতিহাস-গবেষণা। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ও সামাজিক অবস্থানের কারণে এই ঐতিহাসিকদের পক্ষে ইংরেজ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্যায় আচরণের বিষয়ে সত্য কথা লেখা সম্ভব হয়নি। একইভাবে বিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসচর্চায় উনিশ শতকের সাফল্য, ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। বিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসচর্চায় অন্যতম ব্যক্তিত্বরা হলেন– ১. যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮), ২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), ৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৩০), ৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), ৫. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), ৬. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৮৯২-১৯৫৭), ৭. সুরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৯০-১৯৬২), ৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), ৯. নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) এবং ১০. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪)। বিশ শতকের শেষ চার দশকে বাংলাদেশের প্রধান তিনজন ঐতিহাসিক হলেন অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার এবং অধ্যাপক আবদুল করিম। এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসবিদগণ হলেন– এন.কে. সিন্‌হা, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, রণজিৎ গুহ, অমলেন্দু দে প্রমুখ।

বিশ শতকের প্রথম পর্বে উল্লিখিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আঠারো শতকের বাংলার ইতিহাস নিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এবং ইংরেজ শক্তির আনুকূল্যে গড়ে ওঠা এখানকার শিক্ষিত শ্রেণী নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করত। বিশেষত বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্-র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা একটি সাধারণ প্রথা বা ফ্যাসনে পরিণত হয়েছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন-এর "পলাশীর কাব্য" তার একটি বাস্তব উদাহরণ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই ধারার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্-র ইতিহাস উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপিত এই ইতিহাসগ্রন্থটি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মিথ্যা

প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রথম ঐতিহাসিক প্রতিবাদ। অন্যান্যদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন প্রত্নতত্ত্ব ও এই সমগ্র অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মূলত বাংলায় বৌদ্ধবাদের প্রভাব, এই প্রভাবের বিবর্তন ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন মুদ্রা ও ভাস্কর্যকলা। হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন। মারাঠা জাতি ও ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন সুরেন্দ্রনাথ সেন। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ প্রধানত সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন। যদুনাথ সরকার-এর ক্ষেত্র ছিল মোগল ইতিহাস, মারাঠা ইতিহাস, বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস, ধর্মান্দোলনের ইতিহাস এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনামল। নীহাররঞ্জন রায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার– এই দুজনের মধ্যে প্রথমোক্ত ঐতিহাসিক বিচরণ করেছেন বাংলাদেশ, বার্মা ও ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও শিল্পকলার ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস, আধুনিক যুগে বাংলা ও ভারতের ইতিহাস এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত ইতিহাস সাধারণ পাঠকদের মনে এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিন খণ্ডে লেখা ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস "HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT IN INDIA" এবং "THE SEPOY MUTINY AND THE REVOLT OF 1857" (প্রকাশকাল-১৯৫৭) গ্রন্থ দুটি সমকালীন পণ্ডিত মহলে বিতর্ক ও প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই দুটি গ্রন্থে ইতিহাসকে চরমভাবে বিকৃত করা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু। এ বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের সাথে রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর চরম মতানৈক্য ঘটে। বর্তমান প্রবন্ধের অত্যন্ত সীমিত পরিসরে রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলোর সবকয়টি বিতর্কিত দিক ও বিকৃত রূপ তুলে ধরা সম্ভব নয় বিধায় কেবলমাত্র বাংলার ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি গ্রন্থের বিভিন্ন পক্ষপাতদুষ্ট অংশ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করা গেল।

১৯৬৬ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় "বাংলাদেশের ইতিহাস–২য় খণ্ড (মধ্যযুগ)" গ্রন্থটি। রচয়িতা রমেশচন্দ্র মজুমদার; সহযোগী লেখক সুখময় মুখোপাধ্যায়; সম্পাদনা রমেশচন্দ্র মজুমদার। গ্রন্থটির শুরু বখতিয়ার খিলজির আক্রমণকাল থেকে এবং সমাপ্তি, নবাবী আমলের সর্বশেষ বছরে। আলোচিত বিষয়গুলো হচ্ছে রাজনৈতিক ইতিহাস, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্ম ও সমাজ, সংস্কৃতিসাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ও শিল্প। গ্রন্থটির রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত অধ্যায় থেকে যে কোনো অংশের উদ্ধৃতি নিয়ে যদি ঐ অংশটিকে আকরগ্রন্থের অনুরূপ অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর সহযোগী লেখক অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে বাংলা বইটিতে সরাসরি বসিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে সমালোচনাভিত্তিক বিবরণ রয়েছে; কিন্তু এই অংশগুলোকে লেখক ও তাঁর সহযোগী লেখক পূর্বসূরীদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সমালোচনাসহ সঙ্কলিত করে নিয়েছেন। এই গ্রন্থটিতে সমগ্র আলোচনার কেন্দ্রে একটি বিশেষ ধারণা কাজ করেছে বলে মনে হয়। ধারণাটি হচ্ছে এই যে, হিন্দু ও মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌গণ হিন্দুর উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন; তাঁরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। বস্তুত বহু বৎসর ধরেই রমেশচন্দ্র মজুমদার বিভিন্নভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করে এসেছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর এই গ্রন্থ পাঠ করলে মনে হয়– তিনি আগাগোড়াই কোনো-না-কোনো প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন– যা ঐতিহাসিকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, শোভন তো নয়ই। তাঁর ভাষায়, "... ভারতে "হিন্দু সংস্কৃতি"- এই কথাটি এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটি উল্লেখ করিলেই তাহা সংকীর্ণ অনুদার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হয়।" তাঁর গ্রন্থে পরিশিষ্ট আকারে কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে অথচ সুবিশাল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অন্য কোনো রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখ করা হয়নি– এর কারণ হিসেবে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে "মধ্য যুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ বাংলার ইতিহাসে এই দুই রাজ্যের স্থান আছে, সেই জন্যেই বিশেষ করে এই দুইটি রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।" কোনো-একটি রাজ্য হিন্দু অথবা মুসলমান কি-না– প্রকৃত ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করেও উক্ত রাজ্যটির রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তার আলোচনায় তুলে ধরতে পারেন। ইতিহাসের দর্শন অনুসরণ করলে সেটা হবে সকল পাঠকের জন্য জ্ঞান প্রদানের একটি প্রচেষ্টা– রাজ্যটিকে বিশেষ কোনো-একটি জাতির "রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ" মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে একান্তই অবান্তর।

বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই ... চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল। ... ... তিনি দুরাচারী যবনকে শাস্তি দিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন, "নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন"– বাঙ্গালী তাহা মনে রাখে নাই।" অথচ "শিক্ষাষ্টক"-এর একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য নিজেই ইঙ্গিত করেছেন যে আদর্শ বৈষ্ণবকে তৃণের মতো সহিষ্ণু হতে হবে। শ্রীচৈতন্যের কথার বিপরীতে রমেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্ধৃতি আদর্শ বৈষ্ণববাদের পরিপন্থী।

রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত এবং সম্পাদিত এই গ্রন্থের কতগুলো মন্তব্য পরীক্ষা করলে দেখা যাবে অনেকগুলো ভ্রান্ত তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে– এগুলো লেখক-সম্পাদকের সচেতন মস্তিষ্কের ইচ্ছাপ্রসূত কি-না, অথবা লেখক-সম্পাদক নিজেদের অজান্তেই ইতিহাসের দর্শন অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছেন– তা বিবেচনার ভার পাঠকের ।

ক. "হিন্দুর জাতি মারাই মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ–" – এই উক্তিটি অতি জটিল একটি সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার অতিমাত্রার সরলীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয় । উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অত্যাচারে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ, সুফি দরবেশদের প্রভাবে পড়ে ইসলাম গ্রহণ, আদিম গোত্রের দলপতির ইসলাম গ্রহণের ফলে গোত্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণ এবং আর বহুবিধ কারণে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বলে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মন্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে ।

খ. "হিন্দুগণ উচ্চ পদের চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়েছিল–" –অন্যান্য ঐতিহাসিকদের প্রণীত গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জালাল-উদ্-দীন মুহম্মদ শাহ্-এর আমলের বৃহস্পতি মিশ্র ও তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ, সুলতান বারবক শাহ্-এর আমলের মালাধর বসু ও কেদার রায়, সুলতান হোসেন শাহ্-এর আমলের রূপ, সনাতন, জীব, কেশব ছত্রী, রামচন্দ্র খান, যশোরাজ খান, দামোদর, জগাই-মাধাই, সম্রাট আকবর-এর আমলের মানসিংহ, টোডরমল– এরা সকলেই সরকারি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে লেখা একটি গ্রন্থে সনাতন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে তিনি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্-এর "মহামন্ত্রী" ছিলেন ।

গ. "হিন্দু জনসাধারণ "জিজিয়া" কর প্রদানে বাধ্য ছিল এবং মুসলমানের কাছ থেকে আদৌ "জাকাত" আদায় কর হত কি-না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে–" – এই দুই শ্রেণীর কর আদায় সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর এহেন অভিমত তাঁর একটি বিশেষ প্রবণতার পরিচয় প্রদান করে । সম্ভবত রমেশচন্দ্র মজুমদার ধরে রেখেছেন যে, মুসলিম শাসনের অর্থই হচ্ছে হিন্দুর উপর অত্যাচার । তাই অত্যাচারী শাসকগণ "জিজিয়া" কর আদায়ের মধ্য দিয়েও হিন্দুর উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন এবং মুসলমান প্রজাদেরকে "জাকাত" প্রদান থেকে রেহাই দিয়ে স্বধর্মপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন । এ বক্তব্য আমাদেরকে এই ধারণাই প্রদান করে যে, ইতিহাস রচনার নামে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রকৃতপক্ষে তাঁর কিছু সযত্ন-লালিত পূর্ব-ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন ।

ঘ. "বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না–" – "অন্য কোনো' প্রভাব বলতে রমেশচন্দ্র মজুমদার কী বুঝাতে চেয়েছেন, তা জানবার উপায় নেই । আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই । আরবি-ফারসি শব্দ ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে যে ভাষার প্রসাদগুণ বেড়ে যায়, তার প্রমাণ রয়েছে ভারতচন্দ্র আর মোহিতলাল মজুমদার রচিত কবিতায়– কাজী নজরুল ইসলাম-এর নাম আর নাই-বা উল্লেখ করলাম ।

ঙ. "হিন্দুর সাহিত্য, সংস্কৃত থেকে এবং মুসলমানের সাহিত্য, ফারসী থেকে প্রেরণা পেয়েছে–" – অথচ আমরা জানি যে, বিখ্যাত কবি সাবিরিদ খান রচিত "বিদ্যা-সুন্দর", মহাকবি আলাওল রচিত "পদ্মাবতী", কবি দৌলত কাজী রচিত "সতী-ময়না" ও "লোর-চন্দ্রানী" –ইত্যাদি গ্রন্থ ফারসি সাহিত্য অবলম্বনে রচিত হয়নি– ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য থেকেই এই গ্রন্থগুলো রূপরেখা পেয়েছে ।

চ. "মুসলমান শাসকদের নিয়োগকৃত সুবাদারগণ অবাঙ্গালী ছিলেন বলে এদেশের টাকা নিয়ে নিজেদের দেশে চলে যেতেন–" – রমেশচন্দ্র মজুমদার বোধ হয় লক্ষ্য করেননি যে, তাঁর বর্ণিত আমলে এমন একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে প্রথায় আওতায় রাজ্যকর্মচারীগণ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলে, বা ইস্তফা দিলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে প্রাদেশিক সরকার তাদের ধনসম্পত্তির হিসাবনিকাশ নিয়ে সেই সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অধিগ্রহণ করে নিত । মোগল রাজকর্মচারীগণ সে কারণে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করার পরিবর্তে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে এদেশের টাকা এদেশেই ব্যয় করতে বাধ্য হতেন ।

ছ. "মুর্শিদ কুলি খাঁ-র আমলে হিন্দু জমিদারদের উদ্ভব হয়–" – এ মন্তব্যে মনে হবে যে জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি বোধ হয় নিতান্ত আকস্মিক একটি ঘটনা । অথচ আমরা প্রাক্-মোগল যুগেও একটি ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজের সন্ধান পাই । আবুল ফজল তাঁর "আইন-এ-আকবরী"-গ্রন্থে কিছু সংখ্যক কায়স্থ জমিদারের উল্লেখ করেছেন ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর সহযোগী লেখক এই গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের কতগুলো শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন । এঁরা বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি, রমেশচন্দ্র মজুমদার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত– কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক ও সহযোগী লেখক ইতিহাসের দর্শন যথাযথ অনুসরণ না করায় আমরা অত্যন্ত আশাহত হয়েছি– আমরা আশা করছি আগামী দিনের ইতিহাসচর্চাকে আরও শাণিত ও বেগবান করে তোলার জন্য বিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসচর্চার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হবে ।

চার

কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে যা করেছেন, সেটা হচ্ছে সাহিত্যসমালোচনায় সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতা । এ ধরনের ঘটনা বারে বারেই ঘটেছে, এখনও ঘটছে । এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-র মূল্যায়ন তুলে ধরছি । তিনি লিখেছেন–

"দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সুকুমার সেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত ও সাহিত্যসমালোচক। তিনি তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"-এর পঞ্চম খণ্ডে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলেছেনও যে, "নিরপেক্ষ থাকিতে সর্বদা সতর্ক থাকিয়াছি", তাঁর বইতে নজরুলের সমসাময়িক কবিদের নিয়ে যেখানে পর্যালোচনা আছে সেই অধ্যায়টির নাম "কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি"; কোনো পাঠক যদি এই নামকরণে নজরুলের কণ্ঠ শুনতে পান তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলবে না। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে তা মোটেই শুনতে পাননি; যে-জন্য তাঁর আলোচনায় মোহিতলাল মজুমদারের জন্য বরাদ্দ থাকে ৮.৫ পাতা, বুদ্ধদেব বসু-র জন্য ৬.৫ পাতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্য ৪ পাতা, কিন্তু নজরুল পান মাত্র ৩ পাতা। সেই তিন পাতাতেই আমরা জানতে পারি যে, নজরুল মেসোপটেমিয়া গিয়ে একজন মৌলবীর দেখা পেয়েছিলেন, যার কাছে তিনি ফার্সি শেখেন, এবং "এখান হইতেই নজরুলের কবি জীবনের উন্মেষ শুরু হইল।" আমরা আরো জানতে পারি যে, "নজরুলের কবিতা সত্য অর্থে সাময়িক কবিতা", এবং নজরুল দারুণভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবিত, তাঁর "অগ্নিবীণা" নামটিও রবীন্দ্রনাথের গান থেকে নেওয়া। জানা যায় যে, নজরুল সম্পাদিত অর্ধসাপ্তাহিক "ধূমকেতু" পত্রিকাটি আসলে ছিল পাক্ষিক, এবং পত্রিকার "মটো" ছিল রবীন্দ্রনাথের কয় ছত্রের বাণী, তিন পাতার ওই আলোচনায় যে ছত্রকয়টির সবটাই যত্নের সঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম তবু স্থান পেয়েছেন, জসীমউদ্‌দীনকে খুঁজে পেতে হলে পঞ্চাশ জনের এক তালিকার মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়, তবে ভুল বানানে। একই তালিকায় কাজী কাদের নেওয়াজও রয়েছেন, তবে 'কাদের নওয়াজ' হিসাবে; আছেন বন্দে আলী মিয়াও। তবে কেউই আলোচিত হননি, ঠেলেঠুলে কোন মতে তালিকাভুক্ত হয়েছেন মাত্র।"

মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের বানান বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যাবতীয় কৃতবিদ্য বিশিষ্ট পণ্ডিতবৃন্দ– কিন্তু আমরা অন্তত ইতিহাসবিদদের, যাদের ব্রত সত্য উদ্‌ঘাটন করা, তাদের কাছ থেকে সামান্য সততা আশা করি । কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ইতিহাসের দর্শন অনুসরণে ব্যর্থ ঐতিহাসিকগণ চরমভাবে আশাহত করেছেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে লিখেছেন–

"মুসলমানদের নামের বানান নিয়ে সমস্যাটি এখনো কাটে নি, এত যুগ পরেও অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাস বইতে ফজলুল হক অবিচল চিত্তে "ফজলল হক" রয়ে গেছেন; হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী-র রাজনৈতিক পরিচিতিও খাটো নয়, তবু তিনিও পশ্চিমবঙ্গের বইপত্রে এখনো "সুরাবর্দি" বলেই পরিচিত– অমলেশ ত্রিপাঠীর লেখাতে তো অবশ্যই, এমনকি বামপন্থী জ্যোতি বসু-র "যতদূর মনে পড়ে" এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়ের "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা", পশ্চিমবঙ্গবাসী হোসেনুর রহমানের "ধর্ম, দ্বন্দ্ব, জাতীয়তাবাদ" বইতেও ওই বানান-ই ব্যবহার করা হয়েছে। এসব ঘটনা ছোট মনে হতে পারে কিন্তু তাৎপর্যবিহীন নয়।"

[সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি; নতুন দিগন্ত; চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা; এপ্রিল-জুন-২০০৬; ৬৬ পৃষ্ঠা]

ইতিহাসের দর্শন, উপনিবেশের বাসনা

ফ য়ে জ আ ল ম

আমরা আজ ইতিহাস বলে যা পড়ি তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে আছে দখলদারের বাসনা। সাধারণ প্রজাদের মেরে-কেটে, ভয় দেখিয়ে রাজ্য বানানো কিংবা পরের রাজ্য দখল করার বয়ান দখল করে নিয়েছে ইতিহাসের বেশিরভাগ পাতা। ইউরোপ, আরব বা ভারতের ইতিহাস যাই হোক-না কেন, ওর পরতে পরতে লেখা আছে রাজা-বাদশা, উজির-নাজির-সেনাপতিদের দাপট আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কাহিনী। কুরুক্ষেত্র বা পানিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়েছে ওয়াটারলুর যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ আর রাজ্য দখলের গল্প বাদ দিলে প্রচলিত ইতিহাসের কীই-বা থাকে!

আগেরকালের রাজা-বাদশারা পরের রাজ্য দখলের অভিযানে সঙ্গে নিতেন যুদ্ধের বয়ান লেখকদের। তারা মালিকের কীর্তির বিবরণ লিখে রাখতেন সন তারিখ উল্লেখ করে। সেই বিবরণে কল্পনার অনেক রঙ লাগত, মিথ্যার বেসাতি হত, প্রতিপক্ষের মহত্ত্ব চেপে যাওয়া হত। এইসব কথা আমরা জেনে গেছি বলে ওগুলোকে ইতিহাসের মূল্য দিই না।

এখন যা তথাকথিত আধুনিক 'বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস' হিসাবে চালু আছে তার সবটাও সত্য নয়। আর এই ইতিহাস ঘাঁটলেও দেখা যায় 'যে-বস্তুর' প্রতি আধুনিক ইতিহাসের 'নিষ্ঠা' সেই বস্তু হচ্ছে শক্তিমত্তা ও জবরদখলের মনোবৃত্তি। নিরপেক্ষতা ওখানে কথার কথা মাত্র। আধুনিক ইতিহাসও বিজিত জাতির লেখা বয়ান। সেখানে যুদ্ধ, দেশ দখল ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথাই লেখা হয়েছে সবথেকে যত্ন করে। আর যা আছে তা-ও শৌর্যবীর্যময় সম্রাট-বাদশাহদেরই একরকম গুণকীর্তন। মোগল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনায় কর আদায় পদ্ধতি আর এর সাথে যুক্ত রাজপুরুষদের কথা সব থেকে গুরুত্ব পায়। সাংস্কৃতিক আলোচনায় ঘুরে-ফিরে আসে রাজরাজড়াদের প্রাসাদ, হেরেমখানা, মসজিদ-মন্দিরের কথা। কুড়ি শতকে এসে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনারও সূচনা হয়েছে। কিন্তু ওখানেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল প্রবণতাগুলো। তাই এইসব ইতিহাসও কোনো দিক থেকে অ-রাজনৈতিক থাকেনি।

ইতিহাস কেন এবং কী করে জবরদখল আর উপনিবেশ সৃষ্টির বয়ান হয়ে উঠল আর কেনই-বা ইতিহাস রচনার এই ধারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও আধিপত্য করতে পারল তা বোঝার জন্য ইউরোপের কয়েকটি দেশের উপনিবেশী মনোবৃত্তির ব্যাপারটাকে আমলে আনতে হবে। পনর শতক থেকে আরম্ভ করে বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল যখন একের পর এক দেশ দখল করে উপনিবেশ বানাচ্ছে সে সময়ই তাদের লেখকদের হাতে সৃষ্টি হচ্ছে আধুনিক ইতিহাসের একেকটি অধ্যায়। ওগুলোয় দখলদারের শক্তিমত্তা বর্ণিত হয়েছে মানবিক মহত্ত্ব ও অমর কীর্তির বিষয় হিসাবে। উপনিবেশিত জাতির পরাজয় ও দুর্ভোগ তাদের অক্ষমতা, শক্তিহীনতা, অযোগ্যতার প্রমাণ মাত্র।

পরাজিত মানুষদের ইতিহাস লেখা হয় দখলদারের কলমে। সেই ইতিহাসে নীতিহীন বেডাগিরি গৌরবের উৎস। যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠনে পটু বহু দুর্দম সেনাপতিকে ইতিহাস অমর করে রেখেছে। চেঙ্গিস খান, শশাঙ্ক, আলেকজান্ডার, তৈমুর লঙ এমন কত মানুষ ইতিহাসে বিখ্যাত। এইসব ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে হয় অন্যের জায়গাজমি দখল করার মধ্যে অন্যায় নেই। বরং যে যত বেশি রাজ্য দখল করতে পেরেছে সেই তত বড়। যে জাতির যত বেশি উপনিবেশ তারা তত বেশি উন্নত। এইরকম যে ইতিহাস তার দর্শন আর সতের-আঠারো শতকের ইউরোপের জাতিগুলোর উপনিবেশ তৈরির বাসনার সম্পর্কটা খুবই নিবিড়।

উপনিবেশের সূচনা হয়েছে সামরিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্য দখলদাররা নানা রকম অ-সামরিক কৌশল করেছে। যেমন প্রজাদের বাগে আনা আর বশে রাখার জন্য তাদের মনের জোর নষ্ট করে দেয়ার দরকার ছিল। যাতে তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। সে জন্য উপনিবেশের প্রজাদেরকে বিশ্বাস করাতে হয়েছে যে, দখলদাররাই মানুষ হিসাবে উত্তম, জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রের জোরেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী; তাই ওরা এ দেশ শাসনেরও যোগ্য। আর প্রজার জাত পূর্বপুরুষদের কাল থেকেই মানুষ হিসাবে অযোগ্য ছিল। এ কাজের জন্য যে সাংস্কৃতিক যোগালটি কাজে লাগানো হয়েছে তার নাম ইতিহাস। দখলদাররা নিজেদের মতো করে ইতিহাস লিখে তা পড়িয়েছে প্রজাদেরকে । সে ইতিহাসে দেখানো হয়েছে শক্তিমত্তাই যোগ্যতা ও বড়ত্বের মাপকাঠি। বলা হয়েছে, উপনিবেশিত জাতি দুর্বল, জ্ঞানহীন; ওরা তাই কোনোকালে কোনো গৌরবময় কীর্তির জন্ম দিতে পারে নাই। তাদের গৌরবের ইতিহাস নাই।

এই মনোবৃত্তির চমৎকার একটা নমুনা দিতে পারি বৃটিশ ভারতে কর্মরত ইংরেজ মেকলের লেখা থেকে। লর্ড ব্যাবিংটন মেকলে হলেন বাংলাসহ গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষদের ওপর ইংরেজি শিক্ষা চাপিয়ে দেয়ার কুকর্মের মূল কারিগর। তিনি ভারতীয়দের লেখা বইপুস্তক গাঁজাখুরি গালগল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার মনে হয়েছে ভারতীয়দের ইতিহাস 'তিরিশ ফুট উঁচু রাজাদের তিরিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করার কাহিনী'তে ভরা।

ভারতের যে কোনো শিক্ষিত মানুষই বুঝবেন মেকলে যাকে ভারতের ইতিহাস বলেছেন তা আসলে গণমানুষের কিস্‌সার পরিবর্তিত রূপ– রামায়ণ-মহাভারত বা এই জাতীয় পুরাকাহিনী। মেকলে বুঝতেই পারেননি যে এই সব কাহিনী ইতিহাস নয়। তার নিজের কিংবা অন্যান্য বৃটিশ অথবা আধুনিক ভারতীয়দের লেখায় মেকলের এই অজ্ঞতাকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমন অজ্ঞতাসুলভ মন্তব্য যিনি করতে পারেন সেই মেকলের মতো লোকেরাই হয়ে উঠেন ভারতের ইতিহাস বা শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ভারতীয়রা হয় তার অনুকারী পাঠক না হয় নকলনবিস। উপনিবেশিত প্রজাদের মনে দখলদারের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম করার জন্যই এত আয়োজন। আসলে এই কাজটা করা হয়েছে দখলদার গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে রচিত বইপত্র আর তাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে। এইগুলো উপনিবেশ পোক্ত করার উদ্যোগ, উপনিবেশিত জাতির মনোবল ধ্বংসের যোগাল। এ উদ্দেশ্য নিয়েই দখলদার তার বীরত্বের ইতিহাস বয়ান করেছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর কাছে। সেখানে লেখা হয়েছে স্থানীয়দের পরাজয় আর পতনের বয়ান, তাদের গৌরবহীনতার কাহিনী। এইভাবে আধুনিক ইতিহাসে শক্তিমত্তা আর জবরদখলের যোগ্যতা পরিণত হয়েছে জাতির

মর্যাদার প্রতীকে। ফলে উপনিবেশ চলাকালে ইউরোপীয় ধারার অনুকরণে ইতিহাস রচনার যে-ছাঁচ সৃষ্টি হয় তা দখলদার গোষ্ঠীর বীরত্বগাঁথা, আর পদানত জনগোষ্ঠীর পরাজয় ও দুর্দশার বিবরণ। বাঙালির ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

একটা সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ লেখা হত বিভিন্ন জনের হাতে। ফলে ঘটনার বিবরণে হেরফের হত, প্রকাশ হয়ে থাকত একই ঘটনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিচার-বিশ্লেষণ। মানবিক উপলব্ধির এই বৈচিত্র্য জরুরি ছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে দেখার এই স্বাভাবিক মানবিক প্রক্রিয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে উপনিবেশিক ইতিহাসকারেরা। উপনিবেশ জাঁকিয়ে বসার পর তারাই একাধারে প্রজাদের প্রতিপালক-শিক্ষক-শাসক-পথপ্রদর্শকের পদ দখল করে নেয়। নিজেদের লেখা ইতিহাস যাতে প্রজার জাতের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ পড়ে এবং বিশ্বাস করে তার জন্য 'সত্য ইতিহাস' ও 'বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস' কথাগুলো চালু করে দিয়ে প্রচার করা হয় কেবল তাদের লেখা ইতিহাসই সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। বাকিসব মিথ্যা, কিংবদন্তি, গাঁজাখুরি গল্প।

সে কালে মুদ্রণ প্রক্রিয়ার বিকাশ এবং গণশিক্ষার পদ্ধতি বৃটিশদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজ করে দিয়েছিল। মধ্যযুগে পণ্ডিতি শিক্ষার স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল গুরুভিত্তিক। অর্থাৎ একজন বা অল্প কয়েকজন শিষ্য গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। ফলে তখন জ্ঞানের ঘরানা তৈরি হত। একজন বা কয়েকজন পণ্ডিতের পক্ষে বড়জোর একটা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত। সারা দেশের মানুষদের মধ্যে কোনো মত বা মতবাদ ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু করার পর একজনের লেখা বইপত্র দেশব্যাপী সকল শিক্ষার্থীকে পড়ানোর পথ সুগম হয়। অল্প কয়েকজনের লেখা গুটিকয় ইতিহাসগ্রন্থ সকল মানুষের পাঠযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার পথে কোনো সমস্যাই থাকে না। এইসঙ্গে বৃটিশের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কাজে লাগিয়ে তাদের লেখা ইতিহাসের 'নিরপেক্ষতা', 'সত্যতা' ও 'বস্তুনিষ্ঠতা' সমাজে গেলানো সম্ভব হয়ে উঠে। এই প্রক্রিয়া ছাপিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় অতীত বিচারের বিচিত্র দৃষ্টিকোণের ব্যবহার। কেবল এক ধরনের বিবরণই টিকে থাকে, অন্যগুলোকে বাতিল করে দেয়া হয় 'মিথ্যা' ও বস্তুনিষ্ঠতাহীন' কাহিনী বলে। ফলে ইতিহাস রচনার বৃটিশ ছাঁচ আমাদের জ্ঞানচর্চায় পাকাপাকি জায়গা করে নেয়। প্রজাদের একটা অংশ শিক্ষিত হয়ে এই ছাঁচেই ইতিহাস রচনা করে। উনিশ শতকের শেষে এই দেশে যখন বৃটিশ উপনিবেশ পোক্ত হয়ে বসেছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আফসোস করে লিখেছিলেন যে, বাঙালির ইতিহাস নাই। ইতিহাস নাই বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস নাই। ইতিহাস রচনার ইংরেজি ছাঁচ মোতাবেক বীরত্বের কাহিনী না থাকা আর ইতিহাস না থাকা প্রায় এক কথা। এ-ধারায় চিন্তা করতে গিয়েই বঙ্কিম বিলাপ করেছিলেন।

বাংলাদেশে মধ্যএশীয় মুসলমানদের অভিযান আর দখল কায়েমের বিবরণ আছে বহিরাগত মুসলিম লেখকদের বইপত্রে। গণমানুষ ও তাদের জীবন-যাপনের ধরন সম্পর্কে নানা রকম তথ্য আছে। এ ছাড়া আগের কালের বইপত্র ও মৌখিক সাহিত্যেও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জীবনধারণের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এইসব সূত্র আর জনশ্রুতি মিলিয়ে স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান প্রমুখ দখলদার এ দেশের ইতিহাসের বই লিখেছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু বা আর কারো বিবেচনায় সেগুলো ইতিহাস বলে মনে হয়নি। কারণ ওগুলোয় মধ্যএশীয় মুসলমানদের বীরত্বের কথা আছে, বাঙালি হিন্দুর বেডাগিরির কথা নাই। যুদ্ধজয় বা দেশ দখলের কথা নাই। বীরত্বের কথা ছাড়া যে-ইতিহাস– উপনিবেশী জ্ঞানচর্চার মানদণ্ডে তা অমর্যাদার ইতিহাস। বঙ্কিমবাবু তাই বাঙালি জাতির মর্যাদার ইতিহাস লেখার উপায় বাৎলাতে গিয়ে জর্জ কাম্বেলের বরাত দিয়ে লিখেছেন:

> . . . বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই। . . . যে জাতি মিথিলা, মগধ. কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখনো ক্ষুদ্র জাতি ছিল না। (বঙ্কিম, ১৯৯১; ৩৩১)

উপনিবেশের প্রজা বঙ্কিম বাঙালির মর্যাদা খুঁজেছেন তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতার মধ্যে, যদিও এইসব কাহিনীর কোনোটারই প্রমাণসূত্র মিলে নাই। কিন্তু ইংরেজ লেখকদের লেখায় বাঙালি হিন্দুর বলহীনতার কথা, উপনিবেশিকতার কথা প্রচারিত হওয়ায় বঙ্কিমবাবু তা খণ্ডনের জন্য পুরাকাহিনীর আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেন নাই।

বঙ্কিমের বক্তব্য থেকে আমরা যা পরিষ্কার বুঝতে পারি তা এই যে, উপনিবেশিত জাতিও দখলদারিত্ব বা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার শক্তি-সামর্থ্যকেই তার বড়ত্ব প্রমাণের মাপকাঠি মনে করে। বঙ্কিমের বিবেচনায় দখলদার বৃটিশরা বাঙালি হিন্দুর পরাজয়ের কথা লিখে তাদের মর্যাদাহানি করেছে। তাই বঙ্কিম তার জবাব দিয়েছেন বাঙালি হিন্দুর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতার পুরাকাহিনী উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় উপনিবেশকেরা এই দ্বৈতাবর্তের প্রবণতা রুইয়ে দিয়েছে আধুনিক ইতিহাসের গোড়ায়। উপনিবেশের মানুষেরাও সেই ছাঁচ থেকে বেরুতে পারেনি। তারা দখলদারের ইতিহাসের জবাব দিয়েছে পূর্ব-পুরুষের বীরত্বের কাহিনী তুলে ধরে। এই প্রবণতা বাঙালির ইতিহাসে জন্ম দিয়েছে আরো ভয়ানক এক বিষবৃক্ষের। বঙ্কিমের মতো লেখকদের লেখায় বাঙালি হিন্দুর বীরত্বগাঁথা তুলে ধরার

প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমান ঐতিহাসিক আশ্রয় নিয়েছে মোগল-পাঠানের শৌর্যে-বীর্যে। বাঙালির ইতিহাসকে পরিণত হয়েছে হিন্দু আর মুসলমানের পাল্টাপাল্টি বেডাগিরির কাহিনীতে।

মুসলমানদের হাত থেকে এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল বলে ইংরেজরা মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ছিল, যতটা-না ছিল হিন্দুদের ব্যাপারে। তাছাড়া, মুসলিম শাসকদের সময় থেকেই সন তারিখযুক্ত প্রশাসনিক বিবরণ লিখিত হয়ে আসছিল। জিয়াউদ্দিন বারানীর *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, মীনহায-ই-সিরাজের *তবকাত-ই-নাসিরী*, মির্জা নাথানের *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ীর *সিয়ারুল মুতাখখেরিন* প্রভৃতি ফারসি গ্রন্থ এ দেশীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এইসব কারণে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে মিশনারিদের হাতে যখন এদেশের ইতিহাসের বিবরণ লেখা শুরু হয় তখন বহিরাগত মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের কথাই সামনে চলে আসে। বৌদ্ধ পালবংশ ও হিন্দু সেনবংশের বিস্তৃত ইতিহাস উদ্ধার হয় আরো পরে।

প্রায় কাছাকছি সময়ে ইংরেজদের অনুগ্রহের ছায়ায় বেড়ে উঠছিল কলিকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসার পর এদের মধ্যে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা জায়গা করে নিতে থাকে। ইউরোপের রেনেসাঁর অনুকরণে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে আকৃষ্ট হয় নয়া হিন্দু মধ্যবিত্ত। প্রথমদিকে সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরে এরা। মৌর্যবংশ, গুপ্ত শাসকবৃন্দ, পালবংশ, সেনবংশ প্রভৃতি শাসকদের বীর্যবত্তার বিবরণ আবিস্কৃত হওয়ার পর ইংরেজদের লিখিত ইতিহাসের উল্টা দিকে দাঁড়ানোর মাটি খুঁজে পেয়ে যায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত লেখক-শিল্পীরা। কারণ ইংরেজের ইতিহাসে মুসলমানের শক্তিমত্তার কথা লেখা হয়েছে। তাই মুসলমানের শক্তিমত্তার বিপরীতে প্রাচীনকালের হিন্দু শাসকদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী লেখা হয়। ইতিহাস হয়ে উঠে হিন্দু ও মুসলমানের জ্ঞানতাত্ত্বিক রণখেলা। একটামাত্র প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করব–।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের লেখায় বহিরাগত হিন্দু শাসক কর্ণাটকের সেনেরা খুব শৌর্যবীর্যময়, সুশাসক। রমেশ বাবুর মতে: "বিজয় সেনের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বহুদিন পর একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিয়াছিল।" (রমেশচন্দ্র, ১৯৯৮; ১০৭) অন্যদিকে সেনদের হটিয়ে যিনি ক্ষমতায় আসেন সেই বখতিয়ার খিলজি তাদের বিবেচনায় বহিরাগত তুর্কি লুণ্ঠনকারী। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকদের প্রতিক্রিয়া নিখুঁত, উপনিবেশী ইতিহাসের ছাঁচে ঢালাই করা। যেমন, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখেছেন: জনগণ বহিরাগত সেন শাসন উচ্ছেদকারী বখতিয়ার খিলজিকে আরেক বহিরাগত উৎপীড়ক হিসাবে দেখেননি; বরং এই মুসলিম বিজেতার মাঝে তারা দেখেছেন তাদের মুক্তিদাতার প্রতিচ্ছবি।" (মান্নান, ২০০৬;১০৪)।

এভাবে কখনো-বা নির্বাচিত কিছু ঘটনার বিবরণ ও তার মতলবী বিশ্লেষণকে বলা হয় ইতিহাস। কখনো পুরাণের বিবরণ, আবার কখনো-বা কল্পনাশক্তির সূক্ষ্ম মিশেল দেয়া তথাকথিত 'সত্য বয়ান' প্রচারিত হয় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নামে। এই ইতিহাস খাড়া দুইভাগে ভাগ হয়ে আছে। সেই ইতিহাসের জমিনে খুঁটি গেড়ে জ্ঞানচর্চার অন্য জায়গাগুলোতেও হানা দেয়া হয়। কিন্তু উপনিবেশী বাসনার দর্শন আর সেইসূত্রে হিন্দু-মুসলিম দ্বৈততার যে-ছাঁচ তৈরি হয়েছিল বৃটিশদের হাতে তার কবল থেকে আমাদের ইতিহাস আজো বেরুতে পারেনি।

সহায়ক বইপত্র

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস -প্রথম খণ্ড; এম সরকার পাবলিশিং এন্ড কোং, কলিকাতা, ২০০৬-২০০৭।

২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ; দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০২।

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা; বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, ২০০৬।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড , সম্পা: সুবোধ চক্রবর্তী; কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৯৯১।

৫. পুলক চন্দ, ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, ; লেখনি প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৯৬।

৬. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কর্তৃক অনূদিত); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২।

প্র ব ন্ধ

ইতিহাসের দর্শন : একজন পাঠকের অবস্থান থেকে

নূ র মো হা ম্ম দ

জানা মতে, 'ইতিহাসের দর্শন'-এর কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই। কিন্তু পাঠক হিসেবে একটা সমস্যা অবশ্যই থাকে (জেনেছি যে, এই সংখ্যাটি শুধু মাত্র ঐতিহাসিক, গবেষক ও তাত্ত্বিকদের জন্য নির্দিষ্ট নয়)। যেমন ধরা যাক; ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ, পলাশি, ঔপনিবেশিকতা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষক সংগ্রাম, রেনেসাঁ, জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ, ভারতের জাতীয় যুদ্ধ (১৮৫৭), ১৯০৫, কংগ্রেস-মুসলিমলীগ, সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, ক্ষমতা হস্তান্তর (১৯৪৭) ইত্যাদি বিষয়গুলো বহুল আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি নিয়মিত কিন্তু ঐতিহাসিক, গবেষক বা তাত্ত্বিকরা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রায়শ ভিন্ন ভিন্ন এমনকি বিপরীত সিদ্ধান্ত টেনেই চলেছেন। দু'শ বায়ান্ন বছর আগে থেকে পলাশী নিয়ে যে সব মিথ্যাচারের শুরু তার অনেকগুলো বিষয় আজও বহাল আছে। শুধু জটিলতা বাড়ানো হচ্ছে মাত্র। দেখা যাচ্ছে তথ্য সন্নিবেশের বিপুলতা বাড়লেও পুরনো বির্তকগুলোর পক্ষ-বিপক্ষতা ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও প্রায় একইভাবে থেকেই যাচ্ছে। এ-ও দেখা যাচ্ছে, অনেক ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাদাতা ইতিহাসবিদদের যুক্তিতর্ক পেশের পেশীবহুল যোগ্যতাকে ঐতিহাসিকের তথ্য বিশ্লেষণের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে পরাভূত করার কাজে লাগানো হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে পাঠক সমস্যায় পড়ে যেতে পারে।

ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে বলা যায় যেমন 'ইতিহাস' তেমনি 'দর্শন'– কোনোটির বিষয়ে আসলে সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই- যেমন নেই 'ইতিহাসের দর্শন' সম্পর্কে। যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি, প্রযুক্তি বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে যেন অতি দ্রুততার সাথে নতুন নতুন সব বক্তব্য (তত্ত্ব) এমনভাবে আছড়ে পড়ছে যে, সেই সব বক্তব্যের গ্রহণ-বর্জন অথবা ধাতস্থ প্রক্রিয়া অন্তত নির্দিষ্ট মাত্রায় বোধগম্য না করে আগ্রহী পাঠক আর এগুতে পারছেন না। ফলে পাঠকের প্রস্তুতির জন্য ঐতিহাসিকদের দায় থাকছে কিনা সে প্রশ্ন আদৌ বিবেচনাযোগ্য আছে বলে মনে হয় না। এবং ইতিহাসের সাথে রাজনীতির যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে তা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়।

'সংজ্ঞা' সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বসম্মত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে দেশটির রয়েছে দু'শো বছরের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা – এখনো সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত, – এবং যোগ হয়েছে এখনকার প্রায় প্রত্যক্ষ (কয়েক দশক ধরে) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য/আগ্রাসন ও সর্ব ক্ষেত্রে যার এমনভাবে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ যে এমনকি সর্বোচ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর এই সব প্রশ্নে স্পর্শকাতর বিভাগগুলোতেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি, – পাঠ্যসূচি প্রণয়নকারীরা সরকার, শ্রেণী, রাষ্ট্র, ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুগত/ মেরুদণ্ডহীনতার অবস্থায় থাকলে এর বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থ সচেতনতা, সংঘবদ্ধ হওয়া ও লড়াইয়ের প্রশ্নকে বানচাল করার জন্য যখন দেশী-বিদেশী অর্থপুষ্ট আয়েশে তৈরি করা বিচিত্র সব তাত্ত্বিক খড়্গ মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে সর্বদা সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করতে থাকে তখন সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার কারণ দেখা দেয়।

সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং যত দিন দ্বন্দ্ব সংঘাত তত দিন বিভিন্ন প্রবণতার সক্রিয়তাকে মান্যতা দিয়েও বলা যাবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে পক্ষতা প্রশ্নে ক্রমাগত রহস্যময় শব্দগুচ্ছের আড়ালে থাকার অপচেষ্টাকে অনুমোদন দেয়া যায় না। ঐতিহাসিকরা যখন স্পষ্ট হতে অস্বীকার করেন তখন রাজনীতিবিদ ও এমনকি তাদের ক্যাডাররা ঘাড়ে হাত রাখে।

অনেক বছর আগের কথা, একজন বেশ বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন, আমার বিশ্বাস সাধারণ একজন তত্ত্বীয় দার্শনিকের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটালেও (অন্তত, ছুটির সময়) জানা যাবে না যে তিনি ভাববাদী না বাস্তববাদী, কিন্তু আমার মনে হয় না কোনো মার্কসবাদীর সঙ্গে একদিন মাত্র কাটালেও তাঁর মতবাদ কি তা অজানা থাকবে। জে. বি. (হ্যালডেন, বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন, ১৯৮৬, পৃ. ১) ১৯৩৮ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক দর্শনের উপর প্রদত্ত বক্তৃতামালায় হ্যালডেন মন্তব্যটি করেন।

এখন আর সে সময় নেই। এর অর্থ এটা নয় যে আমি হ্যালডেনের মন্তব্যকে খাটো করে দেখছি। তবে আমার মনে হয় একজন তত্ত্বীয় উত্তর-আধুনিকতাবাদী বা তত্ত্বীয় উত্তর- উপনিবেশবাদী এমনকি একজন তত্ত্বীয় সাবঅলটার্নের সাথে এক দিনের কম সময় কাটালে এবং যদি সেটি ছুটির দিন না-ও হয় তবে তিনি যে কোনো সুযোগে জানিয়ে দেবেন

শুধু যে মার্কসবাদ আগা-গোড়া একটা যাচ্ছে তাই আবর্জনা, তাই নয় খোদ ইতিহাস বলেই তো কিছু নেই। আর ইতিহাস বলেই যদি কিছু না থাকে তবে তার দর্শনের প্রশ্ন আসে কী ভাবে! অবশ্য একজন তত্ত্বীয় সাবঅলটার্ন দাবি করবেন; আমাদের বিষয়বস্তুর এলাকা পূর্বের অবস্থানে থেমে নেই– প্রসারিত হয়েই চলেছে এবং প্রচলিত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান-চর্চার অধিকাংশ রীতি নীতি-পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকাশক্তি। (পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রজা ও তন্ত্র, ২০০৫, পৃ. ৫৭, ৬৩) তবে দেখা যাচ্ছে প্রসারিত বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও নিরন্তর বিরোধিতা প্রকল্প গাটছড়া বাঁধছে উত্তর-আধুনিকতাবাদী ও উত্তর- ঔপনিবেশিকতাবাদীদের সাথে। বিশ্বের বিপুল জ্ঞানী ও তাত্ত্বিকরা এখন দল বেঁধেছেন অন্তত একটি প্রশ্নে: মার্কসবাদকে বাতিল কর। যদিও তারা জানে দেড়শ বছর ধরে এই চেষ্টা চলে আসছে এবং মার্কসবাদকে পরাজিত করা যায়নি তবুও তারা এখন আশাবাদী, ইতিহাসের শেষ যেহেতু উদারতাবাদ ও সংযত-সংহত পুঁজিবাদে সেজন্য সম্পূর্ণ নাকচ করতে হবে মার্কসবাদকে – সমাজতন্ত্রকে, আর ক্রিটিকাল এনগেজমেন্ট বা পুঁজিবাদের অগ্রহণযোগ্য দিকগুলোর নিরন্তর বিরোধিতা বজায় থাকবে।

এতে ঝামেলা বে–শ বেড়েছে। ইতিহাস চর্চার ঘরানা হিসেবে যারা পুরনো মার্কসবাদ-বিরোধী তাদের অনেকে হয়তো জানেনই না এই প্রশ্নে তাদের উত্তরসূরিরা সন্তোষের সাথে তাদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এবং সেই সাথে তাদের মতো পূর্বসূরিদেরও দৃশত ধোলাইয়েও পিছ-পা নন। সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী ইতিহাস-চর্চায় যারা আস্থাবান তাদের এখন কয়েক পর্বের দায় পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশে তাদের পারদর্শিতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। এর আরও একটি কারণও আছে, তা হল এ বিষয়ে অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আছেন তারা গত শতাব্দীর ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছেন সেটিও অনেক সময় বুঝা যায় না। অনেকে এই গর্বে আত্মহারা, ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে মার্কসবাদ যে সব নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তা জেনে সময় নষ্ট করে কী-ই বা লাভ। আমাদের চোখ তো অন্ধ নয়, প্রলয়ে কী-বা আসে যায়। এই ভাবে তারা হয়তো তাদের অজান্তেই মার্কসবাদকে দাফন করার পুরনো অপচেষ্টার নতুন সংস্করণের অপদার্থ সহায়ক শক্তি হিসেবে পরিণত হন। যে অবস্থান থেকেই বলা হোক না কেন 'ইতিহাস' গত হয়েছে, দাহক্রিয়া সম্পন্ন, তবে তা অবশ্যই মোকাবেলা করা যায়– তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জবাবে। এটি আসলে ইতিহাসেরই অন্তর্নিহিত সমস্যা। আর নতুন নতুন যে সব তত্ত্ব আসছে– আসবে তা সমাজেরই এক একটা পর্বেরই অনুরূপ বা সংকটজাত। যদিও মনে করি, সাংঘর্ষিক রূপে চলতে থাকে প্রধানত দুটি ধারাই।

ইতিহাসের মালমশলার এবং একই সাথে ইতিহাস নিয়তই তার বিপুল ব্যাপ্তি ঘটিয়ে চলেছে। জ্ঞানের প্রায় এমন কোনো শাখা নেই যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত।ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে মালমশলা ব্যবহার করি তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই ধরনের প্রধান দুটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতত্ত্বের আওতা থেকেই জন্ম নিয়েছে auxiliary Sciences যা ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সহায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। (মমতাজুর রহমান তরফদার, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, ১৯৯৫, পৃ. ২৩২) কিন্তু এই অনুসন্ধানও গ্রাহ্য করার মতো;

Since the end of the Second World War it is anthropology, rather than history, which has led the revolt against the mutual segregation of the two disciplines within the domain of South Asian Studies. Cohn was not the only rebel; he was one of a number of scholars whose writings showed unmistakable signs of a rapprochement in this respect (Ranajit Guha, 1996, P-viii)

Bernard S. Cohn - এর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী Over the last twenty-five years, there have been a number of efforts to bring together historians and anthropologists and to merge the approaches and methods of the two fields in a fruitful collaboration in teaching and research. This effort has at times been marked by success. But my impression after ten years as a student and practioner in both fields is that anthropologists and historians still stand far apart. (Cohn, Anthropologist among the Historians and other eassays, 1996, P. 1)

আমি গুহ বা Cohn-এর বক্তব্যের বিরোধিতা বা সমর্থন করার জন্য প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিনি যা বলার তা হল এই ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকা ঠিক হবে না। প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে প্রকৃতিতে ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন– এর প্রতিক্রিয়া সমাজজীবনের সর্বত্র। ইতিহাসের পরিধির মধ্যে প্রবেশ ও অনুপ্রবেশ অনেক সময়ই ঠাওর করা মুশকিল। বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় পর্বের ঔপনিবেশিকতা বা আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশ ও জ্বালানিসমৃদ্ধ দেশগুলো সহ প্রধানত তৃতীয় বিশ্বে লণ্ডভণ্ড চালাচ্ছে, সামরিক দখল অভিযানে প্রতিনিয়ত শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা (অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়ার কারণে) সহ ব্যাপক জনগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে (হত্যাযজ্ঞ) এবং যেখানে প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বিস্ময়কর এ ছাড়া যেখানে পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্বই বিপন্ন, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকের ভূমিকা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে তো অতীত, মধ্যকালীন অতীত ও সাম্প্রতিক

অতীত চলমান বর্তমানের ভেতর দিয়ে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে– ঐতিহাসিক তো সব রকম মালমশলাই পাচ্ছেন– ষোড়শ শতাব্দীর পাল তোলা জাহাজ থেকে সপ্তম নৌবহর এবং সর্বশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ভয়ানক ধরনের মারণাস্ত্র দিয়ে সাজানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বিশাল সব নৌবহর যা সারা পৃথিবীকেই হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তা তো সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকরাই পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছেন। ঐতিহাসিকরা যদি শুধু অতীত ব্যবসায়ী হন তাহলে আমাদের মতো গ্রাহকদের সটকে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিজের তরফে এই ধারণা বদ্ধমূল; ইতিহাস কাজে লাগে, লাগানো যায়– লাগানো উচিতও বটে। এবং এখানেই আসে ইতিহাসের দর্শনের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এখানে থেকেই। বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে সংযুক্ত থেকেও (বাধ্যবাধকতা আছে) বলা যায় আমাদের প্রধান ক্ষেত্রটি হওয়া ভালো 'দক্ষিণ এশিয়া'।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনো বড় সমস্যা আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই আমরা ঔপনিবেশিকতার ভূমিকাকে বাদ দিয়ে করতে পারি না। (বিপান চন্দ্র, আধুনিক ভারত, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ, ১৯৯৭, পৃ. ৬) মধ্যযুগ ও পলাশি থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর আমাদের ইতিহাস চর্চার ধমনিতে নিয়ত দাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নিয়ে প্রবহমান। দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রামে ইতিহাস-চর্চা এখনও প্রতিক্রিয়ার পক্ষেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে– একে উলটিয়ে দিতে হবে। সংঘবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এ কাজ অসম্ভব। এ হল বড় ধরনের সংগ্রাম। একে যত দিন তুচ্ছ করে চলা হবে ততদিন ইতিহাসের দায় ক্রমাগত সুদসহ বাড়তেই থাকবে। আমি নিশ্চিত, আজকের পরিস্থিতি দাবি করে ইতিহাসকে কাজে লাগানোর প্রশ্নে পক্ষালম্বনে দ্বিধাহীন হতে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে 'ইতিহাসের শেষ' দিয়েই আলোচনা শুরু করা যায়ঃ ফুকুয়ামার The end of history and the last man ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এর উপক্রমণিকায় বলেন, ১৯৮৯ সালে the national interest-এর গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় তিনি "The end of history ?" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তার ভাষায় এর মূল প্রতিপাদ্য হল; In it, I argued that a remarkable consensus concerning the legitimacy of liberal democracy as a system of government had emerged throughout the world over the past few years, as it conquered rival ideologies like hereditary monarchy, fascism, and most recently communism. More than that, however, I argued that liberal democracy may constitute the end point of mankind's ideological evolution and the final form of human government, and as such constituted the end of history, (Francis Fukuyama, The end of history and the last man, 1992, P-XI)

ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করে দেয়া ফুকুয়ামাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইতিহাস কিন্তু শেষ হয়ে গেল না– পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন হুমকি ধীরে কিন্তু শক্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল Variously branded from Islamic front. (সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম/সশস্ত্র সংগ্রাম ল্যাটিন আমেরিকা [প্রধানত] সহ বিশ্বব্যাপী চলছিল এবং চলছে শুধুমাত্র ইসলামী ফ্রন্ট থেকে নয়)। সাম্রাজ্যবাদীরা এই নতুন 'evil threat'-কে 'Islamic fundamentalism', 'radicalism' 'militancy' 'extremism', 'resurgence', 'Islamism', and 'Political Islam' বলে western media রাজনৈতিক পরিভাষায় (political parlance), আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনের কলিজার উপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, সারাবিশ্ব বিশেষ করে মার্কিনীদের হতবাক করে দিয়ে যে ভয়াবহ আক্রমণের শুরু তা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বব্যাপী।

With the end of the cold war, if Francis Fukuyama saw history buried under the rubble of the Berlin Wall and asked us to 'witness' not just the passing of a particular period of post-war history, but 'the end of history' as such, the endpoint of mankind's ideological evolution, he is squarely proved short-sighted and wrong within a mere decade or so. (Asim Roy, eds, islam in history and politics, 2006, P. 3)

ফুকুয়ামা কিন্তু তার উপরে বর্ণিত বক্তব্যেই থেমে থাকেননি। অর্থাৎ অসীম রায়ের বক্তব্যই ফুকুয়ামার সব ভাষ্যের শেষ উত্তর সেটাও ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই– সে দাবি অসীম রায় অবশ্য করেননি। ফুকুয়ামা ইতিহাসের দর্শ-সংক্রান্ত প্রশ্নে কান্ট, হেগেল ও মার্কসকে টহরাবৎংধষ যরংঃড়ৎু'র ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসেবে গণ্য করেছেন। এরা ইতিহাস যে একটা পর্বে শেষ হবে এই বিশেষ ইতিহাসতত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন। Kant suggested that history would have an end point, that is to say, a final purpose that was implied in man's current potentialities and which made the whole of history intelligible. ইত্যাদি। কান্টের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার ষাট বছর বয়সে, ১৭৮৪ সালে। প্রবন্ধটির নাম An Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View. যদিও প্রবন্ধটি ছিল মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার তবুও দেখা গেল ভবিষ্যতের জন্য এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে তা সক্ষম হল। তিনি মনে করেন তার বক্তব্যকে পূর্ণতা দিতে দরকার হবে এমন

একজন প্রতিভাধর দার্শনিকের যিনি একই সাথে হবেন একজন ঐতিহাসিকও বটে, who could assimilate the history of all times and all peoples into a meaningful whole. Hegel, like Kant, defined his project as the writing of Universal History....

যদিও হেগেল কান্টের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি প্রকল্পকে নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতায় বিকশিত করতে সক্ষম হন তবুও দেখা যায়, Hegel has frequently been accused of worshipping the state and its authority, and therefore of being an enemy of liberalism and democracy. কিন্তু ফুকুয়ামা মনে করেন এই পরিচয় হেগেলের আসল পরিচয় নয়। Hegel was the philosopher of freedom, who saw the entire historical process culminating in the realization of freedom in concrete political and social institutions. এবং the philosopher who justified preservation of a large realm of private economic and political activity independent of the control of the state.

এখানে ফুকুয়ামা তার প্রয়োজনীয় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হেগেলকে পুনঃনির্মাণ করে নিলেন। ফুকুয়ামা স্মরণ করেছেন, হেগেল হলেন the first historicist philosopher - that is, a philosopher who believed in the essential historical relativity of truth.

ফুকুয়ামা মার্কসের পর্বে এসে অভিযোগ তুললেন : From the moment Hegel formulated his system, people were not inclined to take seriously his claim that history ended with the modern liberal state. Almost immediatedly, Hegel came under attack from the other great nineteenth-century writer of a Universal History, Karl Marx.

Marx accepted from Hegel a view of the fundamental historicity of human affairs, the notion that human society has evolved over the course of time from primitive social structures to more complex and highly developed ones.

কিন্তু Marx shared Hegel's belief in the possibility of an end of history. That is, he foresaw a final form of society that was free from contradictions, and whose achievement would terminate the historical process.

মার্কস (মার্কসীয় দর্শনের প্রশ্নে এঙ্গেলসকে মার্কস থেকে আলাদা করার যে কোনো চেষ্টাই হবে চক্রান্তমূলক) যেহেতু এই ইতিহাসতত্ত্বের শেষ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক সেজন্য মার্কস সম্পর্কে ফুকুয়ামার মূল কথাটা হল; where Marx differed from Hegel was over just what kind of society emerged at the end of history, Marx belived that the liberal state failed to resolve one fundamental contradiction, that of class conflict, the srtuggle between the bourgeoisie and proletariat, Marx turned Hegel's historicism against him, arguing that the liberal state did not represent the universalization of freedom, but only the victory of freedom for a certain class, the bourgeoisie. অর্থাৎ ফুকুয়ামা হেগেলের সাথে মার্কসের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে শুধুমাত্র 'জাস্ট'-এর সামান্য কিছু বেশি খুঁজে পেয়েছেন মাত্র। ইতিহাসের শেষে সমাজব্যবস্থাটা কেমন হবে এটিই শুধু হেগেলের সাথে মার্কসের পার্থক্য।

আসলে এই সাথে যে বিশ্ব ও মানবজাতির অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ইতিহাসের দর্শনের উদ্ভব ঘটে গেল সে সম্পর্কে ফুকুয়ামা চুপ। ফুকুয়ামার নির্ভেজাল বাচালতা নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। এখন ফুকুয়ামার প্রধান বিবেচ্য, কমিউনিস্ট ইশতেহারের ১৪০ বছর পর monumental failure of marxism - যা অবধারিত ছিল।

কান্ট, হেগেল ও মার্কস যে ইতিহাসদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখন তা মহাবাচনিক ইতিহাস তত্ত্ব হিসেবে বেশি পরিচিত। এরা তিনজনই ছিলেন মহান দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। ইতিহাসদর্শন ও ইতিহাসতত্ত্বকে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয় হিসেবে তত্ত্বায়ন করা অপেক্ষা চলমান ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান মৌলিক উপাদান (essential) যা ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে সক্রিয় আছে তা অনুসন্ধান করেছেন এবং ভিন্নতাসহ তিনজনই অগ্রগতির মধ্যে যুক্তি ও ধারা-পরম্পরা আছে তা গ্রহণ করেই এগিয়েছেন। এদের বক্তব্য অনুযায়ী ইতিহাস হবে অভিপ্রায়মুখী / লক্ষ্য ও অর্জনসাপেক্ষ। তখন তার মধ্যে ক্রমাগত অগ্রগতির নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অস্তিত্ব ও শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকবে। তবে 'নির্দিষ্ট' ও 'শর্তসমূহ' নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার আলোকেই দেখতে হবে। পর্বে পর্বে অভিপ্রায়/ লক্ষ্য অর্জিত হলেও তা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে থেমে যাবে না, –বলবে না, এই যে দেখুন ঠিক এইখানে ইতিহাসের শেষ হল।

এতসব বিশ্লেষণ করা ফুকুয়ামার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি এটাই প্রমাণ করতে আগ্রহী, এরাই 'ইতিহাসের শেষ' তত্ত্বের দার্শনিক নির্মাতা। উদার গণতন্ত্রের সীমানা অতিক্রম করতে যেয়ে মার্কসের ব্যর্থতার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কয়েক শতাব্দী ধরে চালু থাকা উদারতাবাদের এলাকার মধ্যে তার মতে মার্কস অনেকটা জোর

করেই অনুপ্রবেশ করেন, communist societies, they were deliberately created by human beings at a definite point in time, on the basis of a certain theroetical understanding of man and of the appropriate political institutions that should govern human society. While liberal democracy cannot trace its theoretical origns to single author like Karl Marx. ঘৃণা ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ছাড়া এই ধরনের মূল্যায়ন অসম্ভব। এর প্রধান কারণ, ফুকুয়ামার 'ইতিহাসের শেষ তত্ত্বে' মার্কসের প্রয়োজন। কিন্তু উদারতাবাদের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কস-এঙ্গেল্‌স যে সম্পূর্ণ নতুন এক সংগ্রামী তত্ত্ব নির্মাণ করলেন যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই কেবল সম্ভব– এখানেই ফুকুয়ামা গংদের ঘোরতর আপত্তি।

মার্কসের বিরুদ্ধে ফুকুয়ামার বর্ণিত যে অভিযোগ সে সম্পর্কে মার্কসের নিজের ভাষ্যঃ Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstamces chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past.(Marx-Engels, Selected Works, Moscow, Vol.I 1973, P.398).

ফুকুয়ামা গংদের কথা হল ইতিহাসের শেষ নিয়ে নতুন কিছু তারা বলছেন না। অতএব বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এই ঘোষণাই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে হবে; লিবারেল ডেমোক্রাসিতেই ইতিহাসের সমাপ্তি। এই উদার গণতন্ত্রের অর্থনীতি কী হবে? আসলে সেখান থেকেই তো ফুকুয়ামাদের যন্ত্রণা ও যাত্রা। এ বিষয়ে ফুকুয়ামা অত্যন্ত দৃঢ় ও পরিষ্কার : In its economic manifestation, liberalism is the recognition of the right of free economic activty and economic exchange based on private property and markets. Since the term "Capitalism" has recently become a fashion to speak of "free-market economics" instead; both are acceptable alternative terms for economic liberalism. (Fukuyama, 1992, P. 58-65, 44) ১৯৯২ সাল থেকে আমরা এখন ফিরে যাব ১৮৪৬ সালের এপ্রিলে। মার্কস-এঙ্গেল্‌স যৌথভাবে 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনার কাজ শেষ করলেন। উদারতাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য : liberalism, i.e., liberal private property-owners, at the beginning of the French Revoloution gave private property a liberal appearance by declaring it one of the rights of man.এবং তারা এ-ও বললেন ১৮২০ সালেই হেগেল উদারতাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি কী তা পরিষ্কার করেন; Hegel that he turns the phrase of the bourgeois into the true concept, into the essence of property. (Marx - Engels, C. W. Vol, 5, Moscow, 1976, P. 208)

এবং লাস্কি ১৯৩৬ সালে বলেন, এটা ঠিক যে ইতিহাসে উদারতাবাদ এক সময় চার্চের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অতি ধীরে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তবাদ ভাঙন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লিবারেল রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে। কিন্তু উদারতাবাদ তার পুরনো ভূমিকা পরিত্যাগ করে। The spirit begins to disappear with the emergence of the capitalist spirit as predominant. And the principle of utility is no longer determined by reference to social good. (H.J. Laski, The rise of European Liberalism, 2005, P. 33) বিজয়ী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উদারতাবাদকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে লাস্কি এর একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই অনু-অধ্যায়টি এখানেই শেষ হলে বরং ভালো হত। কিন্তু ফুকুয়ামা যে ধূর্ততার সাথে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছেন তা অনুধাবনে খুবই সামান্য কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি :এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কান্ট থেকে মার্কস পর্যন্ত যে নতুন ইতিহাস দর্শনের সাক্ষাত পাওয়া গেল তার ব্যাখ্যা ফুকুয়ামা থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। কান্ট যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তা হল, মানবজাতি কি অবিরাম প্রগতি ও উত্তমের পথ ধরে চলেছে? ভাববাদী কান্ট মানবতাবাদী ধারায় ইতিবাচক অর্থে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজেন। স্বাধীনতার দিকে জনগণের ক্রমিক, অগ্রগতিমূলক বিকাশের ধারণায় উপনীত হন কান্ট। শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে অবজেকটিভ নিয়মসিদ্ধতা, শান্তির নীতিতে জাতিসমূহের সংঘ গঠনের অনিবার্যতার কথা বলেন তিনি। তিনি মনে করেন, লোকে চাক বা না-চাক, এ সংঘে যোগ দিতে তারা বাধ্য (রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৭, পৃ. ২৩৯, ২৪৪)। এখানে তিনি বুর্জোয়া দাবি গুলোর রূপায়ণ চেয়েছিলেন কিন্তু সেটিই এই ইতিহাস দর্শনের মূল কথা নয়। তিনি প্রথমে দেখাতে চেয়েছেন ইতিহাস অবিরাম অগ্রগতি অভিমুখী– ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থাকবে। কিন্তু তিনি ইতিহাস শেষ হবে উদারতাবাদে এই দাওয়াই দিয়ে ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ করে দেবার সিলমোহর লাগিয়ে যাননি। হেগেলের মতে বাস্তবতা এমন একটা ধর্ম নয় যা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সর্বাবস্থায় এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। ...আগে যা ছিল বাস্তব বিকাশধারার পথে তাই-ই হয়ে পড়ে অবাস্তব, লোপ পায় তার আবশ্যিকতা, তার অস্তিত্বের অধিকার, তার যুক্তিসিদ্ধিতা। এবং মুমূর্ষু বাস্তবের স্থানে আসে এক নতুন সজীব বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবেই আসে যদি পুরাতনের পক্ষে বিনা সংগ্রামে বিলীন হবার মতো সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাকে; আর ওই পুরাতন যদি এই আবশ্যিকতার প্রতিরোধ করে তাহলে আসে বলপ্রয়োগ। এইভাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারেই হেগেলের প্রতিপাদ্য পরিণত হচ্ছে তার বিপরীতে : মানব-

ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস্তবই কালক্রমে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে; অতএব নিজের প্রকৃতি অনুসারেই তা যুক্তিবিরুদ্ধ, ... কিন্তু হেগেল দর্শনের (এবং কান্টের সময় থেকে দর্শনের সমগ্র আন্দোলনের এই শেষ পর্বে আমরা আবদ্ধ থাকব) প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র আসলে ঠিক এই যে, মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলো সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার উপর তা চিরকালের মতো মরণ-আঘাত হেনেছে। ... মানবতার কোনো এক নিখুঁত আদর্শ অবস্থায় জ্ঞান যেমন কোনো পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও তা পারে না। কোনো নিখুঁত সমাজ বা নিখুঁত 'রাষ্ট্রের' অস্তিত্ব শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব।.... দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সবকিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্বমাত্র। তার একটি রক্ষণশীল দিকও অবশ্যই আছে : এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের নির্দিষ্ট এক একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্যই অনাপেক্ষিক একমাত্র এই পরমটুকুই দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনে স্বীকৃত। (এঙ্গেলস, মার্কস-এঙ্গেলস, রচনা সংকলন, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৪, ৪৫, ৪৬)।

লুই বোনাপার্টের তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৮৫) এঙ্গেলস বলেন; It was precisely Marx who had first discovered the great law of motion of history, the law according to which all historical struggles, whether they proceed in the political, religious, philosophical or some other ideological domain, are in fact only the more or less clear expression of struggles of social classes, and that the existence and thereby the collisions, too, between these classes are in turn conditioned by the degree of development of their economic position, by the mode of their production and of their exchange determined by it. (Marx-Engels, SW, Vol. I, Moscow, 1973, P.396-397)

উপরের বক্তব্যটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইতিহাসের শেষ বলতে ফুকুয়ামা যে এক ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি করেছেন এবং যার দায় তিনি কান্ট হেগেল ও মার্কসের উপর চাপিয়েছেন তা কতটা বোগাস।

দুই

'ইতিহাসের দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে– হবে। চর্বিত-চর্বণ এবং উদ্দেশ্যহীন তাত্ত্বিক বুদ্ধিপনা আমাদের যে খুব কাজে আসবে তা মনে হয় না। প্রায়োগিক প্রেক্ষিত যদি হয় তাত্ত্বিকদের সার্থকতার ক্ষেত্র তা হলে আমরা উদ্দীপিত হতে পারি। ইতিহাস অতীতভিত্তিক (অতীত ও ইতিহাস) বিষয় এ দাবির প্রতি নমনীয় থেকেই বলা যায় বর্তমানের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয় এবং ভবিষ্যতমুখী চিন্তা-চেতনার আলোকে ইতিহাস-চর্চাকে জনপ্রিয় করা আজকের দিনে একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে। ইতিহাসের দায় বলে একটা কথা আছে। সে দায় মেটাতে কেউ দৈহিকভাবে অতীতে ফিরে গিয়ে তা করতে পারে না। পলাশির ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা হত্যা, যুদ্ধক্ষেত্রে টিপু সুলতানের শহীদ হওয়া বা ১৮৫৭-তে বাহাদুর শা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে গোপনে সম্পর্ক রেখেছিলেন– এসব বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা আড়াই'শ বছর ধরেই প্রায় নিয়মিত তাদের অনুকূলে লিখেই চলেছেন। মাত্র কয়েক দশক, ভারতের ঐতিহাসিকদের এক অংশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের সাথে অনেক বিষয়ে মোকাবেলা করলেও (সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদদের কথা আপাতত বাদ রাখলাম) দেখা যায় এমন স্পর্শকাতর কিছু ব্যাপার আছে যা তারা নিয়মিতই ছাড় দেন সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই। আসলে এসব বিষয়গুলো অনেক অনেক বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষকে দুর্বল করে রেখেছে। অতিসাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারী (অবাঙালি) ও অপরিপক্ক বলেছেন। কেন? এর ফলাফল কোন দিকে যাবে? ইতিহাসের অতীত, সাম্প্রতিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিশাল ও বহুবিস্তৃত আলোচনা ও ততোধিক মতভিন্নতা পড়তে পড়তে একসময় মনে হয় ক্লান্তি এসে যায়– হয়তো এখানেই ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সার্থকতা ! তবুও বলা যায়, The recent and the more or less distant past thus combine in the amalgam of the present.... Recent and remote history, then, are the first two keys to understanding the present. Finally, the course provides a third. This involves indentifying the major problems in the world today. Problems of every kind- political, social, economic, cultural, technical, scientific. ...They know the last line of the play. When it comes to the present day, with all its different potential denouncements, deciding which are the really major problems essentially means imagining the last line of the play- discerning, among all the possible outcomes, those which are most likely to occur. The task is difficult, hazardous, and indispensable.

Condorcet, the eighteenth-century encyclopediste whose best known work was his sketch for a Historical Tableau of the progress of the Human Spirit, thought such a task legitimate. Serious historians today also defend

forecasting - with some courage, given its risks. (Fernand Braudel, A History of civilization, 1993, P. xxxvi, xxxvii)

বিষয়ভিত্তিক পত্রিকার সম্পাদকের নির্বাচিত বিষয়টি অনেকটা বাধ্য করে সংজ্ঞা নিয়ে টানাটানি করতে। ফলে শুরুটা এভাবে সংগত মনে হয়েছে : প্রথমত 'ইতিহাস'-এর প্রচলিত সংজ্ঞা কী বয়ানে বিদ্যমান তা দেখা, দ্বিতীয়ত ইতিহাসের দর্শন– অর্থাৎ ইতিহাস যখন স্বতঃসিদ্ধ; সমস্যা দর্শন নিয়ে– ঐতিহাসিক, অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ইতিহাস-বোদ্ধা ও আমাদের মতো ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের লেজ না-ছাড়া পাঠকদের ইতিহাস-চর্চার প্রশ্নে কোন দর্শনের পক্ষে দাঁড়াবেন তা খোলাসা করা (বিষয় দেখে এরকমই মনে হয়েছে)।

ইতিহাস: সংজ্ঞা (নমুনা)

শাব্দিক অথবা বৈয়াকরণিক অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটির জাত্যর্থ (connotation) নিরূপণ কোনো দুরূহ কাজ নয়। কিন্তু শব্দটির প্রচলিত ব্যাপক অর্থের দিকে নজর রেখে এর কোনো সঠিক সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। সেইজন্য আলোচনার শুরুতে অতি পরিচিত একটি সংজ্ঞাই উল্লেখ করছি : History is a movement in time : সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এই অভিধা মেনে নিলে দেখা যায় যে, ইতিহাস অতীতের কঙ্কাল নয়, শবাধারে পাঁচ হাজার বছর ধরে বন্ধ করে রাখা মমির মতো কোনো নিশ্চল পদার্থ নয়। এ হচ্ছে আন্দোলন, যার গতি আছে– যা অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের সময়-সীমার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এই গতিশীলতাকে মেনে নিলেই বুঝতে হবে যে, ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কাজ ইতিহাসের প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা; অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন বদলে যায়, তেমিন এদের মধ্যকার কতকগুলো আবার টিকেও থাকে এবং কতকগুলো অদৃশ্য যায়।

ইতিহাস যেহেতু সময়-সীমার মধ্যে আন্দোলন বিশেষ, সময়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণও ঐতিহাসিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এখানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে সময়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করা এবং আবশ্যকমতো যুগ-বিভাজন বা periodisation-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা। যুগ-বিভাজন বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব। (তরফদার, তদেব, ১৯৯৫, পৃ. ২২৯)

ইতিহাস কী? এর বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত? এটা কীভাবে লিখিত হবে? আর এর উপকারিতা কী? ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে উত্তর দেয়। অন্য কথায়, ইতিহাসের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উপকারিতার বলয় নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা নানা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁদের লেখনীতে বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ... অনুসন্ধানের ধারা-প্রকৃত সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে সাধারণভাবে বলা যায় যে, বর্গীয়ভাবে (Generically) ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞান এক ধরনের চিন্তাধারা যেখানে প্রশ্ন করে তার উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়।... বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো অজানা বস্তুকে খুঁজে বের করা এবং এ অর্থে ইতিহাসও বিজ্ঞান। (দেলওয়ার, তদেব, ২০০২, পৃ. ৩, ৫)।

আসলে ইতিহাস-চর্চা হচ্ছে বর্তমানের গায়ে অতীতের যে ছাপ তাকেই বোধগম্য করা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাই হচ্ছে present evidence. অর্থাৎ আজ এই মুহূর্তে যে evidence গুলো হাতের কাছে আছে তাই দিয়েই অতীতের পুনর্গঠন চলছে। মনে রাখতে হবে বারফবহপব সনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাশে রাজনীতিও নিরন্তর কাজ চলছে। ... ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ইতিহাস জাতিরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে। ইতিহাস-চর্চা অনেকখানি আটকা পড়েছে জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা শ্রেণীটির জীবনী রচনার মধ্যে। এই শ্রেণীটি উপনিবেশগুলোর ভাগ্যনিয়ন্তাও বটে। এই ইতিহাসের রাজনীতি তো খুবই স্পষ্ট। জন-ইতিহাসকে এই দুই বেড়া ভেঙে বের হবার আশ্বাস দিতে হয়। কাজটি মূলত রাজনৈতিক। (আহমেদ কামাল, কালের কল্লোল, বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০, ২০০১, পৃ. ৯৪)।

ড. সলিমুল্লাহ খানের 'ইতিহাস কারখানা' প্রথম ভাগ (২০০৭) ও দ্বিতীয় ভাগ (২০০৯) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী বিষয়বস্তু মূলত ইরাক, ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম। ইতোমধ্যে এই যুদ্ধ ও প্রতিরোধের যে সময়টা অতিক্রান্ত তার থেকে আমরা বারুদের গন্ধ পাচ্ছি, প্রতিনিয়ত এই বারুদের গন্ধ পেয়ে চলেছি এবং সাম্রাজ্যবাদ আর কতদিন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াসহ প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপনের যুদ্ধ চালাবে এবং এর সাথে চলতে থাকবে বিরাট রক্তক্ষয়ী এক প্রতিরোধ সংগ্রাম তা আমরা জানি না, কিন্তু বারুদের গন্ধ পেতে থাকব। ইতিহাসে অতীত ও বর্তমানের সাথে সম্পর্ক কী তা নিয়ে কতকাল আমরা যে বির্তক চালাব তা-ও জানি না। কিন্তু চলতি এই সময়কালেই সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়টি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এখানে বর্তমানকে যেমন অতীতের সাথে সম্পর্কিত করার দায় থাকবে, অতীতকে পুনঃনির্মাণ/পুনর্গঠন করার তাগিদ আসবে; একই সাথে চলমান ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিবরণ আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্ধন যোগায়, পরামর্শ দেয় ও প্ররোচিত করে।

অতীতের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি জিনিসকেই এক-একটা বিশেষ প্রণালীতে অনুধাবন করা যায়। ঠিক কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাবার তাড়নায় ও প্রেরণায় অনুসন্ধান চালানো হবে, তারই ওপর নির্ভর করবে ঠিক কোন প্রণালীটা অনুসরণ করা হবে।... একালের বিভিন্ন বির্তকে অতীতকে টেনে এনে যখন তারই নিরিখে কোনো গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণ করার চেষ্টা চলে, যখন নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্যকে প্রধান এবং অন্যগুলোকে গৌণ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলে, তখন অতীত হয়ে ওঠে কঠিন লড়াইয়ের ময়দান। আজকের ভারতবর্ষে ঠিক সেটাই ঘটছে। (অমর্ত্য সেন, ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, ১৯৯৯, পৃ. ১, ৫, ৬)।

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের কতকগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল এবং তাৎপর্যকে কখনোই সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। এই তাৎপর্য বিচার পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শ্রেণীচরিত্র; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণীসমূহের বিকাশ, বিন্যাস ও দ্বন্দ্ব ; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে তার অভিব্যক্তি– এ সমস্তকে বাদ দিয়ে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অন্য কথায় আমাদের দেশের সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনকে বাদ দিয়ে যেমন অসম্পূর্ণ থাকে ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনাও সেই পরিস্থিতি বাদ দিয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্যহীন এবং অন্তঃসারশূন্য। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতির সাথে একই গ্রন্থিতে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত এবং সেই অনুসারে পরস্পরের সাথে নিবিড় ও গভীরভাবে একাত্ম। (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭৯, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃ. ৭, ৮)। ইতিহাস-ব্যাখ্যা যাই করুক এবং যেভাবেই করুক অতীতের আশ্রয় নেয় বলেই সে ইতিহাস। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে জটিল। ইতিহাসের অতীত কী বস্তু সে-সম্পর্কে সতর্ক হবেন। অতীত এবং ইতিহাসের অতীত এক নয়।... কিছুদিন হয়, সাম্প্রতিক ইতিহাস বলে একটি বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক ইতিহাসের চাইতেও এ বেশি আধুনিক। ঐতিহাসিকেরা আধুনিক হলেও অধুনার তুলনায় পিছনে থাকতেন, কেউই সাম্প্রতিককালে প্রবেশ করতেন না। ইদানীং এই দ্বিধা অনেকটা ঘুচেছে। (অশীন দাশগুপ্ত, প্রবন্ধ সমগ্র, ১৯৮৯, পৃ. ১৮, ১৯)।

The proper study of history in a class society means analysis of the differences between the interests of the classes on top and of the rest of the people; it means consideration of the extent to which an emergent class had something new to contribute during its rise to power, and of the stage where it turned (or will turn) to reaction in order to preserve its vested interests. (D. D. Kosambi, An Introduction to the study of Indian History, 1956, Reprinted 1998, P. XII) History is neither an endless tournament in which different countries vie for domination of the global market- rulers being given high or low marks for preparing their subjects for winning the the competiotion - nor is it the out-come of the working of passive market forces.

A prominent group of historians and publicists regard human history as a tournament, and they have given the palm to Europe as the continent that prepared its people for victory in this global competition for markets and resources ...History reveals that institutions or artifacts produced by human beings can lead to the exploitation or the loss of freedom of other human beings. Thus the celebration of vast numbers of slaves whose labor made it possible for the few free citizens to enjoy that good life. Our criteria then must apply to all, or at least the vast majority of the human group concerned, if they are to lay claim to universality. (Amiya Kumar Bagchi, Perilous Passage, 2006, P. XIII, 4) 'কাকে বলে ইতিহাস'? – এই প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ। (কার, ১৯৯৯, পৃ. ২৫)।

We stand in regard to the past, what the relations are between past, present and future are not only matters of vital interest to all: they are quite indispensable... (En'c Hobsbawn, On History, P.32)

ইতিহাসের দর্শন

মমতাজুর রহমান তরফদার ১৯৬৯ সালে বাংলা একাডেমীর সহায়তায় বাংলা ভাষায় 'ইতিহাসের দর্শন' শিরোনামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি বলেন এই সংকলনে যে নতুন লেখাগুলো সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে আছে কাল-মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানোভ ও লেনিনের রচনা। রচনাগুলোতে স্থান পেয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা, বিশেষ করে দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ ও বস্তুবাদ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা, যার সংক্ষিপ্তসার সম্পাদকের ভূমিকার শেষের দিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বস্তুবাদী দার্শনিকদের লেখাগুলোর সংযোজনার পেছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে; আর তা হল ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে ভাববাদী ধারণার পাশাপাশি বস্তুবাদী ধারণার উপস্থাপনা। এই ধারণা দুটির মধ্য থেকে কোনো-একটিকে বাদ দিলে আমাদের সংকলনটি একপেশে এবং অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম সংস্করণ যাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারা হলেন ; ইব্ন খলদুন, জিয়া-উদ-দীন বারনী, ফুসতেল দ্য কুলাজ, হেনরি পিরেন, মেইনেক, হুইসিংগা, ফ্রাসোয়া সিমিয়া, মার্ক ব্লখ ও আর.জি. কলিংউড। দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন

করে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হল তারা হলেন; কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, প্লেখানোভ ও লেনিন।

এই সংকলনের একটি দীর্ঘ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাতে তিনি ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেন, 'ইতিহাস', 'ইতিহাসের পদ্ধতি' ও 'ইতিহাসের দর্শন' – এই কথাগুলোর পৃথক পৃথক অর্থ আছে। অবশ্য এরা পরস্পরের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।... তথ্য নির্বাচন-সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গবেষকের বিচার-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং এমনকি তাঁর ইতিহাস দর্শন প্রকাশ পেয়ে থাকে। কাজে লাগানোর আগে তথ্যগুলোর সমালোচনা দরকার। সমালোচনার আলোকে যাচাই না করলে সংগৃহীত মাল-মসলার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারা যায় না। এর পরবর্তী পর্যায়ে আসে তথ্যের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমেই অতীতের পুনর্গঠন সম্ভব। ঘটনার কারণ ও প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই ইতিহাস-দর্শন ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক সবসময় দর্শন সম্বন্ধে সচেতন না-ও থাকতে পারেন। ঐতিহাসিকের তরফ থেকে যুক্তি-ভিত্তিক পূর্ব-ধারণার অন্য নামই হচ্ছে ইতিহাস দর্শন। (তরফদার ঐ, পৃ. ৬, ৭)।

তিনি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিকদের দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কলিংউড পর্যন্ত চিন্তার দিক দিয়ে তারা মূলত ভাববাদী এবং মার্কস থেকে লেনিন পর্যন্ত বস্তুবাদী। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়, সাধারণ অর্থে দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন ইতিহাসের দর্শনও তেমনি ভাববাদী ও বস্তুবাদী দু'টি (মাত্র) প্রধান ধারায় বিভক্ত। পদ্ধতি হিসেবে আমার মনে হয় এই ভাবে সরাসরি বিভক্তির সীমারেখা টেনে নিয়ে ইতিহাসের দর্শন প্রসঙ্গটি এই নিবন্ধে আলোচনা করতে গেলে সীমাবদ্ধতার চাপ অনুভব করা যেতে পারে; বরং ইতিহাসের দর্শন-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের বা একই সঙ্গে কেউ যদি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হন, তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। এবং এটাও জানতে হবে, সংকলনটিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বাইরেও বর্ণিত বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ রয়েছেন (বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকে) যাদেরকে এড়িয়ে আজ আর ইতিহাসের দর্শন-সংক্রান্ত প্রশ্নে আলোচনা মোটেও সমসাময়িক ও সন্তোষজনক হবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র, ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর– ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, চীন বিপ্লব, কথিত পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ, বাংলাদেশের উদ্ভব, সোভিয়েত ইউনিয়ন-পূর্ব ইউরোপ ও চীনের পতন, বিশাল আকারে বহুজাতিক কোম্পানির উদ্ভব, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দাপট, একক প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়, লগ্নি পুঁজির অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধি– অনুষঙ্গ হিসাবে নব্য উদারতাবাদের জয়গান, কথিত সিলিকন বিপ্লবকে কেন্দ্র করে তথ্য প্রযুক্তির আগ্রাসন, এনজিও- সিভিল সোসাইটির বিপুল বিস্তার, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পিছু হটা ও পুঁজিবাদের নিদারুণ নৈরাজ্যিক অবস্থা, যে মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তারাই আজ লড়ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে (যদিও এটা এখন পরিষ্কার সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সামাজ্যবাদ লড়াকু শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে ও একদিকে যেমন গণবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র উগ্রতা অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রায় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে), জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ফলাফল ইত্যাদি মিলিয়ে একটি বিরাট মহাবাচনিক ধারা-প্রক্রিয়ার মধ্যে যেখানে আমাদের নিত্য বসবাস সেখানে চলমান ঘটনাবলির উপর ঐতিহাসিককে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ পারদর্শিতাসহ উত্থাপিত নতুন নতুন প্রশ্ন, তত্ত্ব বা বয়ানকে আজকের বাস্তবতারই আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা সমীচীন হবে।

মার্কস ফ্রান্সের চলমান ঘটনাবলির উপরই লেখেন তার বিখ্যাত লুই বোনাপার্টের আঠারই ব্রমেয়ার। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন, This eminent understanding of the living history of the day, this clear-sighted appreciation of events at the moment of happening, is indeed without parallel. But for this, Marx's thorough knowledge of French history was needed. (Engles, Marx-Engles, SW, Vol.I, Moscow, 1973, P. 396).

ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা

সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় ইতিহাস। ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভের জন্য তাই আবশ্যক ইতিহাস অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের মূল শক্তি কী তা জানার। ইতিহাসের পরিবর্তন কে সংঘটিত করে? যুগের মহামানব, মানুষের চেতনা, অতিপ্রাকৃতিক বিধাতা? অথবা সমাজ ও সভ্যতা পরিবর্তিত হয় সামাজিক কোনো বিধান বলে? এই প্রশ্ন মনুষ্য সমাজের উদ্ভবকাল থেকেই চলে এসেছে। এ প্রশ্নের দু'টি প্রধান জবাবের সাক্ষাৎ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এর একটি হচ্ছে সমাজ ও সভ্যতার মূলক চালক হচ্ছে মানুষের চেতনা। এই চেতনার মূলে আছেন বিধাতা। বিধাতার নির্বাচিত সম্রাট ও মহামানবগণ সমাজ ও সভ্যতার মূল চালক হিসাবে কাজ করেন। তাঁদের ইচ্ছাতেই সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ কিংবা বিলয় ঘটে। এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের ভাববাদী ব্যখ্যা বলে পরিচিত।...ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা এই চেষ্টারই পরিপোষক। ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যার এটাই ছিল প্রধান ধারা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ফরাসি বিপ্লব এই ব্যাখ্যাকে অসার প্রতিপন্ন করে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে ইতিহাসের মূল চালকশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। (সরদার ফজলুল করিম, দর্শন-কোষ, ১৯৭৩, পৃ.২১২, ২১৩)।

ইতিহাস দর্শনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

Philosophy of History, a field of knowledge which studies the meaning of history, it's laws, and the main trends of main development. Historically, P.H. dates back to antiquity. In the 17th-18th centuries it was elaborated by Vico (q-v.) and the philosophers of Enlightenment (Voltaire, Herder, Condorcet, Montesquieu, (qq.v), To combat the influence of theology on history, dating back to St. Augustine q.v.), the Enlighteners introduced into P.H. the idea of causality, elaborated the theory of progress. voiced the idea of the unity of the historical process, and proved the idea of influence of the geographical and social environment on man. Hegel's (q.v.), P.H. was the peak in the development of bourgeois P.H. he regarded history as a single, law-governed, intrinsically necessary process of self-development of the spirit, the idea. The founders of Marxism noted the limitations of P.H., its speculative, a priori and idealistic nature. Their discovery of historical materialism (q.v) provided the basis for a truly scientific philosophical generalisation of history and establishmant of its main laws of development. In modern bourgeois P.H. the conceptions of Toynbee and Spengler (qq.v.) predicting the inevitable decline of Western civilisation enjoy a great influence. W. Rostow recently attempted to put forward an optimistic version of P.H. (see Stages of Economic Growth, Theory of). Still, the majority of bourgeois sociologists and historiographers reject any philosophical generalisation of history, regarding it as a chaotic succession of accidents and deny the concepts of causality, regularity, and progress. (Dictionary of Philosophy, ed, I. Frolov, Moscow, 1984, P. 324) ইতিহাস এবং দর্শন এক নয়, অভিন্ন যে হবে এমন উপায় নেই, কিন্তু তারা যে পরস্পরের শত্রু তা-ও নয় । দু'য়ের ভেতর পার্থক্যের জায়গাটা পরিষ্কার; ইতিহাস বিচার করে বিশেষকে, মনে হবে সে বুঝি আটকে আছে ওইখানেই; আর দর্শনের লক্ষ্য তো বরাবরই নির্বিশেষে, তার দাবি সে আটক থাকবে না, সে মুক্ত । কিন্তু সত্য তবু এটাও যে, ইতিহাস দর্শনকে খোঁজে, এবং দর্শন নিজেও আকাশ থেকে নামে না, ইতিহাসের কাল ও স্থান থেকেই বের হয়ে আসে । ..... ইতিহাসে কাহিনী থাকে, বিবরণ সেখানে অপরিহার্য; ইতিহাসের পদে পদে দলিল-দস্তাবেজ সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন, ওসব ছাড়া সে চলবে কী, দাঁড়াতেই পারবে না । কিন্তু ইতিহাসে তত্ত্বও থাকে, তার প্রয়োজনে কার্যের ব্যাখ্যা করা হয় কারণ দিয়ে, যাতে দেখা যায় ঘটনার পেছনে নিয়ম আছে, ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে ঘটনার সঙ্গে থাকে ঘটনার তাৎপর্য । তত্ত্বের এই জায়গাটাতে এসে বুঝি আমরা যে, দর্শন ছাড়া ইতিহাস অপূর্ণ, হয়তো-বা মস্তিষ্কবিহীন । আর ওই যে তত্ত্বজ্ঞান তা আসে ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে । ইতিহাসবেত্তা নিরপেক্ষ হবেন এটা বলা হয় । কিন্তু নিরপেক্ষতা জিনিসটা আসলে ভুয়া, অনেক ক্ষেত্রেই অতিকথা, কোথাও-বা আত্মম্ভরিতা মাত্র । এমনকি বিজ্ঞানও তো নিরপেক্ষ নয়; সে সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিপক্ষে । আর ইতিহাস তো নিরপেক্ষ হতেই পারে না, কেননা ইতিহাসের সৃষ্টিকারীদের মতো লিপিকারও মানুষই, যে মানুষদের দুজনের দৃষ্টিকোণ এক হয় না, এবং যার দরুন একই ঘটনা সম্পর্কে পাঁচজন লিখলে এক রকমের নয় আমরা পাঁচ রকমের বিবরণ পাই ।...রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া চলে কিন্তু তার কর্তৃত্বকারী চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে না । আর এই কর্তৃত্ব যে কেবল প্রশাসন ও আইনের তা নয় । আদর্শেরও । বস্তুত আদর্শিক আধিপত্য ছিন্ন করার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০১, ভূমিকা, কালের কল্লোল) । তথ্য সম্বন্ধে গবেষণায় মনকে যথাসাধ্য নিরাসক্ত রাখা সমুচিত । পণ্ডিতেরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, ইতিহাস রচয়িতাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে । কিন্তু নিজের ও অপরের গবেষণালব্ধ ফল সংগ্রহ করে ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা এবং তার অন্তর্নিহত কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে মনস্থির করে ইতিহাস রচনা একেবারে নিরপেক্ষ হতে পারে বলে স্বীকার করি না । বারবার দেখা গিয়েছে যে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব ও চিন্তাধারার প্রতিফলন রচনায় অবশ্যম্ভাবী ।

তাই তথ্য সন্ধানে নিরপেক্ষতা অপরিহার্য । কিন্তু তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হল ইতিহাসবিদের কর্তব্য । এই ব্যাখ্যা বিনা বিগত ইতিহাস অসার্থক নীরস, অসংলগ্ন ঘটনার নির্ঘণ্ট মাত্র । সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন দিয়ে এই ব্যাখ্যা সম্ভব মনে করি না । (হীরেন মুখার্জী, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৯৮, পৃ. ২১) ।

ঐতিহাসিকদের নির্দিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণের সময় দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা (১৯৮২) মনে করেন, ইতিহাসের 'মূল চালিকা শক্তি' কী, তাই নিয়ে আসল বিতর্ক । বর্তমান সমীক্ষা এই তত্ত্বের উপরই গড়ে উঠেছে যে শ্রেণী গঠন বোঝাবার সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হল উৎপাদন পদ্ধতি এবং তদ্দারা সৃষ্ট সামাজিক উদ্বৃত্তই হল শ্রেণী গঠনের প্রধান হেতু । যদিও জানি, বিপরীত মত বহু লোক তুলে ধরেছেন । 'শ্রেণী' এবং 'উদ্বৃত্ত' শব্দগুলিকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকেই, তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে, 'উচ্চবর্গ' বা 'শিরোমণি,' 'মর্যাদা', 'ক্রমবিন্যাস', 'সিদ্ধান্ত-করণ' ইত্যাদি কথা ।... 'ভিত ও উপরিকাঠামোর তত্ত্ব ধরে থাকাকে অনেক সময় ইতর মার্কসবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদ ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শুদ্ধ রূপ পাওয়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমাদের অন্ধ গলির মধ্যে ঠেলে দেয়, এমন বিভ্রান্তি বা কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত ।.. কিন্তু সূক্ষ্মতা বা পরিশুদ্ধতা এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেই ধ্বংস করতে উদ্যত এবং বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে বস্তুবাদই অনেক বেশি কার্যকর । কেননা 'ইতর' শব্দটাই তো নিম্নশ্রেণীর জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত;

ভদ্রলোক শ্রেণীর কিছু সদস্য দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে শখের কারণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ব্যবহার করেন।' (রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজগঠন, ১৯৯৮, পৃ. ১৩-১৭)।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'আমাদের নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকরাও প্রায়শ বলে থাকেন, তাঁদের একমাত্র প্রয়াস হচ্ছে to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth– শুনতে ভালো সন্দেহ নেই;... আসল কথা, আমাদের ঐতিহাসিকেরা যখন truth বা সত্যের নামে শপথ গ্রহণ করেন তখন চিত্ত ও চেতনায় যে বস্তু বিরাজ করে তার নাম fact বা যথাযথ তথ্য; অনেক সময়ই truth I fact -কে সমার্থক বলে মনে করেন।... তিনি fact যাচাই করেন, নির্বাচন করেন এবং এ ক্রিয়াটি নির্ভর করে তাঁর অভিজ্ঞতার উপর, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর। (নীহাররঞ্জন রায়, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, ২০০৩, পৃ. ২৪-২৬)

তাহলে ঘুরে ফিরে দাঁড়াল সেই 'দৃষ্টিভঙ্গি'। অর্থাৎ তিনি সত্যনিষ্ঠ,তিনি 'তথ্যের' প্রশ্নে আপোষহীন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি তাড়িত। নিশ্চয় এটা অন্যায় নয়। দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তির আদর্শভিত্তিক প্রত্যয় মূলত মতাদর্শগত সমস্যা।

ইতিহাসের দর্শন – এর সঙ্গে ইতিহাসের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মানুষ যখন ইতিহাস-চর্চা করে, তখন কী করে এবং এই বিশেষ অনুসন্ধান থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তার প্রকৃতিটাই বা কী–এমন সব প্রশ্ন যদি করেন, তাহলে একরকম দর্শন হয় ঠিকই কিন্তু এইসব কথা তুললে অতীত সম্পর্কে নতুন করে কিছু জানা হয় না। .....বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে দর্শন সবকিছু বুঝতে চায়। এই যুক্তিপ্রয়োগটা ঐতিহাসিকেরও অবলম্বন। সেজন্য কিছুদূর পর্যন্ত ইতিহাস ও দর্শনের আলোচনা চলা সম্ভব। সেই সম্ভাবনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্ষীণ। কবি কোনওদিন বিশেষ মানুষের স্বপ্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবেন, এমন মনে হয় না। অন্য দিকে দেখুন, প্রমাণের ব্যাপারে দার্শনিক ঐতিহাসিকের চাইতে অনেক বেশি সহিষ্ণু। ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ ছাড়া কথা বলবেনও না। কথা শুনবেনও না। সেজন্য ঐতিহাসিক বিশেষ কিছু বোঝেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু যেটুকু বোঝেন সেটুকু চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন। দার্শনিক এমন ধারা প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করেন না। ..... মনে হয় জীবনের মধ্যে সাহিত্যিকও আছেন, ঐতিহাসিকও আছেন, দার্শনিকও আছেন, বৈজ্ঞানিকও আছেন। জীবন সম্পর্কে লিখতে গেলে এঁরা সবাই আছেন। ইতিহাস সত্যের একটা চেহারা দেখে। সাহিত্য অন্যরকম। দর্শন বোধকরি বলতে পারে, ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে যতটা তফাত ধরা হয় অতটা তফাত বোধ হয় নেই। এই বক্তব্যেই বাড়িয়ে ভাবি, জীবনের মধ্যে যদি সব বিদ্যাই থেকে থাকে তাহলে জীবনের সত্যের মধ্যে সকলের সত্যই রাখা থাকবে। (অশীন দাশগুপ্ত, ২০০১, পৃ. ১৭, ২১, ২২)।

ইতিহাস দর্শনের জনক বলে সর্বাধিক পরিচিত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমা'; ৭৭৯ হিজরি বা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। তিনি মনে করেন; ইতিহাসের বাহ্য বিবরণের তুলনায় তার অন্তর্নিহিত শক্তি অধিকতর ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। খালদুনের ভাষায়, এটা আমাদের সম্মুখে বিষয় ও ঘটনাবলির কারণ এবং বিকাশ ও বিনাশের মৌলিক উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করে। এ কারণেই ইতিহাস যথার্থভাবে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।....তিনি তার আগের ঐতিহাসিকদের সমালোচনা করে বলেন তাদের সংগৃহীত বিবরণ ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তাঁরা কোনো রাষ্ট্রের বিবরণ দিতে গিয়ে একান্তই যান্ত্রিকভাবে বাহ্যজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। তার উত্থান-পতন, সুবিধা-অসুবিধার বিবরণে কার্যকারণ বিশ্লেষণের কোনো প্রকার চেষ্টা করেননি। এ কারণে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস পাঠককে শুধু রাষ্ট্রশক্তির প্রারম্ভ অথবা বিনাশের কথাই জ্ঞাপন করায়; একটি রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে অন্য একটি শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়– কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই দেয় না। বস্তুত এ সকল ঐতিহাসিকের জন্য পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা এ কার্যকারণের বিশ্লেষণের ওপর অধিকতর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা হয়নি। (ইবনে খালদুন, ২০০৭, পৃ. ৬৭, ৬৯)।

ইতিহাসের দর্শন অনুসারে, বিশেষত হেগেল যার প্রতিনিধি, এইটি মানা হয় যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের বাহ্যিক এবং আসল উদ্দেশ্যাবলিও কোনো মতেই ঐতিহাসিক ঘটনার চরম কারণ নয়, এই উদ্দেশ্যের পিছনে অন্য কোনো চালিকাশক্তি বর্তমান এবং তারই আবিষ্কার প্রয়োজন। (এঙ্গেলস, মা-এ রচনা সংকলন, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, ১৯৭২, মস্কো, পৃ.৭৫)।

মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলো অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলো হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে। (মার্কস, তদেব, ১৯৭২, পৃ.২৫)।

শুধু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই (প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দিলে সব বিজ্ঞানই হল ইতিহাসগত বিজ্ঞান) এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার হল এই প্রতিজ্ঞা যে, 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে'; ইতিহাসের যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের যে সব

ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যে-সব তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপত্তি। 'মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।' সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদী মোহে আচ্ছন্ন নয় এরকম যে কোনো ব্যক্তির কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। কিন্তু বিরাট বৈপ্লবিক পরিণাম এর মধ্যে নিহিত, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও।....অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তা পদ্ধতি থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য তবে প্রচণ্ড ইতিহাসবোধে এর ওপরেই তার ভিত্তি।... ইতিহাসের মধ্যে যে একটা ক্রমবিকাশ, একটা অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর ইতিহাস-সম্পর্কিত দর্শনের অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গির মহিমা আজও শ্রদ্ধেয়, সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা বিশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা করি-না কেন। তাঁর 'চেতনাবাদ', 'নন্দনতত্ত্ব', 'ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই তার এই অপূর্ব ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগতভাবে ইতিহাসের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট, যদিও বিমূর্ত বিকৃত আন্তঃসম্পর্কে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত ভিত্তি এবং যুক্তি-পদ্ধতির জন্যও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই। (এঙ্গেলস, তদেব, ১৯৭২, পৃ. ৩১, ৩২, ৩৬)।

তিন

ইতিহাস চর্চা : দক্ষিণ এশিয়া : পর্ব–এক : মধ্যযুগ

প্রথমেই বলে কয়ে নিয়েছি এখনকার এই আমাদের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেন? কয়েক দশক আগে থেকেই প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ এশিয়া গবেষণা কেন্দ্র বা এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আদৌ আছে কি না তা অবশ্য আমার জানা নেই।

নিবন্ধের সীমাবদ্ধতা দাবি করে আর অগ্রসর না হতে। এটা মান্য করেই বলছি, পাঠকের অস্বস্তির প্রতি অন্তত কিছুটা ইংগিত থাকুক যাতে বিষয়টির দিকে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের অনুগ্রহের দৃষ্টি পড়ে।

এটা খুবই জানা বিষয়, ইংরেজরাই আজকের ভারত-ইতিহাস চর্চার গোড়াপত্তন করে। প্রাচ্যবাদী বা হিতবাদী যে গোষ্ঠীরই ঐতিহাসিক হন-না কেন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই – তারা ইতিহাস-চর্চার এমন একটি ছক তৈরি করে দেবেন যাতে ঔপনিবেশিক মতাদর্শ ও নীতি কেন্দ্র-বিন্দুতে থাকবে। এর ফলে, এমনকি দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত ও ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিতজনও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেবেন ভারতের একটা অতি দুঃসময়ে ইংরেজরা ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা অনেক দোষ-ত্রুটি করতে পারে বটে তবে তার দ্বারা এটা ম্লান হয়ে যায় না, ভারতকে তারা আলোকিত ও আধুনিক করেছিল, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছিল। এর ফলাফল একেবারে শেষে এসেও আমরা দেখতে পেলাম: ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যখন পরস্পরের হাতে নিহত হচ্ছে তখন ইংরেজরাই এদেশে সবচেয়ে নিরাপদ – তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান বুঝে নিয়েই প্রত্যক্ষ ভারত শাসন থেকে অব্যাহতি নিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলকিনস, জন শোর, চার্লস গ্রান্ট (ইভানজেলিক) ও ইংরেজ প্রশাসকদের মধ্যে এলফিনস্টোন আলফ্রেড লায়াল ইত্যাদি ভারতের ইতিহাস-চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য। ইংরেজপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক প্রভাবশালী বই লেখেন জেমস মিল ১৮১৭ সালে। মিল ভারতবর্ষে কখনও আসেননি এবং কোনো ভারতীয় ভাষা তিনি জানতেন না। জেমস মিলের আরব্ধ ইতিহাসরচনার পরম্পরা ইংরেজ ইতিহাসবিদদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্টই প্রভাবশালী ছিল। (মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসের অতীত : ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস, ২০০৩, পৃ. ২৩)।

ফরাসি ঐতিহাসিক জ্যাঁ শেঁনো (Jean Chesneaux) বলেছিলেন, ইতিহাসকে শাসকশ্রেণীরা ব্যবহার করে তাদের মতাদর্শ ও রাজনীতির স্বার্থে। জনসাধারণের চেতনাকে প্রভাবিত করার এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। তারা যেমন তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ইতিহাসকে কাজে লাগায়, তেমনই জনগণের সংগ্রামের স্বার্থেও ইতিহাস বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তা নির্ভর করছে ঐতিহাসিক কোন্ শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে দেখবেন। (সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি ২০০১, মুখবন্ধ)।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার যে প্রাথমিক কাঠামোটি দাঁড় করানো হয় তার রচয়িতাদের মতে, আদিতে জাতির ইতিহাস ছিল ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল। এখানে জাতি বলতে কখনো বাঙালি, কখনো হিন্দু, কখনো আর্য, কখনো ভারতবর্ষীয়, যে কোনও একটা বলা যেতে পারত। কিন্তু যুক্তির কাঠামো ছিল একই। এরপর এল জাতির অবক্ষয়ের যুগ, কারণ মুসলমান শাসন অর্থাৎ জাতির পরাধীনতা। এর থেকে পরিত্রাণ অর্থাৎ জাতীয় সমাজের সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবন একান্তভাবেই ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল। এইভাবে একদিকে যেমন উইলিয়াম জোনস্ প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতের কাব্য দর্শন নিয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনি প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে

মুসলিম রাজত্বের অপদার্থতা সম্বন্ধেও ইংরেজ লেখকরা মোটামুটি একমত ছিলেন। এই অপদার্থতার কাহিনী ব্রিটিশ শাসনের সপক্ষে যুক্তি হিসেবেই উপস্থিত করা হত। এইভাবে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার ছোঁয়ায় এদেশে যখন 'জাতীয় ইতিহাস' রচনা শুরু হল, তখন একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতকে কল্পনা করে দেওয়া হল সমস্ত আধুনিকতার ক্লাসিকাল সূত্র হিসেবে, তেমনি মুসলিম শাসনকে ঠেলে দেওয়া হল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয়, দুর্নীতিপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর; –ভারতীয় লেখকরা এইভাবে যে ইতিহাস রচনা করলেন, সেখানে ঔপনিবেশিক পর্বে পরাধীন জাতির ঐতিহাসিক মুক্তির যে আধুনিক চেতনা দেখা গেল, তার শর্তগুলো উপস্থিত করেও শোনান হল কেবল মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতির বাহুবলের কাহিনী, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে থাকলেও প্রস্তাব কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে হাজির করা হয়নি। ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগের ঠিকানা সেই প্রাচীন হিন্দুযুগে, মুসলমান যুগে সেই স্বর্ণযুগের অবসান, ব্রিটিশ শাসনে বা আধুনিক যুগে সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে মুক্তি। আমাদের নবজাগরণ এই ধারণা নিয়েই চলেছে। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এই ধারণাকেই সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাজিয়েছে। ভারত হয়ে উঠেছে হিন্দু-ভারত। (নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০১, ইতিহাস চর্চা পৃ. ৩৪, ৩৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতানা, এই দুই প্রান্তের ইতিহাস ইংরেজিতে সহজলভ্য ছিল, এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্নেল টড এবং গ্রান্ট ডাফ লিখিত বই পড়ে তাঁদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন করে গৌরববোধ করেন। জেমস টডের দু খণ্ডে লেখা 'অ্যানাল্‌স্ অ্যান্ড অ্যান্টিকউইটিজ অফ রাজস্থান' (১৮২৯ ও ১৮৩২) বহু লেখকের কল্পনায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে, এবং বাংলা ভাষায় তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ডাফের তিন খণ্ডে লেখা 'হিস্টরি অফ দ্যা মারাঠাজ' (১৮২৬) শুধু মহারাষ্ট্রের পাঠকদের উত্তেজিত করে তাই নয়। গঙ্গাবিধৌত দক্ষিণবঙ্গে ধানখেত পরিবেষ্টিত শাবাজপুরে বসে সরকারি আমলা রমেশচন্দ্র দত্ত এই বই পড়ে শিবাজীর স্বপ্ন দেখে রাত্রি যাপন করেন সে কথা আমরা তাঁরই জবানিতে জানতে পাই। শিবাজী বা রানা প্রতাপ শুধু যুদ্ধে পরাক্রম এবং পৌরুষের পরাকাষ্ঠা ছিলেন না– তাঁরা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তার যোগস্থাপনে সেতুর কাজ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক গৌরব অনায়াসে হিন্দু জাত্যাভিমানের সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, এবং মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জাতীয় অস্মিতা প্রমাণের একমাত্র চিহ্ন বলে বিবেচিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। যে যুগে এই লেখকরা তাঁদের উপন্যাসে হিন্দু পরাক্রমের বর্ণনা করেছেন তখন ক্ষমতায় আসীন ইংরেজ শাসক। (মীনাক্ষী, তদেব, ২০০৩, পৃ. ৩৯, ৪০)। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় মহামতি টডের 'রাজস্থান'–যাহা এতদিন আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছি–উহার অধিকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। (কালিকারঞ্জন কানুনগো, রাজস্থান-কাহিনী, ১৩৯৬, পৃ.২)। স্যার হেনরি এলিয়ট ছিলেন কোম্পানিরই উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী। উত্তরপ্রদেশে বড়-সাহেবি করে তাঁর কর্ম-জীবন কাটে। এই অঞ্চলের অনেক বনেদি পরিবারের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্রে পরিচয়। স্যার হেনরির নেশা ছিল ফারসি পুঁথি সংগ্রহ করা। এই সব পরিবার তাদের পুঁথি বড়-সাহেবকে এনে দিত।.... হেনরির বেশ ক'জন মুনশি ছিল। অল্প মাইনেতেই তারা কাজ করত আর 'মর্মোদ্ধার' যেটুকু করতে পারত, সাহেবকে এনে দিত। সাহেব ক্ষমাঘেন্না করে ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। এইভাবে এই বই লেখা হত। এখন, স্যার হেনরি তো গত হলেন। কিন্তু কাজ করার জন্য কোম্পানি ডাকলেন স্যানডহার্স্ট কলেজের অধ্যাপক জন ডসনকে। জন ডসন হেনরি এলিয়টের কাজ গুছিয়ে দেওয়ার পর আট খণ্ডে প্রকাশিত হল এলিয়ট অ্যান্ড ডসন, দ্য হিস্টরি অভ ইনডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই হার ওন হিস্টোরিয়ানস'। এই ইতিহাস বেশ সমাদৃত। স্যার হেনরি মোটামুটি তিনটি কথায় বিশ্বাস করতেন এবং কথাগুলো এই বইয়ের ভূমিকায় জোর দিয়ে বলেও গেছেন। প্রথমত, তিনি একজন ইংরেজ রাজপুরুষ। ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য যে ভারতবাসীর প্রভূত কল্যাণ করছে এবং আরও করবে এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সমস্ত ঘটনাটাই বিধির বিধান। অদৃষ্টই ইংরেজদের ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য ডেকে এনেছে। এলিয়ট এই বিধিলিপিতে বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বাসটি এরই রকমফের। ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আগেও তো সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের গুণপণার কাছে সেগুলো কিছু-না। যেমন 'মুসলমান' শাসনের সময় চিন্তার স্বাধীনতা বলতে কোনও বস্তু ছিল না। ... ইংরেজ-শাসনের শান্তি ও সুবিচার আগে মিলত না। এর থেকে যে তৃতীয় বিশ্বাসে স্যার হেনরি গেলেন সেটা ভারতবাসীর পক্ষে আরও মারাত্মক হয়েছে। মুসলমানদের কাজই হল হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করা (এবং পারলেই তাদের মন্দির ভেঙে দেওয়া)। মুসলমানদের হাতে যখন শাসনভার ছিল তখন হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে কোনওক্রমে বেঁচে ছিল। ইংরেজ রাজত্বে কী হিন্দু, কী মুসলমান, সকলেই সুখে আছে। এই হল হেনরি এলিয়টের মেজাজ। 'এলিয়ট অ্যান্ড ডসন' এই মেজাজেই লেখা। (অশীন দাসগুপ্ত, তদেব, ২০০১, পৃ. ২৩, ২৪, ২৫)। এখানে আমার মূল প্রতিপাদ্য : ভারতের ইতিহাস চর্চা ও রাজনীতিতে এটা মোটামুটি গৃহীত হল; মধ্যযুগ বা মুসলিম পর্ব ছিল বিদেশী শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক ও সাম্প্রদায়িক; ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতকে একটি পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে মুক্ত করে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তার সংযুক্তি ঘটিয়ে ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারত-ইতিহাস/ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় এর ফলাফল হয়েছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। ঔপনিবেশিক শাসকদের ইতিহাসের দর্শন ছিল ও আছে এরকম যে; অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্বর (টহপরারষরুবফ) অত্যাচারী, স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম শাসনকে তারা ধ্বংস করেছে; ভারতীয়দের স্বার্থেই ভারতীয়দের দায় ইংরেজরা কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে। পলাশি যুদ্ধের মধ্যদিয়েই ব্রিটিশ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়ে ভারত ক্রমাগত আধুনিক হয়ে উঠেছে। পলাশি

যুদ্ধে ভারতীয় শাসককের পরাজয়ের মধ্যদিয়েই মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে। প্রায় অনুরূপ বক্তব্যই অত্যন্ত জোরের সাথেই হাজির করেছেন উপনিবেশিক আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার পথিকৃত হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার। তিনি পলাশির যুদ্ধ শেষ হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন অনেকটা থরথর কাব্যিক আবেগে; When the sun dipped into the Ganges behind the blood-red field of Plassey, on that fateful evening of June, did it symbolise the curtain dripping on the last scene of a tragic drama?... Today the historian, looking backward over the two centuries that have passed since then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the line of which the history of the world has not seen elsewhere. On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began....

মোগল শাসন সম্পর্কে তিনি বলেন, Its potency for good, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient, and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud, and unworthy ruling class....Education, literature, society, religion man's handi work and political life, all felt the revivifying touch of the new impetus from the west. .. .It was truly a Renaissance, wider, deeper, and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantiople. (যদুনাথ সরকার, The History of Bengal, Voll-2, ১৯৭৬, পৃ, ৪৯৭, ৪৯৮)।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি (খ্যাতনামা ঐতিহাসিক) সুরেন্দ্রনাথ সেনের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন : ব্রিটিশরা ইচ্ছা করেই ভারতীয়দেরকে আঘাত করতে চাননি। তারা তরবারীর বলে ভারত জয় করলেও তরবারি দিয়ে দেশ শাসন করতে চান নি। ব্রিটিশরা বিশ্বাস করত যে, তারা একটি উন্নত জাতি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী। প্রাচ্যের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো প্রদান করতে তারা আগ্রহী ছিল। বস্তুত সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতামতেরই প্রতিফলন। তিনি ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণ, অত্যাচার এবং নির্যাতনের দিকটি প্রত্যক্ষ করেননি। (নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৯)।

আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন যেহেতু তখনকার যুগে ব্রিটেনই সর্বাগ্রগণ্য দেশ সেইজন্য ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তর ব্রিটিশ রাজত্বের মাধ্যমেই ঘটবে। ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি তাঁদের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন; ব্রিটিশ শাসনকে, এমনকি, 'দেবপ্রেরিত' বলেও তাঁরা বর্ণনা করতেন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়েও এই সমর্থন অবিচলিত ছিল। (বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৭৩, পৃ. ২৯)। অবশ্য এই সব ঐতিহাসিকরা মনে করেছেন অর্ধশতাব্দী ধরে বুদ্ধিজীবীদের বর্ণিত মনোভাব বজায় থাকলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকলে অনেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে থাকে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ করে কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং নেতৃত্বও এসেছ তাঁদের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লিতেই অন্তত ২৭,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। পরেও, বহুদিন ধরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের দেখত গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে। (তদেব, পৃ, ৮৬)। মনে করি, ঔপনিবেশিক শাসনের গ্রহন যোগ্যতার পক্ষে যে কোনো যুক্তিই নাকচযোগ্য। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন-দর্শন বা তাদের ইতিহাস দর্শনের পাল্টা কোনো ইতিহাস দর্শন দাঁড় করানো যায়নি। যে ঘরানার ঐতিহাসিকই হোক-না কেন স্পষ্ট বা ছদ্ম আবরণে, বাস্তবতার নামে ব্রিটিশ শাসনের কিছুটা হলেও ইতিবাচক ভূমিকার কথা বলতে যেয়ে বিস্তৃত সমালোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনকেই সমর্থন করেছেন।

আমরা মনে করি ঔপনিবেশিক শাসন-অধীন দেশ কোনো বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার লুণ্ঠনের স্বার্থে পরাধীন দেশে একপেশে বিকৃত অর্থনীতি গড়ে তোলে যে অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের অর্থনীতির লেজুড় হয়। তার নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা থাকে না। ফলে অগ্রগতির পরিবর্তে পরাধীন দেশের পিছু-হাঁটা শুরু হয়। যে ধ্বংস বিদেশী শাসন সম্পন্ন করে সেই ধ্বংস উপনিবেশ নতুন সৃষ্টির সহায়ক নয়– পরিপন্থী। যে সমাজবিপ্লব পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেবে সেই বিপ্লব সংঘটিত করতে পারে নতুন ব্যবস্থার জন্ম হতে পারে, না হলে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্রিটিশ শাসন ভারতে কোনো সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেনি। তার ভূমিকা ছিল শুধু ধ্বংসাত্মক। বাংলায় তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল, কারণ বাংলা ছিল ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ শোষণের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সমাজ অনড়, গতিহীন, নিস্তরঙ্গ ছিল এবং বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল–এই ধারণাও সঠিক নয়। (সুনীতি কুমার ঘোষ, তদেব, ২০০১, পৃ. ২৯)।

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা : পর্ব–দুই : সাম্প্রদায়িকতা

শিরোনামটি ঐতিহাসিক গৌতম নিয়োগীর বহুল পরিচিত একটি পুস্তকের নাম। ৯০-এর দশকে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করা হয়েছিল তার উপর মন্তব্য করতে যেয়ে গৌতম নিয়োগী বলেন, শুধু অধুনা কেন, এই নানা স্তরের সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ও ব্যাপ্তির এক দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক পটভূমিকাও আছে যার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে। ইতিহাস ব্যাখ্যা বিকৃত হলে সমাজে তার কুফল পড়ে এবং তার মাশুল গুনতে হয় জনগণকেই; তাই সমাজে

সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তারে ভারত-ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ কী ভূমিকা নিয়ে থাকে তা খোলা মনে, নির্মোহ ও অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে, আলোচনা করা দরকার। (নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, ১৯৯১, পৃ. ১)। আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং আদর্শ যে সব কারণে দানা বাঁধে এবং ক্রমে বদ্ধমূল হয় তার মধ্যে ইতিহাস রচনা এবং পাঠ অন্যতম প্রধান। (তদেব, পৃ, ২৯)। প্রকৃতপক্ষে, একটুও অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে, ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই বরাবর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মতবাদকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে এসেছে। (বিপান চন্দ্র, সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৩)।

বাবরি মসজিদ ভাঙা হল ও ঘটল গুজরাতে নরমেধ যজ্ঞ। আবারও সেই ইতিহাস নিয়ে টানাটানি। ভারতীয় উপমহাদেশে ঐতিহাসিক, গবেষক এবং পণ্ডিতদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসটা গৌণই রয়ে গিয়েছে। এটাই যে সবচেয়ে বড় কঠিন সমস্যা তা যেন কেউ বুঝতেই চাইছেন না। ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকেই বড় করে দেখাতে চান। সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষয়টিকে তুচ্ছ ভেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। (গুজরাত, নরমেধ যজ্ঞ : ২০০২, পৃ. ১০) এটা বিশেষভাবে সত্য যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত চরমপন্থী চিন্তা ও প্রচারের মধ্যে জোরালো হিন্দু ধর্মীয় উপাদান ছিল। বহু চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনকে অভিন্ন বলে দেখতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ রেখে কেবল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলতেন, ভারতের ঐক্যের কথা বলতেন হিন্দু ঐক্যের ভাষায়, এবং জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটি ধর্ম রূপে– যে ধর্ম অনিবার্যভাবে হত হিন্দুধর্ম। তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি হিন্দু মতাদর্শগত প্রভাব দিতে, বা কমপক্ষে তার দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটি হিন্দু বাক্-রীতি দিতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা এক ধরনের আধুনিক সাহিত্য, যার বক্তব্য ছিল অংশত সাম্প্রদায়িক, সেগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সাহিত্যের প্রতিনিধি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরের দিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো; যেগুলো পরে এই ধরনের ভারতীয় সাহিত্যের মূল রূপ হয়েছিল। বঙ্কিম মুসলিমদের বিদেশী হিসাবে দেখিয়েছিলেন, এবং জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়ত্ব বা দেশজ সবকিছু হিন্দুদের সঙ্গে অভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন। (বিপান চন্দ্র, আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, ১৯৮৯, পৃ. ১৪৬)।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, তাঁরা কেউই মিলের পর্ব-বিভাগ সম্বন্ধে কোনোরকম প্রশ্ন তোলেননি। .... কিন্তু এই ধরনের পর্ব-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের গুণগান মূলত হিন্দু যুগের গুণগান হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দুই যুগের মধ্যে পৃথকীকরণ আরো বেশি অনড় হয়ে ওঠে।.... 'মুসলমান যুগ'-কে অধঃপতনের যুগ বলে ধরে নেওয়া হল এবং মনে করা হল যে তার দুর্বলতার জন্যেই ব্রিটিশ শাসন স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, একথাও বলা হত যে মুসলমান যুগে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই 'জাতির' উদ্ভব হয়েছিল এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর একমাত্র পরিণতি হতে পারে সমগ্র দেশকে হিন্দু ও মুসলমান অধিকৃত দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ করা। এ কথা বিশেষ ভেবে দেখা হল না যে ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতি সমার্থক নয়। উনিশশো তিরিশ-চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে এই ব্যাখ্যা ও বিভেদ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের সমস্যার কোনো সমাধান হল না।... ইতিহাস -চর্চা হল একটি অগ্রগামী বিদ্যা যাতে নতুন গবেষণার রীতি এবং বিশ্লেষণের কৌশল ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস রচনার ধারা পর্যবেক্ষণ করলে এই সব কৌশলের পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। প্রচলিত ধারণাগুলো সর্বদাই যাচাই করা উচিত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দুর্বল হলে তাদের বর্জন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। মিথ্যা ইতিহাস রাজনীতিমূলক উপকথা রচনায় সাহায্য করেছে– ঐতিহাসিকরা তাঁদের অধীত বিদ্যায় এই অধঃপতন মেনে নিতে পারবেন না। যেহেত ঐতিহাসিকরা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাসের জনক হতে পারেন, সেজন্য তাঁদের ইতিহাসের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। (রমিলা থাপার, সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, ১৯৭৬, পৃ. ১৬, ১৭, ২৭, ২৮) ।

আমাদের বুঝতে হবেই যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের প্রায় কিছুই দিতে পারে না। এর ফলে শুধু যে প্রচণ্ড ক্ষতি শুধু ভারত-ইতিহাস চর্চার প্রশ্নে হয়ে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতেও আরো অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। যেমন, মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রণয়নের ঢের আগেই ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তার একটি পূর্বতন সংস্করণ খাড়া করেছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে একজাতিতত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় জাতির মানে হল হিন্দুজাতি, ভারতীয় জনগণ বললে হিন্দু জনগণকে বোঝায়; মুসলমান শাসন ছিল বিদেশী শাসন সুতরাং ভারতে মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশী মাত্র ছিলেন ইত্যাদি। (বিপান চন্দ্র, তদেব, ১৯৭৬, পৃ. ৭১)। ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করার কাজে এধরনের মহাপুরুষ সৃষ্টি – রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ ইত্যদি যাঁরা মধ্যযুগে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে উপকথা রচনা– অন্য যে কোনো মতবাদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এক কলমের খোঁচায়, প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে এই ধরনের মহাপুরুষ-পুরাণ দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মূল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য প্রমাণ করে দিয়েছিল। কী হিসেবে তাঁরা 'জাতীয়' নায়ক, এবং তাঁদের সংগ্রাম কী অর্থে, 'জাতীয়' সংগ্রাম? তাঁরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন বলে? কী অর্থে মোগলেরা বিদেশী? কারণ তাঁরা মুসলমান ছিলেন। রানা প্রতাপ, শিবাজী এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের 'জাতীয়তাবাদের' ঐক্যসূত্র কী ছিল? তাঁরা হিন্দু বা অ-মুসলমান ছিলেন। এভাবে

মহাপুরুষ-পুরাণগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল। (বিপান চন্দ্র, তদেব, ১৯৭৬, পৃ, ৭৭)।

যখন আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব, যখন বিশেষ কোনো শাসক বা শাসকশ্রেণীর ইতিহাসমাত্র না পড়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করব, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাসচেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবে। সমগ্র সমাজের ইতিহাস, তার চরিত্র ও গঠনভঙ্গি, যার থেকে পরস্পর-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কাছাকাছি সময়ে বা একই সঙ্গে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিরোধ, সেই সম্প্রীতি ও বিরোধের ক্ষেত্রে– এই সবই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। (হরবংশ মুখিয়া, তদেব, ১৯৭৬, পৃ. ৪২)। আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার অনেকটাই মধ্যযুগের সুলতানী ও বাদশাহী শাসন-সম্পর্কিত কয়েকটি বির্তককে ঘিরে সৃষ্টি। সে-যুগে সংঘটিত কিছু ঘটনা ও অনুসৃত কিছু নীতি সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা এ-যুগের মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। (অঞ্জন গোস্বামী, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান, ২০০৩, পৃ. ৩৭) এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে প্রদত্ত বক্তব্যটি ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বুঝতে আংশিক সাহায্য করে মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৮৭০-এর পর থেকে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র মধ্যযুগ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বক্তব্যগুলোর মধ্যেই নিহিত আছে তা মনে করবার কারণ নেই। এর সাথে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার : ভারতকে যখন থেকে আধুনিক বলা হচ্ছে অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সাধারণভাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বিশেষ করে দেশী ভাষায় অগ্রগতি, গদ্য সাহিত্যের (সাংবাদিকতাসহ) বিকাশ হওয়া, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট অবয়ব গঠন– ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত হিন্দু ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ, নানা ধরনের ভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা ও জাতি-জাতীয়তার ধারণা থেকে জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় কেন সাম্প্রদায়িকতা দ্রুত বিকশিত হল এবং তা কেন বৃদ্ধি পেতেই থাকল এবং অদ্যাবধি যা বৃদ্ধিই পেল। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শহরে, বন্দরে, শ্রমিক এলাকায় ও গ্রামীণ জনজীবনে যত বেশি বেশি প্রবেশ করেছে এবং যতই তা পূর্বতন সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ পুরো সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্যগত পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করেছে ততই ভারত আধুনিক হয়ে উঠছিল ও ততই সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ব্যাখ্যা আরো গভীর ও জটিল শুধুমাত্র মধ্যযুগই হল সাম্প্রদায়িকতার উৎস এবং তাকে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াতেই সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে– এ কনসেপ্ট দিয়ে আধুনিক অর্থে সাম্প্রদায়িকতার সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ সম্পর্কে আমার দীর্ঘ অনুসন্ধান রয়েছে। কিন্তু এই নিবন্ধে তা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। আমি ভারত/ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের ঔপনিবেশিক পর্বে বহুল আলোচিত এবং প্রত্যক্ষ উপনিবেশ-পরবর্তীকালে যে সব বিষয়গুলো নিয়ে অদ্যাবধি বির্তক অব্যাহত আছে এবং যা বজায় থাকলে এবং বজায় রাখলে সমসাময়িক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জোরদার করা দুরূহ হবে তার মধ্যে থেকে মধ্যযুগ ও সাম্প্রদায়িকতা এই দুটি বিষয়কে নমুনা হিসেবে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। বিশেষ করে এই সম্পর্কে অতীতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির নির্মোহ আলোচনা-সমালোচনা করলেই হচ্ছে না বরং যেন বেশি দরকার হয়ে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যে ইতিহাস-দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে নির্মমভাবে আঘাত করা। সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্র, সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র, দেশীয় ধনিক শ্রেণী–সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস-দর্শনের পাল্টা ইতিহাস-দর্শন গড়ে তোলার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে– আসলে এটিও হচ্ছে একটা বড় ধরনের সংগ্রাম।

ভুললে চলবে না, দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা আমাদের কম বিপদে ফেলেনি। অনেক সময় একদিকে বেশি নজর অপরিহার্য হয়ে পড়লে অন্যদিকটার গুরুত্ব কখনও এতটাই কমে যায় যে পরে সেটি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'ধর্মনিরপেক্ষরাষ্ট্র'– মূলত একটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি। এ প্রশ্নে আমাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা হতে হবে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ। একজন ব্যক্তি/গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলেও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন– এই আশঙ্কা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই অনু-অধ্যায়টি শেষ করছি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের একটি ছোট মন্তব্য দিয়েঃ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্ত বাংলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রথা নামেই চালু ছিল। সমস্ত ক্ষমতা গুটিকয়েক সরকারি-বেসরকারি ইংরেজের কুক্ষিগত হয়। এঁরা মন্ত্রীদের তোয়াক্কা রাখতেন না। এমনকি এঁদের পরামর্শে লাটসাহেব প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে গ্রেফতার করার হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এক সময়ে দেশবন্ধুর সহকর্মী এবং শিষ্য হক সাহেবের প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ শাসন করা। নীতিগত কারণে কংগ্রেস ওঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ করেনি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যদি করত তবে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হত না এবং সম্ভবত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যেত না। হক সাহেবই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ কথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তানের অর্থ যে দাঁড়াবে ভারতবিভাগ, তখন জিন্না সাহেবও এমন কথা চিন্তা করেননি। (তপন রায় চৌধুরী, বাঙ্গালনামা, ২০০৭, পৃ. ১২৯, ২৩০)।

চার

কান্ট, হেগেল ও মার্কসের ইতিহাস দর্শনের বিরুদ্ধে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণঃ ইমানুয়েল কান্ট, হেগেল এবং মার্কস-এর চিন্তা অনুসরণ করে প্রায় আড়াইশো বছর ধরে এ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা বিকশিত হয়েছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে। বিদ্যাচর্চার এই ধারা অবলম্বন করে মার্কসবাদীরা প্রচার করেছিলেন ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা।... সোভিয়েতের পতন-এর সমসাময়িক কাল কিংবা তার কিছুটা আগেই, কান্ট থেকে শুরু হয়ে হেগেল এবং তার উত্তরসূরি কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ কর্তৃক যে ইতিহাসতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, যে তত্ত্বের মূল কথা হল মানুষের সামাজিক ইতিহাসের একটি সাধারণ ধারা আছে এবং সেই সাধারণ ধারা অনুসরণ করে মানবসভ্যতা বিবর্তনের নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়–যাকে বলা যায় ইতিহাসের এৎধহফ উরংপড়ঁৎংব বা মহাবাচন– আক্রান্ত হয়েছে সেই মহাবাচনের ধারণাটাই।

ইউরোপীয় তত্ত্বচর্চার এই প্রেক্ষাপটেই, ইমানুয়েল কান্ট, ফ্রেডরিখ হেগেল এবং কার্ল মার্কসকে কেন্দ্র করে ইউরোপের দর্শন-চর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, যে ঐতিহ্যের পিছনে ছিল আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেন্ট-এর যুগের ইউরোপের যুক্তিবাদ-নির্ভর জ্ঞান চর্চা, সেই ঐতিহ্যটিকেই বাতিল ঘোষণা করে এমন এক ইতিহাসতত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসা হল, যার মূল কথা হল ইতিহাসে আসলে কোনো মহাবাচন থাকে না। এখানে যা থাকে তা হল খণ্ডবাচন। মহাবাচনের প্রয়োজনও নেই, কারণ আধুনিককালে 'ইতিহাস' এবং 'প্রগতি' উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। এই আধুনিককাল উত্তর-আধুনিক। এই তত্ত্বের নাম 'উত্তর- আধুনিকতা'।

মার্কসবাদী ইতিহাস তত্ত্ব ভুল, কেননা এই তত্ত্বের ভিত্তি হল ঐরংঃড়ৎরপরংস বা ইতিহাসবাদ অর্থাৎ যুক্তিনির্মিত ইতিহাস-তত্ত্ব, যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়ম খোঁজার পদ্ধতি দিয়ে মানবসমাজের বিকাশের নিয়ম খোঁজে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়ম খোঁজার পদ্ধতি কেন সমাজ বিকাশের ধারা আলোচনায় প্রয়োগ করা যায় না, হেগেল এবং মার্কস-বিরোধী কার্ল পপার একটি দীর্ঘ আলোচনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পপারের বক্তব্য, সমাজ বিকাশের আসলে এমন কোনো নিয়মই থাকে না যার ভিত্তিতে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়। আমাদের মতে, উত্তর-আধুনিক মতবাদ যখন মহাবাচনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তখন তা কার্ল পপারের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত থাকে যে যুক্তি নির্মিত ইতিহাসতত্ত্বটি ভুল। এই অর্থে উক্ত মতবাদটি কান্ট-হেগেল ও মার্কস রচিত ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বটি নাকচ করে।

কান্ট, হেগেল ও মার্কসের মধ্যে তফাৎ যা-ই থাকুক না কেন, এদের মধ্যে একটি মিলের জায়গাও আছে। তিনজনই একটি মহাবাচনিক ইতিহাসতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনজনই মনে করতেন, ঘটনার ঘনঘটা মানুষের ইতিহাসের এনসাইক্লোপেডিয়া রচনার উপাদান সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গতি বুঝতে হয় 'essential' বা সার উপাদানের বিকাশের গতিপ্রকৃতি দিয়ে। এই মহাবাচন সার্বজনীন, সর্বত্রই মানবসভ্যতার গতি এই মহাবাচন দিয়ে বর্ণনা করা যায়। মহাবাচনের তত্ত্বটিকে যাঁরা অস্বীকার করেন, সারবত্তার দিক থেকে তাঁরা যুক্তিনির্ভর ইতিহাসতত্ত্বের এই ধারা–যা গত আড়াইশ বছর ধরে গড়ে উঠেছে সেটিকেই নাকচ করেন। উত্তর-আধুনিক দর্শন মহাবাচনিক ইতিহাসে বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদীরা যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন, তা তাঁদের অপছন্দ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অবশ্য মার্কসবাদ-বিরোধী সমস্ত তাত্ত্বিকরাই নাকচ করেন।

মার্কসবাদের অন্যান্য সমালোচনার তুলনায় এই উত্তর-আধুনিক সমালোচনা অনেক বেশি রক্ষণশীল, এই মতবাদ আসলে প্রগতিবিরোধী, প্রাক্-আলোকপ্রাপ্তির যুগের মতবাদ, যদিও তার সর্বাঙ্গে জড়ানো আছে আধুনিক পোষাক। তাঁদের খণ্ডবাচনের তত্ত্ব আসলে বিদ্যমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক। প্রাক-আলোকপ্রাপ্তির যুগের মতবাদের সাহায্যে বিদ্যমান সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সবচেয়ে কার্যকরী দার্শনিক হাতিয়ারের নাম হল উত্তর-আধুনিকতা।

আসলে ইতিহাসের কোনো তত্ত্ব হয় না। আধুনিক যুগে এই বক্তব্যটি বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত করেন কার্ল পপার (Poverty of Historicism)। পপার ছিলেন মার্কস-বিরোধী, হেগেল সম্পর্কেও তাঁর অশ্রদ্ধার অভাব ছিল না। ইতিহাসতত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি যে যুগপৎ মার্কস এবং হেগেলের তত্ত্ব-কাঠামো দুটিকেই আক্রমণ করছেন, এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। পপারের মতে ইতিহাসের কোনো তত্ত্ব হয় না যা দিয়ে ইতিহাসের বিকাশের একটি সাধারণ গতিপথ আবিষ্কার করা যায়, কারণ ইতিহাসের কোনো সাধারণ নিয়ম থকে না। তত্ত্বটির বংশগত উৎস খোঁজা যায় প্রাক্-এনলাইটেনমেন্টে, যখন সমাজ ও প্রগতি নিয়ে মানুষের কোনো দর্শন ছিল না, অর্থাৎ সেই মধ্যযুগে। তত্ত্বটিকে তাই বলা যায়, উত্তর-আধুনিক নয়, প্রাক্-আধুনিক। (রতন খাসনবিশ, কালান্তরের পৃথিবী, ২০০৭, পৃ. ৪৭-৫৮)।

উপরে খাসনবিশ আধুনিকতাবাদীদের মূল দর্শন হিসেবে গণ্য করেছেন প্রাক-আধুনিকতাকে। উত্তর - আধুনিকতাবাদীরা আধুনিকতা'কে অস্বীকার করতে গিয়ে প্রাক-পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণাকে প্রশয় দিতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু এদের উদ্ভব হয়েছে ইতিহাসের এমন একটি পর্বে যা ঐ পর্বেরই একটা বিশেষ লক্ষণ হিসেবেই প্রথমে গণ্য করা দরকার। সমকালীন পুঁজিবাদের ভয়াবহ নৈরাজ্যিক অবস্থাজাত একটি অস্থির পৃথিবী যার সমালোচনা করতে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা বাধ্য হয়েছে কিন্তু পুঁজিবাদের পাল্টা কোনো সমাজব্যবস্থার প্রস্তাব করতে তারা রাজি নয়। এটা তাদের কাছে পরিষ্কার, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে কান্ট, হেগেল ও মার্কসের মহাবাচনিক ইতিহাসতত্ত্বের কাছে নত হত

হবে। এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ফলে ইতিহাস-বিরোধিতা ও মার্কসবাদ-বিরোধিতা উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কাছে সমার্থক।

আসলে ইতিহাস অবলুপ্তির, বিখণ্ডতার, অন্যতার, বিক্ষিপ্ততার, অনিষ্পন্নতার এই আপাত-বিচ্ছিন্ন উত্তরাধুনিক category গুলোকে একসূত্রে গাঁথলে যে অখণ্ডতাটা পাওয়া যায় সেটা হোল পুঁজির পরিব্যাপ্ত বাস্তবের (আখ্যান নয়) সামনে উত্তরাধুনিকতার নতজানু সমর্পণ এবং পুঁজির নিজস্ব dynamic-কে যাথার্থ্য দেওয়ার নিঃশর্ত হলফনামা। (জলধর গুপ্ত, এবং জলার্ক, ২০০৭, পৃ. ৮৬-৮৭)। বিষয়টি অত্যন্ত বড় জেনেও শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যিশু ও ইতিহাস

শা ম সু দ্দো হা শো য়ে ব

'Jesus, Jesus of Nazareth: I can't remember him.' Pontius Pilate,[1] in retirement, talks over the old days in Jerusalem; the name of a crucified miracle-worker, Jesus of Nazareth, comes up.
-John McManners, The Oxford Illustrated History of Christianity, p [1]

'We save the honor of Jesus when we restore His Person to life from the state of inanity to which the apologists have reduced it, and give it once more a living relation to history, which it certainly possessed'.
-Bruno Bauer, Synoptiker, 1840

দুই শতাব্দী–উদভ্রান্ত বিশ্বাস!

মূল প্রশ্নটি এভাবেই শুরু হয় যে, ওই নামে বাস্তবিক কেউ ছিলেন? না তার জীবনকাহিনী স্রেফ মানবিক দুঃখগাথা, কল্পনা ও আশা-পুরাণ: যিশু কি কৃষ্ণ, ওসিরিস, আত্তিস, অদোনিস, ডাইনোসাস কিংবা মিত্রার মতোই একজন (Christ, Caesar and, চ ৫৫৩)? বলা হয়, আঠারো শতকের প্রথমদিককার বলিব্রুক মহলে, এমনকি ভলতেয়ারের উপস্থিতেও ঘরোয়া আলোচনায় যিশু-অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখানো হত। সন্দেহবাদীদের মধ্যে নেপোলিয়নও ছিলেন।

উচ্চতর সমালোচনা

ওই সময়ে (আঠারো এবং ঊনিশ শতক) প্রধানত আধুনিক জার্মান মানসে জন্ম নেয় বাইবেলের উচ্চতর সমালোচনা। এই ধারার পাণ্ডিত্য বাইবেলের প্রামাণ্যতা ও সত্যতার দাবির ওপর শাণিত আক্রমণ চালায়। যে প্রশ্নগুলো তখন উঠতে থাকে যে, গ্রন্থের লেখক কে? গ্রন্থ লেখায় কোন কোন উৎস ব্যবহৃত হয়েছে? এগুলোর নির্ভরযোগ্যতাই বা কতটুকু? সঞ্চালন এবং সম্পাদনা প্রক্রিয়ায় কী কী ঘটেছিল? বাইবেলীয় বাণীর পরিবর্তনই-বা ঘটেছিল কীভাবে? এর ফলে অনেক বিশ্বাসীজনের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কারণ সমকালীন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বাইবেল বিশ্বাসের বিপরীত সাক্ষ্যই দিচ্ছিল। জার্মান বাইবেল বিশেষজ্ঞ এবং দার্শনিক রেইমারাস[৩] যুক্তি দেখাচ্ছিলেন এই বলে যে, খ্রিস্টানত্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে নয়, বরং যিশুকে বুঝতে হবে ইহুদি ধর্মের রহস্যময় কিয়ামত বিশ্বাসের সর্বশেষ এবং প্রভাবক চরিত্ররূপেই। যার মানে, খ্রিস্টধর্ম নামে নতুন কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যিশুর আগমন ঘটেনি, তার আগমন ঘটেছিল আসন্ন প্রলয়কে সামনে রেখে মানুষকে শেষ বিচারদিনের জন্য প্রস্তুত করতে।

সুসমাচারগুলোতে উল্লিখিত অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলির বিরুদ্ধে ডেভিড স্ট্রস[৩] ছিলেন নিরাপোষ। তার মতে, এসবই পুরাণ-কথার সমাহার এবং সত্যিকার যিশু চরিত্র পুনঃনির্মিত হতে পারে এগুলোকে বাদ দিয়েই। একই বছর ফার্দিনান্দ বাউর[৩] পলীয় চিঠিগুলোকে তুলোধুনো করেন–গালাতীয়, করিন্থীয় এবং রোমীয় বাদে বাকিগুলোকে অপ্রামাণ্য বলে ঘোষণা দেন। তার মতে, বিশ্বাসের অবশ্যই ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতে হবে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তার The So-called Pastoral Epistles of the Apostle Paul গ্রন্থে হেগেলীয় ইতিহাস দর্শনের প্রয়োগ ঘটিয়ে বাউর এই তত্ত্ব দাঁড় করান যে, আদি চার্চের বৈশিষ্ট্য ছিল পিতরীয় জুডিও-খ্রিস্টান এবং পলীয় অইহুদি-খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গির

মধ্যকার লড়াই, যার সমন্বয় ঘটে রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যদিয়ে। এছাড়া তিনি ১৮৪৫ সালে লিখিত তার Paul the Apostle of Jesus Christ গ্রন্থে গালাতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় করিন্থীয় এবং রোমীয় ছাড়া অপরাপর পলীয় রচনাকে অন্যের বলে দাবি করেন।। অপর বিশেষজ্ঞ বর্নো বাউর তার বিতর্কিত ধারাবাহিকগুলোতে দেখান যে, যিশু মূলত পুরাণকাহিনী। তার দেবত্ব উদ্ভূত হয়েছে দ্বিতীয় শতাব্দীতে; ইহুদি, গ্রিক এবং রোমান ধর্মতত্ত্বের মিশেল থেকে।

ফরাসি আর্নেস্ত রেনান গির্জার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ লাইফ অফ জেসাস (১৮৬৩)। এটিতে তিনি সমগ্র জার্মান সমালোচনার সন্নিবেশ ঘটিয়ে সুসমাচারীয় দুর্বলতাগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। নতুন নিয়মের মূলপাঠ বিশ্লেষণের কারণে ফরাসি মহলের আবে লুসি ও অপর আধুনিকদের রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এরই মধ্যে ডাচ পণ্ডিত মহলে যিশুর ঐতিহাসিকতাবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। একই অস্বীকৃতি আসে জার্মানির আর্থার দ্রিউস, ইংল্যান্ডের ডাব্লিও বি. স্মিথ এবং জে. এম. রবার্টসন থেকে। বলা যায়, দুই শতাব্দীর এই আলোচনা খ্রিস্টবিশ্বাসকে যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে সেই অবস্থান থেকে খ্রিস্টানত্ব আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি।

যোশেফাস: 'সে যদি কোনও মানুষ হয়ে থাকে... '

যিশুর অস্তিত্বের সপক্ষে কী প্রমাণ থাকতে পারে? বলা হয়, তার সম্পর্কিত আদি অ-খ্রিস্টান সূত্র হচ্ছে প্রথম শতাব্দীর ইহুদি ঐতিহাসিক ফ্লাবিয়াস জোশেফাসের (৩৭-১০০) অ্যান্টিকিউটিস অফ দি জিউশ (৯৩?)। যোশেফাস লিখেন–

> যিশুর সময়কালে, একজন পবিত্র মানুষ, যদি তাকে মানুষ বলা যায়–নানা আজগুবি কাণ্ড করে দেখাতেন; উপদেশ দিতেন এবং সত্যকে গ্রহণ করেন সানন্দে; ইহুদির সঙ্গে অনেক গ্রিকও তার অনুগামী হয়েছে। তিনি ছিলেন মসিহ।

এখানে, প্রথমেই যা বলতে হয়, যোশেফাস যিশুর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তিনিও লিখেছেন শোনা কথা থেকে। এছাড়া মুশকিল হল যে, এই পঙ্‌ক্তিগুলো মেনে নিতে অস্বীকৃতি দেখিয়েছেন খোদ খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদরাই। ওই সময়কার বিবদমান রোমান ও ইহুদিরা এটিকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

প্লিনি থেকে ক্লদিয়াস

এরপর দেখা মিলছে কনিষ্ঠ প্লিনির (১১০)। এই রোমান রাজকর্মকর্তা সম্রাট ট্রজানের কাছে লিখা চিঠিতে এই বলে উপদেশ চাইছেন যে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার ব্যবহার কী রকম হবে। এরপর দেখা যায় রোমান ঐতিহাসিক টেসিটাসকে (৫৫-১১৭), যিনি প্লিনির পাঁচ বছর পর রোমে নিরোর হাতে খ্রিস্টান নির্যাতনের বিবরণ দিচ্ছেন। এতে এরইমধ্যে সাম্রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত খ্রিস্ট অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যেরও উল্লেখ আছে। সুয়েটনিয়াসেও (১২৫), রোমান আত্মজীবনীকার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক, একই বর্ণনা। তবে সুয়েটনিয়াসের প্রতিবেদনে ক্লদিয়াসের একটি হুকুমজারি (৫২) মিলে। যাতে দেখা যায়, ক্লদিয়াস তাড়িয়ে দিচ্ছেন 'ইহুদিদের যারা খ্রিস্টে প্রাণিত এবং জনবিঘ্নতার কারণ হচ্ছিল'। ইতিহাস-ভাষ্যকারদের মতে, এ থেকেও খ্রিস্ট সপ্রমাণিত হন না, যদিও খ্রিস্টান অস্তিত্বই ধরা পড়ে।[৫]

পলীয় 'সাক্ষ্য'

যিশুর সপক্ষে খ্রিস্টান সাক্ষ্য হচ্ছে পলের চিঠিপত্র। কিন্তু সেগুলো নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। বলা হয়, পলের নামে লিখিত হলেও তিনি এসবের আসল লেখক নন। প্রকৃত লেখকেরা অজ্ঞাত। এছাড়া খোদ পলীয় অস্তিত্বও প্রশ্নবিদ্ধ; যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধতা আছে পিতর, ইয়াকুব এবং যোহনের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ঘটনাগুলো নিয়ে। পল যিশুর সরাসরি কোনও শিষ্যও ছিলেন না, বা সুসমাচারীয় কোনও ঘটনায় তার উপস্থিতি মিলে না। পলীয় রচনাবলিতে যিশুর শেষ নৈশভোজ, ক্রুশবিদ্ধতা, পুনরুত্থান ইত্যাকার যে বিষয়গুলো আছে, ধরে নেয়া যায়, সেসবও শ্রুতি। এছাড়া পলীয় চিঠিপত্রগুলো যিশুজীবনী নয়; মূলত বিভিন্ন সমাজগৃহের কাছে পাঠানো উপদেশ সংকলন। এসবকে বলা যায়, সমকালীন খ্রিস্টান বিশ্বাস, মুক্তি ও সম্প্রদায়গত আচরণের বিধৃতরূপ, একইভাবে পলীয় ধর্মতাত্ত্বিক উপাদান। পলীয় রচনাবলি বিবেচিত হয়ে থাকে খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীকার খ্রিস্টান তত্ত্বের অন্তর্বিরোধগত প্রতিবেদন হিসাবে। তার্শুস ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠেছিল–এগুলো তারও প্রতিফলন। বলা হয় যে, পল নিজ হাতে কোনও চিঠি লিখেননি। গৃহবন্দিত্বে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। অন্যরা তার নির্দেশনায় লিখেছে এবং এই লেখকদের শিক্ষাগত মান ও যোগ্যতাও নিয়েও রয়েছে সংশয়। বলা হয়, অনেক কিছুতেই তার নাম জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন–গালাতীয়, করিন্থীয়, এবং ফিলিমন। সম্ভবত, ইফিশীয়ও সেগুলোরই একটি।

প্রসঙ্গঃ সুসমাচার

সুসমাচার সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি বলতে হয় তা হল, এগুলোর লেখকদের যিশুর শিষ্য বলে দাবি করা হলেও, এদের কেউই প্রেরিত ছিলেন না; পরে এদের নামে এগুলো রচিত হয়েছে–এরকম ধারণাই জোরালো। সুসমাচারগুলো যেভাবে আছে সেভাবে ওগুলোকে বোঝাও অত সহজ নয়। আদি সুসমাচারগুলো রচিত হয় ৬০/৭০ থেকে ১১০/১২০ সালের মধ্যে। নতুন নিয়মকে কানুনিক রূপদান প্রক্রিয়া শুরু হয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে। সম্ভবত পলীয় দশ চিঠির সংকলনও

এসবে ছিল। বলা হয়, প্রায় দুই শতাব্দী যাবত 'পুরাতন নিয়ম' ছাড়া খ্রিস্টানদের নিজস্ব কোনও গ্রন্থ ছিল না। ইহুদি বাইবেলও সামগ্রিকভাবে মান্য হয়নি। নতুন নিয়মের লিখিত অনুবাদের প্রকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু এর গ্রন্থসমষ্টিকে যে ধর্মপুস্তকরূপে মেনে নিতে হবে বা পুরাতন নিয়মের মতো করে দেখতে হবে, তাও ছিল ভাবনার বাইরে। সমমর্যাদা দেয়ার চিন্তা তখনই জেগেছে যখন নানা খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চেয়েছে বাঁধাধরা নিয়ম। এভাবেই দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে 'নতুন নিয়ম' একটি ধর্মগ্রন্থ হয়ে ওঠে। এছাড়া ওই শতকের শেষের দিকে ধর্মতাত্ত্বিক ও নস্টিকবিরোধী লড়াকু আইরিনাস (১৪০-২০২) কানুনের মনকাড়া কর্তৃপক্ষীয় অংশকে সুসমাচাররূপে অভিহিত করার সপক্ষে যুক্তি দেখান। অন্যান্য গ্রন্থও গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে। মিশরীয় চার্চ বর্তমান ২৭টি গ্রন্থের বেশি ব্যবহার করে, সিরীয়-ভাষীরা করে কয়েকটির। চতুর্থ শতাব্দী ধরে সরকারি কানুনের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। এরকমটি ঘটে মূলত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ আথেনাসিয়াস-এর প্রভাবে, আর–জেরোমি, তার হাতে সংকলিত হয় ভালগেট। এ কারণেই দেখা যায়, খ্রিস্টান লেখকরা পুরাতন নিয়ম থেকে ইচ্ছেমতো উদ্ধৃতি টানছেন (এক হিসাবে ১০০টি), কিন্তু নতুন নিয়ম থেকে কোনও উদ্ধৃতি তারা দিতে পারছেন না। এমনকি পলের কোনও চিঠিপত্রেও সেই প্রমাণ নেই।

কানুন, নিকায়া ও তথ্যবিভ্রান্তি

বর্তমান কানুনিক রূপ পেতে নতুন নিয়মকে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে নিকায়ার পথ চেয়ে। এর আগে পর্যন্ত, যেমনটি আগেও উদ্ধৃত হয়েছে, ঘটেছে নানা সংযোজন-বিযোজন, সংশোধন ও পরিবর্তন। নকল হতে গিয়ে শিকার হয়েছে ভুল-ভ্রান্তি, এবং বিকৃতিরও। বলা হয়, বাইবেলের বর্তমান রূপে নকলনবিশদেরও ফেরকাগত দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছে। সমসাময়িক ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাতে গিয়েও রূপান্তরিত হয়েছে মূল লিপি।[৬] এছাড়া ঠাসা আছে অজস্র পরস্পরবিরোধী তথ্য, যেমন–মথি ও লুক জানাচ্ছেন, যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেম, কিন্তু মার্ক বলছেন, নাসরত।[৭]

সিনোপটিকস[৮] ও যোহন

সুসমাচারগুলোর প্রথমটি হচ্ছে মথি। আইরেনাসের মতে, এটি প্রথম লিখিত হয় হিব্রুতে, যার মানে, অরামীয় ভাষায়। কিন্তু বর্তমানকালে এসে পৌঁছেছে গ্রিক রূপ নিয়ে। সমালোচকদের মতে, এটি সম্ভবত ৮৫ থেকে ৯০ সালের মধ্যে মথির কোনও শিষ্য বিরচিত। যার উদ্দেশ্য ছিল, ইহুদিদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর। মথিতে অন্য সুসমাচারীয়দের তুলনায় অনেক বেশি অলৌকিকতা মওজুদ। এরকম ধারণা যে, যিশুকে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা হিসেবে দেখাতে গিয়েই এরকমটি করা হয়েছে। বলা হয়, ১৫০ সালের আগে পাপিয়াস নামের একজন প্রেসবেটর লিখেন (১৩৫) যে, মার্ক সুসমাচার লিখিত হয়েছে তার স্মৃতিকথা থেকে। তা-ও–পাপিয়াস এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করেছেন 'জ্যেষ্ঠ যোহন' নামের একজনকে। এ-সত্ত্বেও অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, মার্ক নামের সুসমাচার লেখক প্রথম দিককার কোনও অজ্ঞাত মার্ক। যিনি প্রেরিত মার্ক নন। লুকের সুসমাচার সম্পর্কে সাধারণ অভিমতটি যে, এটি লিখিত হয়েছে প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকে। অ-ইহুদি এই লুক ছিলেন পলের বন্ধু এবং প্রেরিত পুস্তক রচয়িতা। লুক চেয়েছিলেন যিশুর প্রথমদিকার বিবরণের মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি মথির মতো মার্ক থেকেও প্রচুর নিয়েছেন; একইভাবে তার মিল দেখতে পাওয়া যায় মথির সঙ্গে। ধারণা করা হয় যে, লুক মথি থেকে নিয়েছেন, নয়তো এই দুটি গ্রন্থের উৎস একই, যেটি এখন বিলুপ্ত। যোহন সুসমাচার অন্যদের থেকে ভিন্ন–কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও। বলা হয় যে, যোহন হচ্ছে সিনোপটিকগুলোর ধর্মতাত্ত্বিক বিকাশ। যদিও এগুলোর, সিনোপটিকস, সঙ্গেও তার তীব্র অমিল, অন্তত একশ জায়গায়। যোহনের যিশু একজন ওসিলা (লগোস)। স্পষ্টত, যেমন গ্রিকপ্রভাব, তেমনি আহামরিও কিছু নয়; কারণ–ওই সময়কার মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় ও নানা অঞ্চলের নানা ধর্মে এরকম ওসিলা ছিলেন, এমনকি অনেক আগে থেকে–যিশুজন্মেরও আগে থেকে–ভারতবর্ষে, পারস্যে, মিশরে।

সমালোচকদের মতে, সুসমাচারগুলোতে অজস্র বৈপরীত্যসহ ইতিহাসের অনেক অসমর্থিত বর্ণনাও আছে। সাদৃশ্য রয়েছে প্যাগান দেবতা এবং পুরাণ-কিংবদন্তির সঙ্গে। যিশুকে পুরাতন নিয়ম ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রমাণ হিসেবে দেখাতে গিয়েও নানা ঘটনা তৈরি করা হয়েছে। চার্চ মতবাদ ও রীতি-প্রথার সঙ্গে সম্ভবত পরবর্তীকালের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সংযোজিত হয়েছে। বলা হয়, ইতিহাসকে নৈতিকতা গাড়ির সঙ্গে জুৎ দিতে গিয়ে সুসমাচারীয়রা সিসেরো, সালুস্ত এবং টেসিটাসের ধারণার অংশীদার হয়েছেন; তাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়েছে দুর্বল এবং অস্বচ্ছ স্মৃতিশক্তির। নকলনবিশদের ভুল সংশোধনও বিকৃতি ঘটিয়েছে। ব্যাপার এমন, বলা হয়, নতুন নিয়মের প্রামাণ্যতা পরীক্ষায় 'উচ্চতর সমালোচনা' পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটালে দেখা যাবে যে হামুরাবি, দাউদ, সক্রেটিসের মতো প্রাচীন ধীমান ও রাজাদের নিয়ে গড়ে-ওঠা কিংবদন্তিও যিশুর সামনে ম্লান হয়ে পড়ে।

ইতিহাস যদিও...

ধরা যাক, যিশু নামের কেউ একজন ছিলেন। কিন্তু এতটুকু বললেও যেন নিষ্পত্তি মিলে না। এরপর প্রশ্ন ওঠে–কে ছিলেন তিনি, কী ছিল তার শিক্ষা? উত্তর আসে এভাবে যে, সম্ভবত, জানা ইতিহাসের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো সবচেয়ে কঠিন।

কারণ জেরুসালেমে মানুষ যিশুকে নিয়ে ডালপালা মেলেছিল নানা জনশ্রুতি। যিশু শিষ্যদের সঙ্গে মিশেল ঘটেছিল অ-ইহুদির। বিশ্বনিয়ন্তা সম্পর্কিত এদের ধারণা প্রভাবিত হয়েছিল নব্য-পিথাগোরীয় বা প্লেটোনিক মতবাদ দিয়ে। নিজ শিষ্যদের মধ্যেও ব্যক্তি যিশু ছিলেন ধোঁয়াশাপূর্ণ; অনেক বদ্ধমূল ধারণাও ছিল তার প্রতি। এসব থেকে দ্রুত জন্ম নিচ্ছিল হরেক মতবাদ ও গোষ্ঠী। তার মূল করুণগাথা রূপান্তরিত হচ্ছিল অলীকতায়। বিনির্মিত কাহিনী তার প্রকৃত জীবনাখ্যানকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করেছিল যে, 'আজ আমাদের পক্ষে এ কথা জানা সম্ভব নয়–তিনি বাস্তবিকপক্ষে কী ছিলেন এবং কী করেছিলেন (ইসলাম, দি স্পিরিট অফ, পৃ ৩৬)'।

সূত্র: Caeser and Christ, p 553-57; Ency. Chambers'/Jesus Christ (Source of the Traditions, The Gospels); Ency. Grolier's/ Bible (The Canon, Division of the New Testament), Ency. Merit/New Testament; Bucaille, p 54-81; Encarta/Higher Criticism, The Debate Over the Historical Jesus and the Christ of Faith; members.cox.net/Evidence that Jesus Never Existed; Wikipedia/Bruno Bauer; আবির্ভাব (বাইবেলের ভেতরে কার কণ্ঠস্বর শুনি?); দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম।

টীকাসমূহ

১. পন্টিয়াস পিলেত: যিশুর সময়কার ফিলিস্তিনের রোমান শাসনকর্তা (প্রকিওরেটর)। নতুন নিয়মের বর্ণনামতে, ইহুদিদের ক্রমাগত দাবির মুখে পিলেত যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার নির্দেশ দেন (খ্রি ৩০ অথবা ৩৩)।

২. পুরো নাম– হারমান সামুয়েল রেইমারাস (Reimarus): বিখ্যাত গ্রন্থ- *The Aims of Jesus and His Disciples*, প্রকাশকাল ১৭৭৮।

৩. ডেভিড ফ্রেডরিখ স্ট্রস (১৮০৮-১৮৭৪): জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক। তার সাড়া জাগানো গ্রন্থ: *The Life of Jesus* (1835; trans. 1846) *The Old Faith and the New* (1872; trans. 1873), *The Life of Jesus.*

৪. ফার্দিনান্দ খ্রিস্টিয়ান বাউর (১৭৯২-১৮৭৪): জার্মান প্রটেস্টান্ট ধর্মতত্ত্ববিদ। নতুন নিয়ম অধ্যয়নের জন্য তিনি Tübingen School of New Testament studies একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন এবং আধুনিক চার্চ ইতিহাস অধ্যয়ন এবং ধর্মতত্ত্ব ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত।

৫. ডুরান্টে (Caesar and Christ, p-555) একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যেমন, 'জুলিয়াস আফ্রিকানাসের কাছে সংরক্ষিত একটি খণ্ডাংশে দেখা যায়, প্রথম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে থেলাস নামের এক প্যাগানের এই যুক্তি যে খ্রিস্টের মৃত্যুকালে যে অতিপ্রাকৃতিক অন্ধকারাচ্ছন্নতার উল্লিখিত হয় সেটি ছিল নিখাদ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং কাকতালীয়।' এই উদ্ধৃতি থেকে ডুরান্ট নিজে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেননি।

৬. দানিকেন জানাচ্ছেন: ''জুরিখের ডা. রর্বেৎ কেল্ এই মিথ্যাচার সম্পর্কে লিখেছেন–'প্রায়ই দেখা যায় একই অংশের 'সংশোধন' একজন করিয়াছেন একটি বিশেষ অর্থে, তাহার পরেই আরেকজন তাহার 'পুনঃসংশোধন' করিয়াছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। এই সকল সংশোধন ঘটিয়াছে, আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুসারে, ফলে বিশুদ্ধ প্রথম পাঠের স্থান দখল করিয়াছে, নিখুঁত জগাখিচুড়ি এবং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যে সকল 'সংশোধন' করা হইয়াছে, তাহাদেরই কারণে বেশি পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে এমন বিভ্রান্তিকর বিশৃঙ্খলার''-আবির্ভাব, পৃ ৫

৭. এছাড়া ''ব্রহ্মগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজনে 'মূল পুঁথিসমূহ' হামেশা ওল্টানো হয়, কিন্তু মূল পুঁথির তো অস্তিত্বই নেই। কী তাহলে আমাদের হাতে আছে? আছে প্রতিলিপি, ব্যাতিক্রমহীনভাবে বলা যায়, তাদের উৎপত্তি চতুর্থ থেকে দশম শতাব্দীর ভেতরে। আর সে প্রতিলিপি, যাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০, তারা প্রতিলিপিরও প্রতিলিপি, কেউ কারুর সঙ্গে মেলে না। গুণে দেখা গেছে, ৮০,০০০ (!)-এরও বেশি অমিল তাতে আছে। মূল পুঁথিতে এমন একটি পাতাও নেই যাতে অমিলের অভাব আছে। প্রতিটি বিভিন্ন প্রতিলিপিতে শ্লোকসমূহের বিভিন্ন অর্থ করেছেন দরদী লেখকেরা এবং সে অর্থ হয়েছে সমকালীন প্রয়োজন মতো। বাইবেলের মূল পুঁথিসমূহে সহজে প্রমাণসম্ভব হাজার হাজার জানা ভুল আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা সিনাইটকাস পুঁথি তার বড় প্রমাণ। ভাতিকানাস্ পুঁথির মতো তাকেও পাওয়া গিয়েছিল সিনাই মঠে। তার ভেতরে সংশোধন আছে ১৬,০০০। আর সংশোধকের সংখ্যা মনে হয়, অন্তত সাতজন। অনেক জায়গায় তিনবার বদলানো হয়েছে। চতুর্থবার সব কেটে দিয়ে চতুর্থ 'মূলপাঠ' বসানো হয়েছে। হব্রু-অভিধান প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর ফ্রিদরিখ দেলিৎশ্ দেখিয়েছেন 'মূলপাঠে' নকলের ভুল আছে ৩০০০। 'মূল পুঁথি'র এই কারবার ব্রহ্মবিদ্যাগত বর্ণনাশৈলীর একটি মহা লক্ষণ। 'মূল পুঁথি' বলতে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষ বোঝে সর্বপ্রথম অনুবাদটিকে, যা তর্কাতীত, অবিসম্বাদিত। যদি গির্জের চূড়ো থেকে ঘোষণা করা হয় যে ওই অর্থে মূল পুঁথির অস্তিত্ব নেই, তাহলে খ্রিস্টান অজ্ঞ-সাধারণ কী বলবেন?''(আবির্ভাব, পৃ ৫৫-৫৬)। তুলনামূলক আলোচনায় কুরআন সম্পর্কিত একটি মন্তব্য এরকম–'আবু বকর প্রথাগতভাবে কোনও সংশোধন আদৌ করেছিলেন কি না, সে ব্যাপারে আধুনিক গবেষকদের সন্দেহ আছে। তারা আরও মনে করতেন যে, উসমান বিভিন্ন পাঠযুক্ত অনেকগুলো হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আরব, সিরিয়া ও আল ইরাক শহর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মদীনায় প্রাপ্ত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোকে উসমান অধিক মাহাত্ম্য দান করেছিলেন এবং অন্য সমস্ত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন।

৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুপণ্ডিত ইবনে মুজাহিদের সাহায্যে ইবনে মুকলাহ ও ইবনে মুসা নামের দুই উজির শেষ পর্যন্ত মূলপাঠটি স্থির করেন। ইবনে মুজাহিদ সাতটি বিভিন্ন পাঠের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। স্বরবর্ণের অভাব এবং মুদ্রণ চিহ্নগুলোকে আনুনাশিক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এতগুলো বিভিন্ন পাঠের সৃষ্টি হয়েছিল।'-হিট্টি, পৃ ১১৭ ৭ এই বৈপরীত্য দেখে দানিকেন বলছেন, 'মুক্তিদাতার জন্মকাল থেকে, বিভ্রান্তি এবং বিরুদ্ধমতের কারণে, বাইবেল পাঠ বিপজ্জনক।'-আবির্ভাব, পৃ ৭০

৮. নতুন নিয়মের প্রথম তিনটি সুসমাচারকে–মথি, মার্ক ও লুক–সিনোপটিকস বলে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ–'সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন' এবং এজন্য যে, এই তিনটিতেই খ্রিস্টের জন্মস্থান বেথলেহেম বলে
উল্লিখিত হয়েছে।

ইতিহাসভক্ত বলে ভেবে সে আমাকে সেঁকে দেয় কালের কঙ্কাল

গা জী র ফি ক

তথাকথিত অর্থে আমি দার্শনিক অথবা ইতিহাসবেত্তা নই। তা না হলেও ইতিহাস পাঠের অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হিসেবে। ছাত্র হিসেবে ইতিহাসের কিছু শিখতে পারিনি, অর্থাৎ আমার ঝুলিতে ইতিহাসের তেমন রত্ন কিছু জমা নেই। মানুষ হয়ে জন্মেছি অথচ মনুষ্যজন্মের তাৎপর্য অথবা মানবজাতির শুরু ও তার সভ্যতার বিকাশ কীভাবে ঘটল অথবা মানুষের বংশবিস্তারের বাস্তব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পর্যালোচনা ও তত্ত্ব-তালাশের ফুরসৎ হয়নি এটি লজ্জাকর। সভ্যতা বলতে আজ মানবজাতির যা অর্জন তা তার ইতিহাসজ্ঞানের কারণেই। কোরানে আছে মানুষ সমগ্র সৃষ্টি মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর কারণ হচ্ছে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ মগজের ব্যবহার করে নিজেকে সঠিক পথে পরিচলিত করতে পারে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে। যে তা করতে পারে না এবং ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞ, মানুষের চিন্তা ও কর্মগত বিবর্তন তথা অগ্রযাত্রার ইতিবৃত্ত তার কানে প্রবেশ করেনি বিধায় তাকে অন্য জন্তুর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে যুক্তিসঙ্গতভাবে। ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রয়োজন হচ্ছে, মানুষের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার তার পূর্বপুরুষের সংগ্রামের উৎপাদনের, বিপণনের। আর ইতিহাস অতীতকালের ইতিবৃত্ত। তার যথাযথ তথ্য সবসময় সহজলভ্য হয় না। ফলে ইতিহাসের সত্য নির্ণয়ের কাজটি কীভাবে সঠিক ও সহজতর উপায়ে করা যায় তার নানারকম দিকনির্দেশনা হতে পারে। আবার ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি ও পরিধি নিয়েও ভিন্নতর মতামতের প্রচলন রয়েছে। মূলত এটিই ইতিহাসের দর্শন আলোচনার প্রেক্ষাপট। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং মানব ইতিহাসের ক্রম-পরম্পরার মূলে যেসব কার্যকারণ সংগঠিত হয়েছে তার রহস্য অনুসন্ধান ইতিহাসের প্রকৃত দর্শন। ইতিহাসের দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে ইবনে খলদুনের (১৩৩২-১৪০৬) 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থটি দিকনির্দেশক। এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য মানুষকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাসের চর্চা। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ইবনে খলদুনের ইতিহাস আলোচনার দার্শনিক অঙ্গীকার। যে সমাজব্যবস্থা তার যথাযথ বিশ্লেষণের ন্যায়ভিত্তিক যে ইতিহাস প্রেক্ষাপট তাতেই নিহিত রয়েছে ইতিহাসের দর্শন। ইতিহাসের যে বস্তুনিষ্ঠতা তা কল্পনা বিস্তার থেকে বহু বহু দূরবর্তী। ইতিহাসের প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের জন্য সততা ও দায়িত্বশীল অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ দরকার মানুষের তৈরি সংগঠনসমূহের সভ্যতার অগ্রযাত্রার নিরিখ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। ইতিহাস দর্শনের প্রেক্ষাপটে খলদুনের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু তার অনুসারী ভিকো (১৬৬৮-১৭৭৪) তার 'নিউসায়েন্স' গ্রন্থে মানবিক জ্ঞানের নানা বিষয়কে একত্রিত করে সমন্বিত মানববিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাকে ইতিহাস দর্শনের জনক মনে করেন অনেকে। ভিকোর মতে মানুষের বিবর্তিত চেতনার মধ্যে ইতিহাসের প্রকৃত উত্তরণ নিহিত। চিন্তাকে ইতিহাস বিবেচনার পথে প্রয়োগের বিষয়টি ইতিহাসের আলোচনাকে প্রগতিশীল অধ্যায়ে স্থাপন করে। যেমন বাংলাদেশের একজন নাগরিক বাংলাদেশী এটি একটি বাস্তবতা কিন্তু এই নাগরিকটি জাতিগতভাবে ঐতিহ্যগতভাবে সংস্কৃতিগতভাবে সভ্যতাগতভাবে আচরণগতভাবে বাঙালি এটি একটি চেতনাগত সত্য এবং এর মাঝে প্রগতির ধারণা শক্তি অর্জনের ভিত্তি লাভ করে। অথচ এ নাগরিকটি বাঙালি ও বাংলাদেশী এ যুগপৎ সত্যে আমাদের ঐকমত্য অনিবার্য। সত্য নির্ণয়ের জন্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার এই যে চেতনা এটাই ইতিহাসের দর্শন। যেমন নবী ইব্রাহীম (আ:) ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মান্য মানবজাতির পিতা। আবার তিনিই আর্য সমাজের হিন্দুদের ব্রহ্মা হিসেবে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারণা আব্রাহামকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। আমরা জানি রামমোহন রায় ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি তুফাৎ-উল মুহাহিদিন নামক আরবি ফারসি গ্রন্থ রচনা করে হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার ভিত্তি ছিল প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনা স্বীকৃত। ব্রহ্মার উপাসনার মাধ্যমেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর

প্রকাশ। এ ব্রাহ্মণরা আর্য সম্প্রদায়, এরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এশিয়া মাইনর হয়ে ক্রমশ পূর্বে এবং অন্য অংশ ইউরোপের দিকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। এরাও আর্য, আর্যরা প্রকৃত অর্থে কোনো জাতি নয় এরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উত্তরসূরি। আবার হযরত ইউসুফ (আ:)-এর সাথে ভারতীয় হিন্দুসমাজের শিবের সমীকরণও আর্য সমাজের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চল থেকে। মূলত মানবসমাজ উল্লেখিত অঞ্চল থেকে পৃথিবীর নানা অংশ পূর্ব-পশ্চিমে ক্রম-বিস্তার লাভ করে। এটা খৃস্টপূর্ব তিন থেকে সাত হাজার বছরের ভিতরে। বিশ্বব্যাপী মানুষের বংশবিস্তারের এ ইতিহাস সভ্যতার গোড়াপত্তন নৃবিজ্ঞান গবেষণা, ওল্ডটেস্টামেন্ট এবং কোরানিক তথ্যের সমন্বিত সত্য। সঠিক ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য ইতিহাসবেত্তার বস্তুনিষ্ঠ ও বিবর্তননিষ্ঠ এমনকি মানবসভ্যতার প্রাচীন সংগঠন, রাষ্ট্র সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চেতনাবিজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া অনিবার্য। ইতিহাস নিয়ে হঠকারী রাজনীতি না করে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সৎ ও শিষ্ট বিচার বুদ্ধির প্রয়োগই ইতিহাসের দর্শন।

দুই

ইতিহাসেরও অজ্ঞাত মহাকাল আবেগে লিখেছি আত্মসংবরণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত শাখা আছে তার সবই ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত। ইতিহাস যেহেতু অতীতের বিবরণ অথবা ইতিবৃত্ত জ্ঞানের সব বর্তমান চর্চাকেই তার সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বিবর্তন, চর্চা অথবা বিবরণের দ্বারস্থ হওয়া বিকল্পহীন। সব জ্ঞানেরই অতীত ইতিহাস মানুষের সকল চিন্তা জ্ঞান ও অর্জন অথবা সফলতার ধারক। আমরা বলতে পারি ইতিহাস হচ্ছে জল আর তার ভিতর বাস করে সোনালি রুপালি নানা রকম মৎস্যপ্রজাতি। হরেক রকম জীববৈচিত্র্য যে বর্তমান রয়েছে তা জ্ঞানের নানা অনুষদ ও শাখা। আমরা কেন ইতিহাসের কাছে যাব, এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে আমরা কী কারণে বেঁচে থাকতে চাই, আগামীকালকে আজকের দিনের থেকে আরো ভালো করে উপভোগ করতে চাই, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে চাই, এসব প্রশ্ন-পরম্পরার নিত্যনৈমিত্তিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন মেটানোর যে সংগ্রাম তার বাস্তবতার মধ্যে। ইতিহাসের দর্শন হচ্ছে জ্ঞানের সকল অনুষদে প্রকৃত সত্যসূত্রকে নির্ণয় করে যথাযথ তথ্যে বিশেষ জ্ঞানকে অব্যর্থভাবে অগ্রবর্তী হতে দেয়া। এটা হতে দিতে হবে এ কারণে যে, মানবজাতি যাতে তার সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের পথে সম্ভাব্য সকল আনুকূল্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারে। মানুষের ক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশের পথে সকল বাধা দূর করে জগৎ-অস্তিত্বের মৌলিক সত্য বিশ্লেষণ করে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিজয় নিশান ওড়ানোই ইতিহাসের দিকদর্শন। নানাভাবে আজকাল আমরা ইতিহাসের বিকৃতি দেখি। মিথ্যার আশ্রয়ে ইতিহাসচর্চাকে আমরা ক্যান্সার-আক্রান্ত হতে দেখি। ইতিহাসভক্ত বলে ভেবে সে আমাকে সেঁকে দেয়। কালের কঙ্কাল আর প্রত্নরাজি বিবর্ণ অতীত। এই সব ফেতনা সৃষ্টিকারী ইতিহাস ও সাহিত্য ব্যবসায়ীরা সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের তৈরি করা মিথ্যার জঞ্জাল রচনার মাধ্যমে। আমাদের দেশে এক ধরনের তথাকথিত লেখককে আমরা দেখি, এরা নিজেদের গবেষক, সাহিত্যিক অথবা ইতিহাসকার বলে ঘোষণা করেন। এরা গর্বের সঙ্গে বলেন, আমি একশত বই লিখেছি। দুই তিনশত বই লিখেছি, এরা আসলে বই তৈরি করার এক ধরনের কৌশল দুর্বুদ্ধি অর্জন করেছেন। দেশি-বিদেশী লেখকদের বই এবং পত্রিকা থেকে কেটে ফটোকপি করে এরা তাদের বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এ অনাচার ও চৌর্যবৃত্তি এমন কৌশলে তারা করেন সবার চোখে ধুলো দিয়ে। বই প্রকাশের জন্য, সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তারা হেরোইনখোরের মতো নেশাগ্রস্ত। এই সব অপোগণ্ড গবেষক তথাকথিত সাহিত্যিক ইতিহাস ও সমাজকে বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেন। এরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার কাজে শয়তানের মতো পারদর্শী। ক্ষীণদর্শী অপতৎপরতায় লিপ্ত এই সব অথর্ব আত্মপূজায় নিমজ্জিত। আল্লাহ এদের অন্তরে ও দৃষ্টিতে মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা রহিত এসব লোভী, জঞ্জাল সৃষ্টিকারী যা রচনা করেন তার পুরোটাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এসব বই প্রণেতাদের শত শত বইয়ের সারমর্ম এরা জীবিতকালে নিজেদের চতুর বুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে লেখক, জ্ঞানী লোক বলে প্রচার করতে চেয়েছিল। এদের ধারণা শত শত বই লিখতে পারলে বড় লেখক হওয়া যায় এবং জননন্দিত হয়ে সামাজিক সুনাম-প্রতিপত্তি অর্জন করা যায়। এরা অন্যের পা চাটে নিজের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। এই শ্রেণীর বই প্রজননকারীদের অসংখ্য বইয়ের মধ্যে থেকে সত্যিকার লেখকের বই খুঁজে পাওয়া একজন সাধারণ নতুন প্রজন্মের পাঠকের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ফলে জঞ্জাল সৃষ্টিকারীদের কারণে প্রকৃত লেখকদের বই খুঁজে পান না পাঠক অথবা দেরিতে পান। এ অবস্থাটি সমাজ-চিন্তা ও মানুষের মনোগঠনকে বিপর্যস্ত করে। এসব অতিপ্রজ গ্রন্থকাররা তাদের বইতে যে দায়িত্বহীন অসুস্থ ও মিথ্যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য প্রদান করেন ও বিভ্রান্তি ঘটান তাতে সুস্থ চিন্তার ক্ষেত্রে পাঠকের জন্য বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ পরিস্থিতিতে সাহিত্য গবেষণা ও সমাজচিন্তার সার্বিক বিকাশের জন্য ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা, তত্ত্ব ও দর্শনটি কী তা আমাদের ব্যাপকভাবে বুঝে উঠতে হবে এবং ইতিহাসের তথ্য ও সত্যকে সুরক্ষিত করতে হবে। ইতিহাস ও সাহিত্যের তথাকথিত ব্যবসায়ী গবেষক ও আত্মপূজারী অতিপ্রজ গ্রন্থকারদের অসাধু তেলেসমাতি থেকে পাঠকসমাজকে সতর্ক করার জন্য প্রকৃত ও কমিটেড প্রতিভাবান লেখক ও গবেষকদের আজকে ইতিহাস ও গবেষণা দর্শন নিয়ে প্রকৃতই ভাবা উচিত।

নারীর ইতিহাস দর্শন: কয়েকটি সম্পূরক কথা

জো হ রা পা রু ল

'নারীর ইতিহাস নেই'– বলেছেন হেলেন সিজো। কারণ সে ইতিহাস জুড়ে নীরব ছিল, নির্বাক থাকতে বাধ্য হয়েছিল। সিজোর প্রতিধ্বনি করে আরেক ফরাসি নারীবাদী জেভিয়ার গোথিয়ার ১৯৮১ সালে লেখেন, ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে নারীর মুখ চেপে রাখা হয়েছে। নিজের কথা সে বলতে পারেনি। তাই নারীর কোনো ইতিহাস নেই। নারীর ইতিহাস নামে যা আমরা পাঠ করি তা পুরুষের ইতিহাসে নারী-সম্পর্কিত অংশ/অধ্যায় মাত্র; তার রচয়িতাও পুরুষ। নারীকে তার নিজের ইতিহাস রচনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী যদি এখনো নীরব থাকে তাহলে সে থেকে যাবে ইতিহাসের বাইরে, আর যদি সে কথা বলে– পুরুষের কথা বলার ধরনে– তবে সে ইতিহাসে প্রবেশ করবে বশীভূত ও বিচ্ছিন্ন এক শ্রেণী হিসাবে। কারণ তার নিজের রচিত ইতিহাস নেই। পুরুষের চিন্তাকাঠামোর সাথে নিয়ত সংগ্রাম করে তাকে লিখতে হবে পেছনের ইতিহাস– পুরুষ কর্তৃক তাকে নির্যাতনের ও বশীভূতকরণের ইতিহাস, এবং লিখতে হবে তার ভবিষ্যতের ইতিহাস, মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইশতেহার।

পৃথিবীতে নারীই সবচেয়ে করুণ, ঘৃণ্য ও দীর্ঘতম শোষণের শিকার। সামাজিক আবর্তনে শোষক ও শোষিত পুরুষ প্রজন্মক্রমে স্থান বদলাতে পারে। আজ যে শোষক তার পরবর্তী প্রজন্ম হতে পারে শোষিত। কিংবা সে আধা-জীবন শোষিতের ভূমিকায় কাটিয়ে আধা-জীবন পেতে পারে শোষকের সিংহাসন। কিন্তু নারী শোষিত হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তার শ্রেণী শোষিত হয়ে এসেছে আমাদের জানা ইতিহাসের সূচনা থেকে, হয়তো আরো পূর্বকাল হতে। পুরুষের এক অমোঘ শিকারি নারী, যেন এ-ই তার নিয়তি।

নারীকে ঘিরে পুরুষের রচিত শোষণের বিন্যাস ও পদ্ধতিটি এতটাই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যে, নারী নিজেকে ভালো করে চেনার বা পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করার সুযোগও পায়নি, উপলব্ধি করতে পারেনি কত হাজার বছরের নিপীড়নের চিহ্ন তার দেহ ও মনে। তাই অধিকাংশ নারী মেনে নিয়েছে পুরুষের আধিপত্য। আর পুরুষ নারীর সাথে সবচেয়ে অন্তরঙ্গতম জৈব-সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র ও নিষ্ঠুরতম প্রাণীর মতো অব্যাহত রেখেছে তার শোষণ ও শোষণের প্রক্রিয়া। পুরুষ কর্তৃক রচিত বর্তমান সভ্যতার একটি চারিত্র্য হল একদল বা ব্যক্তি কর্তৃক আরেক দল বা ব্যক্তিকে শোষণ; শোষিতের দল বা শ্রেণী হিসাবে নারী-সমাজ সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে সম্পদশালী এবং লোভনীয়। শোষণের এই নিশ্চিত ক্ষেত্রটি পুরুষ হাতছাড়া করতে চায় না।

পুরুষের মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থগত দ্বন্দ্ব আছে, সংঘর্ষ আছে; কিন্তু নারী-শোষণের প্রশ্নে সকল পুরুষই ঐক্যবদ্ধ। পুরুষ নিজের মতো করে উপলব্ধি করেছে ভোগে, সেবায়, সন্তান-ধারণ ও লালন-পালনে নারীর বিকল্প নেই। এমনকি কেবল জৈবিক কারণেও নারী ছাড়া মানবসভ্যতা সচল থাকতে পারে না। তাই নারীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করার জন্য পুরুষের প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল। পুরুষ সম্মিলিত উদ্যোগে নারীকে ঘিরে রচনা করেছে দুর্ভেদ্য মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের জাল। এ জন্য তাকে শত শত বছর ধরে রচনা করতে হয়েছে সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় নারী সম্পর্কে পুরুষের প্রচলিত ধারণাসমূহ। যেমন, নারী প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের তুলনায় হীনবল ও কোমল, কিন্তু পুরুষ শক্তিমান ও কঠিন, নারী সৌন্দর্যের প্রতীক আর পুরুষ কর্মের, নারী অবিশ্বস্ত আর পুরুষ বিশ্বস্ত, নারী আবেগসম্পন্ন পুরুষ বুদ্ধিমান। ঋতুস্রাব, প্রসব প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়াদিও অপবিত্র গণ্য করে নানা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে– ছোট করা হয়েছে নারীকে। পরিবার ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে দেয়া হয়েছে অতি প্রয়োজনীয় কাজ, কিন্তু তার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়নি।

এভাবে পুরুষের দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ও প্রচারণার ফলে সভ্যতার প্রথম পর্যায়েই নারী ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পুরুষের চিন্তাধারার প্রভাবে তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে পুরুষের তুলনায় সত্যিই সে হীনবল, পুরুষ তার চেয়ে যোগ্যতর। বিশ্বাস পরিবর্তনের কারণে বদলে গেছে নারীর চিন্তাধারা, চেতন ও অ-চেতন মন, তার আচার-আচরণ, কর্মতালিকা, এমনকি ভাষাও। সে পরিণত হয়েছে পুরুষের সংজ্ঞায়িত নারীতে। তার স্থান গৃহাভ্যন্তরে, তার প্রধান পরিচয় পুরুষের ভোগের উপকরণ, সহচরী, সেবিকা, সন্তান-উৎপাদক ও পালনকারী হিসেবে। আর সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পুরুষ গ্রহণ করেছে তার সৃষ্ট সকল সংস্থার কর্তৃত্ব– রাষ্ট্র-প্রধান, মন্ত্রী, সেনাপতি, সমাজপতি, বীর; যে পুরুষ কিছুই না সে-ও অন্তত তার পরিবারের প্রধান– এক বা একাধিক নারী অভিধার পশুর মালিক।

এই অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি অর্জন এবং মানবসমাজের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা নারীমুক্তি করাই আন্দোলনের লক্ষ্য। এর তাত্ত্বিক বিশ্বাসটাকে বলা যায় নারীবাদ। 'নারীবাদ' হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও, অন্যান্য মতবাদের মতো নয় এটি। কারণ নারীবাদ ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির কোনোএকটি মাত্র বিষয়ে সীমিত

নয়। নারী-শোষণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে মানব-বিজ্ঞানের সকল শাখা। তাই নারীবাদকে অবশ্যই ঐসব শাখার প্রতিটির বৈষম্যমূলক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলোকে সনাক্ত করতে হবে, ওগুলোর শোষণ-সহায়ক চারিত্র্য উন্মোচন করতে হবে এবং উপস্থাপন করতে হবে যথাযথ বিকল্প তত্ত্ব বা তত্ত্বাংশ। নারীবাদীও দাবি করে এটি এমন এক রাজনৈতিক-দর্শন ও আন্দোলন যেটির রয়েছে মানব-বিদ্যার অন্য সকল শাখা সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের নির্দিষ্ট নীতিমালা ও দৃষ্টিকোণ।

পুরুষতন্ত্র নারীকে শোষণ করেছে এবং করে চলেছে এক জটিল প্রক্রিয়ায়। এ কুটিল পদ্ধতির শিকার নারীর বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধারণা, ব্যাখ্যা ও মতবাদের। বিশ্লেষণ ও মতামতের এই ভিন্নতা নারীবাদের সাংগঠনিক রূপ এবং কৌশলগত তৎপরতাকেও প্রভাবিত করেছে। তাই নারীমুক্তি আন্দোলনের পরম লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে নারীবাদীরা সংগঠিত হয়েছে কয়েকটি ভিন্ন তাত্ত্বিক মতামতের আওতায়। যেমন উদার নারীবাদ, পরম নারীবাদ, ইসলামী নারীবাদ। তত্ত্বগত বিভাজন ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এমনকি ব্যক্তিগত প্রয়াসেও নারী-মুক্তি আন্দোলন সক্রিয়।

অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের মতো নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিন্নতায় পরস্পর-বিরোধী ভূমিকার অবকাশ নেই। বরং অনেকগুলো মূল-বিষয়ে নারীবাদের সবকটি সংগঠন একমত পোষণ করে; লক্ষ্যও তাদের এক। শুধু পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও কৌশল প্রণয়নে নির্দিষ্ট পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

সকল নারীবাদীর প্রথম ও মূল বিশ্বাস পুরুষের তুলনায় নারীর সমান অধিকারে, যা থেকে নারীকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু লিঙ্গগত পার্থক্যের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন 'লিঙ্গবাদ' (Sexism) হিসাবে পরিচিত। লিঙ্গবাদ বিষয়ে সকল নারীবাদীই একমত। যে-কোনো নারীবাদীর নিকট লিঙ্গবাদ অর্থ হল কেবল নারী হওয়ার ফলে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া বৈষম্যের ব্যাপার। সেই পুরুষ লিঙ্গবাদী, কেবল পুরুষ হওয়ার কারণে সে সচেতন বা অবচেতনভাবে, নারীর ওপর ও নারীর বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপরায়ণ অহংবোধক অবস্থান গ্রহণ করে।

একটি বিষয়ে নারীবাদের সকল তাত্ত্বিক শাখাই একমত যে এটি একটি রাজনৈতিক দর্শন ও আন্দোলন যার নিয়ামক বিষয় হল ক্ষমতা। 'ভগ্নীত্ব' নারীবাদের আরেকটি সাধারণ বিষয়, যা সকল নারীবাদীরা একই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছে। ভগ্নীত্ব হল (Sisterhood) সহমর্মিতা। এই সহমর্মিতা সকল নারীবাদীর ঐক্যের প্রতীক হিসাবে সর্বজনমান্য।

নারী ও নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় ভাষা একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় যা সনাক্ত করেছিলেন বৃটিশ নারী উপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উলফ। সভ্যতার অন্য অনেক বিষয়ের মতো আমাদের ভাষাও পুরুষের সৃষ্টি। এ ভাষায় পুরুষের প্রাধান্য প্রবল। পুরুষ-শাসিত ভাষার শব্দ ও বাক্যাবলি প্রতিফলিত করে পুরুষের প্রাধান্যকে। ভাষার আশ্রয়েই আমাদের চেতনা, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবোধ গড়ে উঠে। অর্থাৎ আমাদের চিন্তাভাবনা অনেকটাই ভাষা-দ্বারা শাসিত।

আমরা যখন নারী শব্দটি উচ্চারণ করি তখন প্রথমে আমাদের চেতনায় আন্দোলিত হয় প্রচলিত ভাষা কর্তৃক 'নারী' শব্দটিতে সঞ্চারিত অর্থবোধ। অর্থাৎ নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনাতেও নারী শব্দটি প্রয়োগ করলে নারী সম্পর্কে পুরুষের ধারণাই প্রতিনিধিত্ব করা হবে। এ জন্য নারীবাদীদের অনেকে একটি বিকল্প নারীভাষার প্রস্তাবও করেছিলেন।

নারী শোষিত হয়ে আসছে বহু প্রাচীনকাল হতেই। সেই শোষণের বিরুদ্ধে হয়তো কোনো কোনো নারী প্রতিবাদীও হয়েছেন। তাদের সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয়নি, সে সুযোগ ছিল না। নারীবাদী আলোচনায় সচরাচর আধুনিককালের কথা মনে রেখেই আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণিত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী হিসেবে ফ্রান্সের মারি দ্য গোরনের নাম আসে। এই ভদ্রমহিলা ১৬২২ সালে একটি পুস্তিকা লিখে নারীর বৈষম্যময় অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে বলেন নারী ও পুরুষের অসমতায় কথা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টির। ফরাসি নারীবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা গোরনের বক্তব্যের ওপর আলোকপাত করেছি।

এরপর আসে ইংল্যান্ডের মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের কথা। এসময়ের নারীবাদীদের কাছে ওলস্টোনক্র্যাফটের 'ভিন্ডিকিশেন অব দি উয়োম্যান' নারীমুক্তি আন্দোলনের ইশতেহারের মতো। এটি ১৭৯১ সালে প্রকাশিত হয়। একই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নারীরাও লেখালেখিতে মুক্তির আওয়াজ তোলেন।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমেরিকায় নারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করত। তখন পশ্চিমের বৈরি পরিবেশে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল নিবিড় শ্রমের, যাতে নারীর অংশগ্রহণের বিকল্প ছিল না। খামারে, দোকানে, রেস্টুরেন্টে সর্বত্র পারিবারিকভাবে নারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পায়ন শুরু হলে পরিস্থিতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আসে। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল দক্ষ শ্রমশক্তির। তেমনি শিল্পায়িত সমাজে অধিকতর আর্থ ও সামাজিক নিরাপত্তা অর্জিত হওয়ায় পুরুষ নারীর ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমিয়ে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। তা ছাড়া এ-সময় বৃটেন ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর অভিবাসী আমেরিকার আসায় তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রুচিবোধ প্রভাব ফেলে আমেরিকান সমাজে। দেখা দেয় ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের প্রাবল্য।

যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর একটি ভূমিকা ছিল এবং স্বাধীনতার ঘোষণায় সকল মানুষের সমান অধিকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা মার্কিন নারীর জন্য নিয়ে আসে আরেক দফা বন্দিত্ব। ১৭৭৬ সালের আগে-পরে নারীর অবস্থা অনেকটাই বৃটিশ সমাজের নারীর সমতুল্য ছিল।

অবশ্য আমেরিকার নারীরা এ পরিস্থিতি বেশিদিন সহ্য করেনি। অচিরেই সমালোচনা শুরু হয়। নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারীর অন্যান্য অধিকার নিয়ে কথা বলতে শুরু করে নারীরা। এ পর্যায়ে নারীবাদের কর্মকাণ্ড মূলত ছদ্মনামে লেখালেখিতে সীমিত ছিল। সে-সময়ের আমেরিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, বোস্টন প্রভৃতি শহর। ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইয়াঙ লেডিস একাডেমি।

ইয়াঙ লেডিস একাডেমি বর্তমানের মানদণ্ডে নারীবাদী প্রতিষ্ঠান নয়। তবে মার্কিন নারীদের মধ্যে শিক্ষার সূচনা করে বহু নারীকে শিক্ষিত করে তোলে এ প্রতিষ্ঠানটি। পরে এরাই নারী-অধিকার আদায়ের আন্দোলন আরম্ভ করে। তাই এ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অনেকটা ক্ষেত্রপ্রস্তুতকরণের মতো।

অষ্টাদশ শতকের আশির দশকে নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কয়েকজন নারী সক্রিয় ছিলেন। এরা কখনো নিজ নামে, কখনো ছদ্মনামে পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এরাই প্রথমে উপলব্ধি করেন যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে নারীর কঠোর শ্রম এ-দেশ গঠনে ব্যয় হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নারী রেখেছে অতুলনীয় ভূমিকা। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার অনুকরণে ভিক্টোরীয় কায়দায় নারীকে গৃহবন্দি করার চেষ্টা চলছে। তাই প্রতিবাদী নারীরা প্রথমে নারীর শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদার প্রশ্নটিও উত্থাপন করেন।

এইসব প্রতিবাদী নারীদের মধ্যে চার্লস ব্রোকেনডন ব্রাউন, জুডিথ মুরে, বেনজামিন রাশ গুরুত্বপূর্ণ। কাছাকাছি সময়েই বের হয় নারীকেন্দ্রিক পত্রিকা (খধফরবং গধমধুরহব জবঢ়ড়ংরঃড়ুং)। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী পত্রিকা। সে সময় নারীশিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমও আলাদা ছিল। লেডিস ম্যাগাজিনের প্রাবন্ধিকরা এ বিষয়টি নিয়ে পুরুষদের ওপর আক্রমণ চালায়। মেয়েদের ফ্যাশন ও অত্যধিক রূপচর্চার বিরুদ্ধে লেডিস ম্যাগাজিন লিখে যে, ফ্যাশন দিয়ে নারীদের মগজ ও মন ভোঁতা করা হচ্ছে। ফ্যাশন-দুরস্ত মেয়েদের না থাকে নির্দেশনা দেয়ার মতো মাথা, না থাকে ঘরকন্নার হাত। ১৭৮৭ সালে লেডিস একাডেমিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় বেনজামিন রাশ সরাসরি পুরুষদের আক্রমণ করে বলেন যে, নারীকে কব্জায় রাখার জন্যই পুরুষ দামী, হাস্যকর ফ্যাশনে সাজিয়ে রাখে নারীকে।

এভাবে সেই ১৭৮৭ সালেই বেনজামিন রাশ সেক্সুয়াল পলিটিক্স-এর একটি কৌশল তুলে ধরে নারীদের সতর্ক করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

সেই সময়ে নারী মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এ ষিয়টি নিয়ে আলোকপাত করেন জুডিথ মুর্‌রে। তিনি নারীকে পুরুষের সমান বলে দাবি করেন এবং ম্যাসাচুসেট্‌স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ১৭৯২ সাল থেকে ১৭৯৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেন তার মতামত। তিনি দাবি করেন ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা মেনে নারীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের বাধাগুলোও সরিয়ে নিতে হবে। তখনো পুরুষতন্ত্রের এ বক্তব্য প্রচলিত ছিল যে, পুরুষরা অধিকতার যোগ্য এবং বুদ্ধিমান বলে সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। জুডিথ-এর জবাবে লিখেন যে, মেয়ে-শিশু ও ছেলে-শিশুর যোগ্যতা ও ক্ষমতায় কোনো পার্থক্য থাকে না। পরে যেহেতু আমাদের সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষাব্যবস্থা ছেলে-শিশুকে বেশি সুযোগ ও গুরুত্ব দেয় তাই তারা বেশি এগিয়ে যায়। অবহেলার কারণে মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। এখানে লক্ষণীয় যে পরে ল্যাঁকার মনোসমীক্ষণাত্মক তত্ত্বের সাহায্যে এ কথাই প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন বিভিন্ন ফরাসি নারীবাদী।

বেনজামিন রাশ এবং জুডিথ মুরে দুজনই বলেন যে নারীর বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়েছে নারীকে পুরুষের মনোরঞ্জনের যোগ্য করে তোলার জন্য। এতে নারীর কোনো উন্নতি হবে না, স্বাধীনতাও আসবে না। সুতরাং এ পাঠ্যক্রম বদল করা উচিত। জুডিথ যা বলেছেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাই চেয়েছেন ভার্জিনিয়া উলফ অনেক বছর পর। শিশুর সামাজিকীকরণে বৈষম্যের ফলে ছেলে-শিশুর তুলনায় মেয়ে-শিশু পিছিয়ে পড়ে–এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জুডিথ পুরুষতন্ত্রের মূল পর্যন্ত স্পর্শ করেছিলেন, যদিও সেই পুরুষতন্ত্রের ব্যবহৃত কৌশলগুলো উদ্‌ঘাটনের জন্য আমাদেরকে আরো শ দেড়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এদিকে ইয়ং লেডিস একাডেমি থেকে যারা বের হয়ে আসছিলেন তারা হয়ে উঠছিলেন আরো বিদ্রোহী। ১৭৯৩ সালে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জনৈক গ্রাজুয়েট প্রিসিলা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বক্তব্য রাখায় পরে মাফ চাইতে বাধ্য হন।

গার্ট্রুড মেরিথিড আরেক প্রথা-বিরোধী নারীবাদী। তিনি নারীর সামাজিক হীন অবস্থার প্রতিবাদ করেন এবং এর জন্য পুরুষদের দায়ী করেন। ঐ সময়ের পুরুষ নারীবাদীদের মধ্যে আছেন থমাস কুপার। তিনি মেয়েদের পাঠ্যসূচির সমালোচনা করেন এবং ছেলেদের দায়ী করেন নারীকে মনোরঞ্জনের জিনিষে পরিণত করার জন্য। টিমোথি ডয়েট নামের

আরেক নারী ছেলেদের মতো একই পাঠ্যবিষয় মেয়েদেরকে পড়ানোর জন্য গ্রীনফিল্ড হিল স্কুল খুলে অনেকদিন পড়িয়েছেন।

এ সময়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলন যখন দানা বাঁধছে তখনই বৃটেনে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট লিখলেন ভিন্ডিকেশন অব দি উয়োম্যান (১৭৯১)। সে-কালে ভিন্ডিকেশন অসম্ভব সাহসী এক বিস্ফোরণের মতো। এ জন্য ওলস্টোনক্র্যাফট প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হন। তার বদনামও ছড়ায়। কিন্তু ততোদিনে ভিন্ডিশেনের প্রভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে যার ফলাফল দেখা যায় উনিশ শতকের নারী-অধিকার আদায়ের আন্দোলনে।

উনিশ ও বিশ শতকও পার হয়ে এসেছি আমরা। নারীর অধিকার এখনো সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। অনেক সমাজে নারী প্রায় আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। তবে নারীবাদ এখন পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে সক্রিয়। আশার কথা এখানেই।

নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের ইতিহাস দর্শন

আ জি জু ল রা সে ল

দর্শন মানে জীবন ও জগৎ নিয়ে চিন্তা। সাধারণত জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধানের আলোচনাকে দর্শন বলা হয়। ইতিহাসকার বার্ট্রান্ড রাসেল আমাদের জানান যে, জীবনের এই ধারণা আর শব্দকে তিনি 'দার্শনিক' মনে করেন যা দুটি ঘটনা থেকে উত্থিত: এর একটি ধর্মীয় বা নৈতিক ধারণা এবং আরেকটি হল অনুসন্ধান যাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বলা যায়। রাসেল তার দর্শন-সম্পর্কিত আলোচনার পরবর্তীতেই বলেছেন, দর্শনকে যদিও দুইভাবে: সংকীর্ণ ও বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়; তিনি দর্শনের বিস্তৃত আলোচনাকেই পছন্দ করছেন বেশি। দর্শনের আক্ষরিক একটি অর্থ হচ্ছে দেখা। অর্থাৎ কোনোকিছুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকেও দর্শন বলা যায়। যেমন কারও জীবনদর্শন। আদতে দর্শন হল এমন একটি শব্দ যাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়– বৃহৎ অথবা বিস্তৃত অর্থে। রাসেল বলেন দর্শন বলতে তিনি যা বুঝেন তা হল, থিওলজি এবং সায়েন্সের মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। থিওলজির মতো দর্শনেও বিভিন্ন ব্যাপারে অনুমান করা হয় কিন্তু বিজ্ঞানের মতো দর্শনও মানুষের যুক্তিবোধের কাছে আবেদন করে।

এখন আমাদের কথা হল ইতিহাস দর্শন আবার কী রকম? ইতিহাসতাত্ত্বিকরা ইতিহাসের আবার নানা অর্থ করেছেন। তাঁরা বলছেন ইতিহাস হল যত্নসহকারে অনুসন্ধান। এখন ইতিহাস কী অনুসন্ধান করবে? তাত্ত্বিকরা এখানে বলছেন, মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডই অর্থাৎ অনুসন্ধান করবে ইতিহাস। অনেকে ঠাট্টা করেই বলে থাকেন ' যা গেছে তো গেছে, মরা মানুষের জীবন নিয়ে টানাহেচড়া করে লাভ কী'। সম্প্রতি নাকি বাংলাদেশ সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'বাপ' ইউজিসি মানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও ইতিহাসকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে। জানি না তাঁরা মনে হয় পপার সাহেবের ' *দ্যা পভার্টি অব হিস্টরিসিজম'* পড়ে বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পপার তার পুস্তকখানিতে ইতিহাস, সমাজের বিকাশ ও উন্নয়নকে ধুয়েছেন আচ্ছামতো। ইতিহাসকে তিনি অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়েই দিয়েছেন। হেগেল মার্কসেরও চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করেছেন তিনি তার গ্রন্থটিতে। মার্কসকে তিনি নির্ধারণবাদী বলে গালি দিয়েছেন এ বইতে। এর জবাবও তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্যে। ই. এইচ. কার. সাহেব তার 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি' বইতে পপারের সমালোচনার মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। সে যাই হোক ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার ব্যাপার অনেক পুরনো এবং এখনও তা চলছে এবং চলবেও বোধ হয়।

ইতিহাস দর্শন নিয়ে ভাবনা আজকের নয়। শুরু থেকেই বিভিন্ন তাত্ত্বিক ইতিহাস দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। হেগেল তো ইতিহাস দর্শন নিয়ে দীর্ঘ ওয়াজ-নসিহত করেছেন। ইতিহাস দর্শনের ওপর তাঁর বক্তৃতামালা সংকলিত হয়েছে 'ফিলজফি অব হিস্ট্রি' নামক বইতে। ইতিহাস দর্শন হল মূলত ইতিহাস দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ইতিহাস দর্শন বিভিন্ন রকম। ইতিহাস চর্চার রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। পাশ্চাত্যবাদীদের (উপনিবেশবাদী, যারা প্রাচ্যকে খাটো করে দেখেন) রয়েছে এক ধরনের ইতিহাস দর্শন, জাতীয়তাবাদীদের রয়েছে এক রকমের ইতিহাস দর্শন, মার্কসবাদীদের একরকম, তলা থেকে ইতিহাস চর্চাবিদদের একরকম (সত্তরের দশকে ক্রিস্টোফার হিলরা এ ইতিহাসের প্রবক্তা)। সম্প্রতি ৮০-র দশকে উপমহাদেশ থেকে নতুন এক ইতিহাস দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন একদল

ইতিহাসবিদ। তারা যে ইতিহাস রচনা করেন তার নাম দেন নিম্নবর্গের ইতিহাস। তাঁরা তাদের রচিত ইতিহাসে তুলে ধরেন চিরবঞ্চিত অবহেলিত নিম্নবর্গের কথা; নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ভূমিকা ও অংশগ্রহণের কথা। এ ধারার ঐতিহাসিকদের কাজ হল ইতিহাসে নিম্নবর্গের উপস্থাপন ও তাদের অংশগ্রহণের কথা খুঁজে বের করা।

১৯৮২ সালে প্রথম যখন এ ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা' (সাবলটার্ন স্টাডিজ) সংকলন বের হয়, তখন সারস্বত সমাজে আলোচনা-সমালোচনার ঢেউ বয়ে যায়। আলোচনা যত হয়েছিল, সমালোচনা হয়েছিল এর কয়েকগুণ বেশি। পণ্ডিতমহলে নিম্নবর্গের ইতিহাস দর্শন ও চর্চার পদ্ধতি নিয়েও কম কথা ওঠেনি। সমালোচনা এসেছিল জ্ঞানচর্চার সব মার্গ থেকেই। ইতিহাসচর্চার সাম্রাজ্যবাদী ঘরানা যেমন এর কড়া সমালোচনা করেছিল, জাতীয়তাবাদী ঘরানাও সেই একই কাজ করে। এমনকি কট্টর মার্কসবাদীরাও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকে ভালো চোখে নেয়নি। তবে একটি কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, নিম্নবর্গের ইতিহাস ইতিহাস দর্শন ও চর্চায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। প্রথাগত ইতিহাসচর্চার ধারায় একটি বড় ধাক্কা দেয় নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা গোষ্ঠী। পূর্ববর্তী ইতিহাসচর্চার সব ঘরানার আবির্ভাব হয় পাশ্চাত্য থেকে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্বজুড়ে নির্মিত হত ইতিহাস। নিম্নবর্গের ইতিহাস সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ইতিহাসতত্ত্বের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। যুগ যুগ ধরে যে 'পাশ্চাত্য' ধারণা এটা পোষণ করে এসেছে এবং সৃষ্টি করে যে– প্রাচ্য অর্থাৎ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো অনড়, স্থবির, অচল-অপরিবর্তনীয়।[২] নতুন কিছু এই অঞ্চল থেকে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের এই ডিসকোর্সে নুনের ছিটা দিয়ে দিয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা। পাশ্চাত্য 'তৃতীয় বিশ্ব' আখ্যা দিয়েছে যে অঞ্চলকে সেই 'তৃতীয় বিশ্ব' থেকেই এমন ইতিহাসতত্ত্ব খাড়া হয়েছে যা উপনিবেশবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ডিসকোর্সকে তোপের মুখে ফেলেছে। ইতিহাসে চিরবঞ্চিত নিম্নবর্গকে রিপ্রেজেন্ট করেছে তার আঙিনায়। শুধু আবেগ দিয়ে এই নির্মাণ নয়, তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক নির্মাণ। সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী এবং জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গীয় ইতিহাসচর্চাকারীরা সব সময় দেখিয়ে এসেছেন নিম্নবর্গের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা তাদের চর্চিত ইতিহাসে প্রমাণ করেছেন ইতিহাসে নিম্নবর্গের অস্তিত্ব, চৈতন্য, প্রভা এবং একইভাবে সীমাবদ্ধতা। অনেকে হয়তো বলতে পারেন নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদদের ইতিহাস দর্শন দাঁড়িয়েছে সত্তর দশকে লেখা 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো'র দর্শন থেকে। এর নতুন তত্ত্বটা কী? কথাটা যারা বলবেন, ইতিহাস চেতনায় তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। সত্তরের দশকে ক্রিস্টোফার হিল, এডোয়ার্ড টমাস এবং এরিক হবস্‌বমের ধারা অনুসরণ করে তল থেকে ইতিহাস লেখার একটা ধারা প্রচলিত হয়েছিল।[২] ইউরোপের যন্ত্রসভ্যতা আর পুঁজিপসারিদের পায়ের তলায় পিষ্ট জনমানুষের কথা তুলে ধরার দাবি করেছিলেন 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো'র ইতিহাসবিদরা। কথাটা সত্যি। পদপিষ্ট মানুষের কথা তুলে ধরেছিলেন এই ইতিহাসবিদরা।[৩] কিন্তু এই জনমানুষ, শোষিত মানুষের কথা আদৌ কি তুলে ধরেছিলেন তারা? কতটা রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন তাদের? কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে ছিলেন তারা নিম্নবর্গকে! বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখার অবকাশ আছে। তারা যেভাবে প্রদর্শন করেছিলেন শোষিত, নির্যাতিত নিম্নবর্গের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীকে তা হল– এই শোষণ যেন অনিবার্যই ছিল। ইতিহাসে তাদের অবস্থান শুধু শোষিত এবং পিষ্ট হিসেবে। তাদের রচিত নিম্নবর্গের ইতিহাস যেন প্রতিবাদ প্রতিরোধহীন, রাজনৈতিক চেতনাহীন, বাকহীন একজন মানুষ। ক্রন্দসী এই ইতিহাসে নিম্নবর্গ উপস্থাপিত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনাহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে। আদতে এই 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো'ও তেমন কোনো নতুন ইতিহাস দর্শন দাঁড় করাতে পারেনি। 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো'র অবস্থানও সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ইতিহাস কাঠামোর ভেতরেই পড়ে। এ ধারার তাত্ত্বিক গুরু হব্‌সবমের তত্ত্বও পরিষ্কার সে কথা বলে দেয়। হব্‌সবম ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশকালের প্রথম দিক্‌কার কৃষক সংগ্রামগুলোকে বলেছেন প্রাক-রাজনৈতিক।[৪] অর্থাৎ এ আন্দোলন সংগ্রামের কোনো রাজনৈতিক চেতনা নেই। কিন্তু নিম্নবর্গের ইতিহাসকাররা এই 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর কেউ যদি বলেন, নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা এই ইতিহাস থেকে উদ্দীপনা পেয়েছে, সহযোগিতা পেয়েছে; তাহলে বলব সব ইতিহাসের কাছ থেকেই শেখার আছে। সেক্ষেত্রে 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো' কেন, বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্ব থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে ইতিহাসবিদদের। এর ফাঁক-ফোকর, কূট-কৌশল, ফন্দি, এগুলো অবশ্যই নখদর্পণে থাকতে হবে জনমানুষের পক্ষের একজন ইতিহাসবিদের।

দুই

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার শুরু হয়েছিল, উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাস দর্শন ও তত্ত্বের বিরোধিতা দিয়ে। রনজিৎ গুহ, 'সাবলটার্ন স্টাডিজের' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সে কথাই ঘোষণা করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইতিহাসবিদেরা যেমন– ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুষ্কৃতিকারীদের কর্ম এবং মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসাবে দেখাতে চেয়েছে; তেমনি জাতীয়তাবাদীরাও শুধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটি এলিটিস্ট সংগ্রহ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৫] আন্দোলন সংগ্রামে উচ্চবর্গের ভূমিকারই সাফাই গেয়ে এসেছেন তারা। আর এই ভারতীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্বের আরেক বড় দুর্বলতা হল এটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইনস্টিটিউশনের ফসল বলার মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও এলিটদের যে ভূমিকার কথা বলেছেন– একইভাবে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপনিবেশবাদেরও সাফাই। জাতীয়তাবাদী

ঐতিহাসিকরা পাশ্চাত্য এনলাইটেনমেন্ট ও রেনেঁসার আদলে এখানে যে রেনেঁসার কথা বলেছেন, তা মিথ ছাড়া কিছুই নয়। বিনয় ঘোষও তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থের সংযোজন ১৯৭৮-এ 'বাংলার নবজাগৃতি'কে বলেছেন একটি অতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এলিট জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা রেনেঁসার এই আলোকবর্তিকাদের গুণকীর্তন করে ব্যয় করেছেন পাতার পর পাতা। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আমির আলি, সৈয়দ আহমেদ এমন অনেক নবজাগরণের মনীষীদের কথায় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাকারীরা ইতিহাসের পাতা করে রেখেছেন ভারাক্রান্ত। বিনয় ঘোষ 'বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধে বাংলার নবজাগরণের এই হেঁয়ালি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

'পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে রেনেঁসাস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কী পদার্থ? কোথায় এবং কখন 'জাগরণ' হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতিকেন্দ্রিক' হয়, যদি রেনেঁসাসের সূর্য 'জ্যোতির কনকপদ্মের' মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য'।[৬]

আমাদের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা যাদেরকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলছেন, তারা কতটা ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভেঙে আলো ছড়াতে পেরেছেন? সত্তর দশকে অশোক সেন, রনজিৎ গুহ, সুমিত সরকার ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রগতিশীল কোন অর্থে? তাঁদের সংস্কার-চিন্তা তো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি-রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করেনি। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীলতার ওপর আস্থা রেখেই তো তাঁদের সংস্কার প্রচেষ্টারসীমা। ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার বিন্যাস নিয়ে কোনও মৌলিক প্রশ্ন 'নবজাগরণ'-এর নায়কেরা তোলেননি, বরং সেই ক্ষমতাবিন্যাসকে অবলম্বন করেই তাঁরা সামাজিক প্রগতি আনার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল।[৭]

শুধু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে কেন, মার্কসবাদীদের ইতিহাসেও এই নবজাগরণ এবং নবজাগরণের মনীষীদের জায়গা ছিল গুরুত্ব সহকারে। ছিল বললে ভুল হবে, এখনও মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের অনেকে নবজাগরণের এই মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু ঘটা করে পালন করেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ভক্তিতে তারা গদগদ। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক– পরিষ্কার করার জন্য। পাঠক লক্ষ করবেন, বাংলাদেশের একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। সেখানে বক্তারা এটা ভেবেও ভক্তিতে আপ্লুত হন– রাজা সাহেব ব্রিস্টলে যেয়ে মরেছেন। ব্রিস্টল থেকে মহার্ঘ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানি করেছেন আমাদের জন্য। শুধু তাই নয় বামপন্থী এই দলটি তাদের রাজনৈতিক প্রকাশনায় বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রচরিত্র নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে ঔপনিবেশিক মতাদর্শ প্রকট। দলটি তার প্রকাশনায় বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে। তারা তাদের প্রকাশনায় লেনিনের কিছু উক্তিকে না বুঝে স্বেচ্ছাচারে প্রয়োগ করেছে। তারা বলেছে, লেনিনের উক্তিকে উদ্ধৃত করে, কোনো দেশের কৃষি উৎপাদনের চরিত্র পুঁজিবাদী কিনা, তা বোঝার প্রধান লক্ষ্য কী, তা নির্দেশ করে লেনিন দেখিয়েছিলেন, কৃষি মজুর নিয়োগ করে চাষ করাই কৃষি উৎপাদনে পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষণ (বাসদ : ১৯৯০ : ঢাকা)।[৮] এরপরই দলটি বলছে বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক যেহেতু অধিক, মানে কৃষি মজুর নিয়োগ হচ্ছে, তাই কৃষিতে পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রমাণ পেয়েছেন। দলটি তার ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে প্রমাণ করতে চেয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে।[৯] দলটি বাংলাদেশে যে জাতীয় বুর্জোয়ার কথা বলছে আসলে এই বুর্জোয়াদের চরিত্র কোনো অর্থেই জাতীয় নয়। এদেরকে বড়জোর এজেন্ট বলা যায়। এরা জাতীয় পুঁজির বৃদ্ধির পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর এজেন্ট হিসেবেই কাজ করে। বিপ্লবি তাত্ত্বিক ফ্রান্ৎস ফাঁনোও একই কথা বলেছেন তার বহুল আলোচিত গ্রন্থ 'দ্যা রেচেড অব দ্য আর্থে'। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, এক সময়ের উপনিবেশিত দেশগুলোয় জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব হবার সম্ভাবনা নেই।[১০] যারা আছে তারা হচ্ছে জাতীয় এজেন্ট। তাই জাতীয় মুক্তির স্বার্থে এই জাতীয় এজেন্টদের বিনাশ করা দরকার। যারা বুর্জোয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেছেন আদতে তারা সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টকেই উর্ধ্বে তুলে ধরছেন। তাছাড়া ঔপনিবেশিক যুগের ভারতের উৎপাদন কাঠামোটা বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখব এখানে কেন জাতীয় বুর্জোয়া সৃষ্টি হয়নি। কারা বাধা সৃষ্টি করেছিল এই জাতীয় বুর্জোয়া সৃষ্টিতে? সে কথা ফ্রান্ৎস ফাঁনো বলেছেন তাঁর 'রেচেড অব দ্য আর্থ' এবং আলাভি তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে। উপনিবেশকাররা উপনেবেশিত দেশে পুঁজির বিকাশ রুদ্ধ করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মেট্রোপলিটনে আর উপনিবেশে সৃষ্টি করেছিলেন একদল বেনিয়া-মুৎসুদ্দি অর্থনৈতিক শ্রেণী। কার্ল মার্কস ভারতে পুঁজিবাদী বিপ্লব সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ঘটেনি :

> আমি জানি, ব্রিটিশ মিলমালিক শ্রেণী ভারতে রেলপথ নির্মাণে উদ্‌যোগী হয়েছে যাতে তাদের কলকারখানার জন্য তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা হয়। কিন্তু কোনো দেশের মধ্যে যানবাহন ব্যবস্থায় যদি যন্ত্রদানবের আবির্ভাব হয় এবং সেদেশে লোহা ও কয়লা সম্পদ প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে সাধ্য কার যে, তার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিরাট একটা দেশের ভেতরে যদি স্নায়ুমণ্ডলীর মতন রেলপথ নির্মাণ করা হয় তাহলে বাধ্য হয়ে সেই রেলপথ চালু রাখার প্রয়োজনে সেদেশে যন্ত্রচালিত কলকারখানাও গড়ে তুলতে হবে। তার সঙ্গে অনিবার্য নিয়মে এমন যন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যার সঙ্গে রেলপথের কোনো প্রত্যক্ষ

সম্পর্ক থাকবে না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে রেলপথ ভারতীয় শ্রমশিল্প যুগের অগ্রদূত... রেলপথ বিস্তারের জন্য যেসব আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ হবে তার আঘাতে ভারতের অগ্রগতির পথের অন্ত রায়গুলো একে একে দূর হয়ে যাবে, ভারতের বর্ণগোঁড়ামি, গ্রাম্যসমাজের জড়তা, কূপমণ্ডূকবৃত্তি সব ভেঙে যাবে।[১১] ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে একই প্রবন্ধে মার্কস আরও বলেন: ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে জনসাধারণের সামাজিক দুরবস্থার উন্নতি বা মুক্তি হতে পারে না। তার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনশক্তি জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে আর কিছু না হোক, এই উন্নতি মুক্তি ও শক্তি বৃদ্ধির বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হবেই। ইতিহাসে কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর চাইতে বেশি কিছু করতে পেরেছে ? ..."ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজব্যবস্থার বীজ ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে, চারিদিক তার পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ইংল্যান্ডের মজুরশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, অথবা যখন ভারতের জনসাধারণ নিজেরা সংগ্রাম করে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত হবে।"[১২]

পাঠক ক্ষমা চাচ্ছি এত দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য। উদ্ধৃতি দু'টি খুবই প্রাসঙ্গিক। উদ্ধৃতি দু'টি না দিলে আমি যে বক্তব্যটি উপস্থাপন করতে চাইছি তা সম্ভব হত না। অন্য পক্ষে মার্কসকে উদ্ধৃত করা হত খণ্ডিতভাবে। যে কথাটি বলতে চাইছি, তা হল কার্ল মার্কস ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্য যে অভিঘাত– অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের উদ্ভবের কথা বলেছিলেন, তা কিন্তু হয়নি। বরঞ্চ ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাভাবিক উৎপাদন কাঠামোর অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। সৃষ্টি করেছিল একটি বিকৃত উৎপাদন ব্যবস্থা। হামাজা আলাভি ও বানাজি তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঔপনিবেশিক উৎপাদন কাঠামো বলে। আলাভি সোশ্যাল রেজিস্টারে তার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এই উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদের মতো দেখতে হলেও তা পুঁজিবাদী নয়।[১৩] পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি বলেছেন ১. স্বাধীন শ্রম যা সামন্তদায় থেকে মুক্ত। মরিস ডবের ভাষায় এটি এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে শ্রমশক্তি নিজেই পরিণত হয় পণ্যে এবং অন্যান্য পণ্যের মতোই বাজারে বেচাকেনা হয়। স্বাধীন শ্রমকে আরেকভাবে দেখা যেতে পারে, তা হল যখন উৎপাদক উৎপাদনের উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ২. উদ্ধৃত্ত আত্মসাৎকরণে অর্থনৈতিক জবরদস্তি– অর্থাৎ মজুর যখন তার উৎপাদনের উপাদান (যেমন- জমি, যন্ত্রপাতি) থেকে উৎখাত হয় তখন তার থাকে শুধুমাত্র শ্রমশক্তি। সে তখন প্রত্যক্ষ উৎপাদক এবং স্বাধীনও বটে। কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে হয় তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে নচেৎ বেছে নিতে হয় উপবাসে মৃত্যুর পথ। ৩. ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক (শ্রেণী) ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক(রাষ্ট্র) ক্ষমতার বিচ্ছিন্নকরণ সৃষ্টি হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এবং প্রচলিত হয় বুর্জোয়া আইন, বিশেষ করে ভূমি সম্পর্কে ধনবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান চরিত্র : অবাধ বাণিজ্যের মতো বুর্জোয়া আদর্শ। ৪. সাধারণকৃত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা যে ক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন অর্থাৎ কিনা বাজারে বিক্রির মাধ্যমে মূল্যের উসুল এবং যে ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি হচ্ছে পণ্যবিশেষ। অর্থাৎ বাজারের জন্যেই প্রাথমিকভাবে পণ্য বাজারে তার বিনিময় হয়। ৫. মূলধনের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন: উদ্ধৃত্ত এক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহৃত হয় পুঁজি সঞ্চয় এবং উৎপাদনের শক্তিনিচয় ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতি বিস্তৃতির জন্য। ইতিহাসবিদ হামজা আলাভি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের উৎপাদন কাঠামোকে নতুন একটি উৎপাদন কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা নয় সামন্তবাদী আবার নয় পুঁজিবাদী। আলাভি বলেন, এটি একটি বিকৃত উৎপাদন কাঠামো, যার নাম দেন তিনি ঔপনিবেশিক উৎপাদন কাঠামো।[১৪] আলাভি বলেন, এই উৎপাদন কাঠামোর চরিত্র পুঁজিবাদী দেখালেও শেষের দু'টি বৈশিষ্ট্য সরল পণ্য উৎপাদন ও বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে ঔপনিবেশিক রূপ লাভ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেমন মূলধনের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন হয়, তেমনি হয় পুঁজি সঞ্চয়। উৎপাদনের শক্তি এবং কৃৎকৌশলের বিস্তৃতির জন্য ব্যয় হয়, এখানে তা হয় না। পুঁজি চলে যায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে বা মেট্রোপলিটনে যেখানে তা উপনিবেশ স্থাপনাকারী দেশের পুঁজি পুঞ্জিতকরণে এবং বিনিয়োগে সহায়তা করে। উপনিবেশে কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই হারে বিনিয়োগ করা হয় না।[১৫] সেজন্য কেন্দ্র উপনিবেশে এমন সব শিল্প গড়ে তোলে যেখানে মজুরের প্রয়োজন বেশি। কিন্তু যেহেতু মজুরি কম তাই মুনাফার পরিমাণও হয় প্রচুর।[১৬] বাংলাদেশে ক্ষুদ্র দরিদ্র কৃষকরা কৃষি ছাড়াও জীবিকার জন্যে অতিরিক্ত কাজ খোঁজেন। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে তারা সস্তা শ্রমের যোগান দেন।[১৭] ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির এই একটি দিক হচ্ছে সস্তা শ্রম পুনরুৎপাদন যা সামন্ত বা উন্নত ধনতান্ত্রিক নয়। তাছাড়া কৃষি এবং শিল্পের উদ্ধৃত্তের সিংহভাগই আত্মসাৎ করে মেট্রোপলিটন। হামজা আলাভি ও বানাজির মতে 'তৃতীয় বিশ্বের' (পশ্চিম এই নামকরণ করেছে) সমাজ গঠনে একটি ঐতিহাসিক কিন্তু নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি কাজ করেছে, মার্কসের জীবদ্দশায় যা ছিল অজানা। কৃষিতে মজুর নিয়োগ করলেই যে বাংলাদেশের উৎপাদন চরিত্র পুঁজিবাদী হবে তা কিন্তু নয়। কৃষিতে বৃহদাকারে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মতো পুঁজি পুনরুৎপাদনে কাজে লাগানো হয় না। তাছাড়া ভূমিহীন কৃষকরা যে কৃষিতেই মজুর খাটেন তা নয়। তারা জীবিকার জন্য অন্য কাজও করেন। বৃহদাকারে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কৃষি পরিচালিত হয় না। বর্তমান বাংলাদেশে বা ঔপনিবেশিত দেশগুলোতে এখন উপনিবেশকাররা বা মেট্রোপলিটন শারীরিকভাবে দৃশ্যমান না হলেও তা রয়েছে অদৃশ্য ভূতের মতন। এই সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদী ভূতই এক সময়ের উপনিবেশে নয়া ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে এখানকার পুঁজি ও

সম্পদ গিলে খায়– অবহেলিত ও বঞ্চিত করে রাখে 'তৃতীয় বিশ্বের' লক্ষ লক্ষ নিম্নবর্গের মানুষকে। সাম্রাজ্যবাদী মেট্রোপলিটনগুলো এজন্য প্রতিটি ঔপনিবেশিত দেশগুলোতে এজেন্ট তৈরী করে। এই এজেন্টদের মাধ্যমে মেট্রোপলিটনগুলো তাদের শোষণ চালিয়ে যায়। জারি রাখে তাদের মতাদর্শ। এই শ্রেণীকে জাতীয় বুর্জোয়া আখ্যা দেয়া ভুল।

ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী অনেক ঐতিহাসিক এবং মার্কসবাদী দলও উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদী ঘরানার ঘেরাটোপ দ্বারা এভাবে আবদ্ধ হয়ে যান। তাই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দল ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের আরও সতর্ক হতে হবে। কার্ল মার্কস নিজেও প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী কলাকৌশলে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে, ব্রিটিশ বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজের বিষয়ে লেখার সময় ভারতীয় সভ্যতার হেগেলের ইতিহাস দর্শনের উপাদানগুলোকে প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে মার্কস গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।[১৮] হিন্দুদের কোনো ইতিহাস নেই, হেগেল বলেছিলেন, একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক শর্তে বিস্তৃত হবার মতো বৃদ্ধিও এর নেই।[১৯] হেগেল ভেবেছিলেন, বাঙালি সমাজ দৃঢ়বদ্ধ, অচল ও স্থবির। এর মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর নেই। হেগেল বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বীকৃত পরিসমাপ্তি হল 'এক নিঃশব্দ কর্মহীন প্রসারণ।'[২০] তাই,'ভারতের জনগণ পরদেশকে জয় করতে পারেনি। অন্যদের কাছে কেবল পরাজিতই হয়েছে।' মার্কস তার অতিপরিচিত অনুচ্ছেদে নিশ্চিতরূপে এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন, 'কোনো ইতিহাস নেই ভারতীয় সমাজের, অন্তত কোনো পরিচিত ইতিহাস। এখানে ইতিহাস যাকে বলি তা হল ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের ইতিহাস, অপ্রতিরোধী-অপরিবর্তনশীল সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিতের ওপরে তারা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।'[২১] এছাড়া মার্কস ফিফ্থ রিপোর্ট এবং জেম্‌স মিলের বই পড়েও বেশ প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। তবে মার্কসের ভারত ইতিহাস-সম্পর্কিত চিন্ত াভাবনা পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম একে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[২২] এ ব্যাপারে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কসের চিন্তা নিয়ে লিখেছেন ভারতীয় মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব[২৩] ও বাংলাদেশের মার্কসবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদ আহমেদ কামাল।[২৪] এছাড়া ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনও তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন মার্কস এ বিদ্রোহে ভারতীয়দের অবদানকে প্রশংসা করেছিলেন এবং বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল ভারতের মার্কসবাদী ইতিহাসকাররা এ ধারা অনুসরণ করতে পারেননি। তাছাড়া মার্কসীয় চিন্তা রিজিড কোনো ব্যাপার নয়। এর অগ্রগতি আছে তা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। মার্কস যে সময় ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন, সে সময় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই ছিল অজানা, অনেক তথ্যই আবিস্কৃত হয়নি। তাই মার্কসকে নির্ভর করতে হয়েছিল শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসকারদের ওপর। ভারতের ইতিহাস নিয়ে যেসব মার্কসবাদী ইতিহাসকাররা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাটোপে আবদ্ধ। ঘুরেফিরে অনেক মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে দেখাতে চেয়েছেন ফিউডাল রি-এ্যাকশন হিসেবে। এক্ষেত্রে এমএন রায়, রজনি পাম দত্ত, সুপ্রকাশ রায় থেকে সবার রচনায়ই উচ্চবর্গের সরব উঁকিঝুঁকি টের পাওয়া যায়। তাদের লেখনীতে আমরা বেশি খুঁজে পাই বাহাদুর শাহ, লক্ষ্মীবাঈ এদের নামই। কিন্তু যে বিপুলসংখ্যক অধঃস্তন কৃষক, তাদের সন্তান, গ্রাম্য নিঃস্ব কৃষক, কামার, কুমোর এতে সংগঠিত হয়েছেন; সংগঠিত করেছেন তাদের বিস্তৃত বিবরণ কই? এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বিদ্রোহে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ছিল কত সরব।[২৫] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, এটি একটি মুসলমানদের বিদ্রোহ।[২৬] রমেশচন্দ্রের বক্তব্যটি ছিল একটি রেসিস্ট এবং কমিউনালিস্ট মন্তব্য। কারণ কোনো একটি আন্দোলন সংগ্রামে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বেশি থাকলেই যে একে মুসলমানদের বিদ্রোহ বলা যাবে এরকম কোনো কথা নেই। এ সংগ্রামে যেমন মুসলমান ছিল, হিন্দু ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও ছিল। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাদের 'The First war of Independence ১৮৫৭-১৮৫৯' প্রবন্ধে মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল বলে বলেন এবং এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।[২৭] তাহলে রমেশচন্দ্রের কথানুযায়ী ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কি আমরা মুসলমানদের যুদ্ধ বলব না শোষিত নিপীড়িত পূর্ববাংলার মানুষের সংগ্রাম বলব। ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু মার্কসবাদীদের মন্তব্য দুঃখজনক। তাদের কেউ কেউ এ যুদ্ধকে দুই কুকুরের লড়াই বলেছেন।[২৮] তবে মার্কসবাদীদের বিরাট অংশ এ লড়াইকে আঞ্চলিক উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত মানুষের লড়াই হিসেবে দেখেছেন এবং লড়েছেন নিপীড়িত মানুষের কাতারবর্তী হয়েই। সেক্ষেত্রে আধা-বুর্জোয়া গোষ্ঠীই ছিল দ্বিধাগ্রস্ত এবং ম্লান। এ ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে মেসবাহ কামাল দেখিয়েছেন তার 'উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, শহীদ আসাদ ও শ্রেণী রাজনীতি প্রসঙ্গ' বইতে।[২৯] সেখানে তিনি দেখিয়েছেন শ্রেণীলড়াই কিভাবে কাজ করেছে, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে নিম্নবর্গের মানুষেরা কিভাবে লড়েছে। তাদের ক্রমবর্ধমান দাবি এবং লড়াইয়ের মুখে কীভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন আধা-বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে অগ্রগামী ছিলেন নিম্নবর্গই।[৩০] তাই যেটা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যদি দুই বুর্জোয়া অংশের লড়াই হিসেবে দেখানো হয়, সেটা হবে ঐতিহাসিক ভুল। তাতে করে এ লড়াই সংগ্রামের পুরো কৃতিত্ব চলে যাবে উচ্চবর্গের হাতে।

তিন

ভারতীয় উপ-মহাদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস দর্শন ও তত্ত্ব যে কাজটা করেছে তা হল উপনিবেশিত দেশগুলোকে হেয়, বর্বর ও অসভ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্নভাবে দেখাতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক দেশগুলো ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে ভারতীয়দের উপকারই করেছে। ভারতীয়দেরকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে সভ্য করেছে, গণতন্ত্রীমনা করেছে।[৩১] কিন্তু পাশ্চাত্য যে গণতন্ত্রের কথা বলছে ওই গণতন্ত্রের আদি ফর্ম ভারতে অনেক আগেই ছিল। এমন সময় ছিল, পাশ্চাত্য যখন সভ্যতার আলোর খুব দূরে ছিল, সেই পাল আমলে সবাই মিলে গণতান্ত্রিকভাবে (যত ক্ষুদ্রই হোক) গোপালকে শাসক নির্বাচিত করেছিল । ভুল বুঝবেন না, আমি 'গণতন্ত্রের' মহিমা কীর্তন করছি না বা ভারতকে গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র প্রমাণ করার কোনো প্রকল্পে নামিনি। যে কথা বলছিলাম, পাশ্চাত্য বলছে উপনিবেশের ভূমিপুত্ররা স্যাভেজ, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি সব হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কার। উপনিবেশবাদী পশ্চিম দেখাচ্ছে, হিন্দুধর্ম গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর এখানকার ইসলাম মানে সন্ত্রাসের ধর্ম। মুসলমান মানে টেররিস্ট। এটা প্রমাণ করতে ওয়েস্ট এখন গাঁট বেঁধে নেমেছে।[৩২] অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রমাণ করতে চাইছে ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশিত দেশের মানুষেরা হয় বর্ণগোঁড়া বা টেররিস্ট ধর্মের অবলম্বী। কিন্তু একটা ব্যাপার হয়তো আমরা ভাবছি না, পশ্চিমে যে ধর্ম বেশি চর্চিত তা হল খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্ম। সেটা কী? খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে দীর্ঘব্যাপী যুদ্ধের কথা আমরা জানি। হলোকাস্টের কথা আমরা জানি। বরং ভারতীয় উপমহাদেশে অধিক চর্চিত ধর্ম 'হিন্দু' ও 'ইসলামের' মধ্যে একটি সামষ্টিক এ্যাটিচিওড রয়েছে। হিন্দুধর্মে রামকৃষ্ণ পরমহংসের যে পথ তা বরং অনেক সামষ্টিক ও সমন্বয়ধর্মী। এ অঞ্চলে ইসলামের একটি সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তি এখানকার মানুষের সংস্কৃতি ও ধর্মে আঘাত করে এই সামাজিক এ্যাটিচিওডটা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে বসন্ত রোগের টিকা দেওয়ার মাধ্যমে কিভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি নিম্নবর্গের সামাজিক চেতনাকে ভেঙে দিতে চেয়েছে, নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী তা দেখিয়েছেন তার প্রবন্ধ 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র: উপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি প্রসঙ্গে।' যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছি তা হল উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা উপনিবেশগুলোর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এমনভাবে নির্মাণ করেছে তা হল 'অপর' । এই অপর কোনো পজেটিভ 'অপর' নয়। উপনিবেশের মানুষরা অসভ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদের সভ্য করা দরকার। বিপ্লবী তাত্ত্বিক এমে সেজার দেখিয়েছেন পশ্চিমাদের এই থিওরি কত অসাড়।[৩৩] পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক ও ইতিহাসকাররা যে সভ্যতার কথা বলেন, মানবিকতার কথা বলেন, আধুনিকতার কথা বলেন, সেই যুগেই উপনিবেশগুলোতে চলে মানুষের ওপর চরম নিপীড়ন। উপনিবেশকাররা মাদাগাস্কারে হত্যা করে হাজার হাজার মানুষ।

সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা তত্ত্ব দেন যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশগুলো উপনিবেশিত হয়েছিল তার কারণ ' দ্যা ডেজার্ভ ইট ' মনোবিশ্লেষক ও তাত্ত্বিক ফ্রানৎস্ ফাঁনোও সেই তত্ত্ব খারিজ করে দেন।[৩৪] তিনি দেখান শারীরিক ও মানসিক গঠনগত দিক দিয়ে এরকম কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই যে কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো উপনিবেশবাদ ডেজার্ভ করে কিন্ত পশ্চিমা মানুষেরা তা ডেজার্ভ করে না ।[৩৫]

চার

এলিট জাতীয়তাবাদী ইতিহাসকাররা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্বের অনেক দিকের সমালোচনা করলেও যেটি তাদের স্বার্থের সাথে মিলে যায় সেটি গ্রহণ করেন তারা। উপনিবেশের জাতীয়তাবাদী এলিট ইতিহাসকার, তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিকরা উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নিপীড়ন ও ইতিহাসের বিরোধিতা করলেও তাদের ভাবনার জগতে বিরাজ করে ঔপনিবেশিক আধিপত্য। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রনজিৎ গুহ তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ 'ঞযব রসধমব ড়ভ ধ ঢ়বধংবহঃ ৎবাড়ষঃ রহ ধ ষরনবৎধষ সড়হরঃড়ঙ্ক-এ দেখিয়েছেন শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর ভাবনার জগতে কিভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মীর মোশাররফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' এবং দীনবন্ধু মিত্র *নীল দর্পণ* লিখলেও শেষ পর্যন্ত তার গতিমুখ সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ভেতরেই। নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখলেও তা আসলে মূল শোষককে খুঁজে বের করতে পারেনি। গ্রামশির তত্ত্বানুযায়ী এদের বলতে পারি ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী।[৩৬] ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ঐতিহ্যবাহী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা সবকিছুকে ভালো ও খারাপ এ দু'টি সরল ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁরা বলছেন, দেশে যত অন্যায় হচ্ছে তার জন্য খারাপ ইংরেজ ও খারাপ জমিদার দায়ী। গুহ দেখিয়েছেন, 'জমিদার দর্পণে' মীর মোশাররফ কিভাবে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য দ্বারা আবর্তিত । মোশাররফের 'জমিদার দর্পণের' নায়ক জমিদার মুসলমান। তিনি মুসলমান ও হিন্দু জমিদারকে দু'টি দলে ভাগ করেছেন। উপন্যাসে ভিলেন জমিদার হাওয়ান কামুক ও অত্যাচারী । আবু মোল্লা তার রায়ত। মোল্লার স্ত্রী নূরন্নেহার সুন্দরী। হাওয়ান তাকে হস্তগত করতে চায় এবং এজন্য সে আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার করে এবং নূরন্নেহারকে জবরদস্তি করে তুলে আনে, ধর্ষণ করে, নূরন্নেহারের মৃত্যু হয়। সে আইনের আশ্রয় নেয়। কারণ আইন তো জমিদারের নয়, মহারানীর। অত্যাচারী জমিদারের মুখেও মোশাররফ ব্রিটিশ আইনের কীর্তন গাওয়ান। হাওয়ান বলে, এখন ইংরেজি আইন বিষদাঁত ভাঙা ।

উপনিবেশবাদীদের আধিপত্য কীভাবে এলিট জাতীয়তাবাদী ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা বিস্তার করেছে তার পরিচয় নূরন্নেহারের পরিণতি দেখা যায় নূরন্নেহারের চরিত্র চিত্রণে। নূরুন্নেহার ধর্ষিত হয়, প্রজা প্রহৃত হয় কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায় না বরং ভারতেশ্বরী ও তার আইনের প্রতি এদের শ্রদ্ধা কয়েকগুন বেড়ে যায়। মৃত্যুপথযাত্রী নূরন্নেহারের মুখ দিয়ে মোশাররফ হোসেন নিঃসৃত করান এমনই উক্তি– 'শুনেছি যে মহারানী সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড় । আমরা যেমন প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার করবেন না? প্রজা বলে কি তার দয়া হবে না? মা, তুমি বেলাতে থাক। তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছ না? কেবল বড় বড় লোকই তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে তুমি কি আমাদের মা হবে না?' এভাবে মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত এলিটদের সকল সাহিত্য, ইতিহাসতত্ত্ব ও মতাদর্শ সব আবর্তিত হয় উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যেই। সুমিত সরকার তাই তাঁর গ্রন্থ 'Beyond Nationalist frame'-এ বলেছেন, একটি আধিপত্যহীন ইতিহাস রচনার জন্য আমাদের এই Nationalist framework থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।[৩৬] এলিট শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামে পাশ্চাত্য শিক্ষা, রেললাইন, তারযন্ত্র এসবকে গুরুত্ব দিয়ে জায়েজ করে নিজেদের অবদানকে। আর শক্তিশালী কৃষকবিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৮৫৭- এর মহাবিদ্রোহকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে প্রাক্-রাজনৈতিক, প্রাক্-জাতীয়তাবাদী।

পাঁচ

আমরা এখানে বিরাজমান যে-তিনটি ইতিহাস দর্শন ও তত্ত্ব দেখেছি (১) সাম্রাজ্যবাদী (২) জাতীয়তাবাদী (৩) মার্কসবাদী– এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস দর্শন উপনিবেশকে হেয় করতে চেয়েছে বটে কিন্তু সেটা যুক্তিহীনভাবে। এক্ষেত্রে অনেক ঐতিহাসিকই উপনিবেশকদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্ব, যেটা আগে বলেছি , এটি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্বেরই বর্ধিত এবং সংস্করণ রূপ। তাই গণমানুষের একটি সৃষ্টিশীল বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চার জন্য তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় কিংবা বিশ্ব ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদ যে একটি বড় বিপ্লব এনেছে তা অস্বীকার করা যাবে না । মার্কসবাদী ইতিহাস দর্শন ইতিহাসকে 'টোটাল' ইতিহাস পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এখানকার অনেক মার্কসবাদী ইতিহাসকার ও তাত্ত্বিকদের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা একটা রেডিক্যাল জায়গায় অবস্থান করছেন। তাদের ইতিহাসচর্চার শুরুই উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্ত্বের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। তবে এটা মনে রাখতে হবে, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা একটি আলাদা স্কুল হলেও তা মার্কস্বাদী ইতিহাস ঘরানা থেকে ফিলজফিকাল্লি দূরবর্তী নয় । বলা যায় নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চারই বর্ধিত রূপ এবং মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার সহায়ক হতে পারে । নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার যে নামটি নেওয়া হয়েছে 'Subaltern Studies' তা-ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) কারাগারের নোটবইয়ে 'সুবলতার্ন' শব্দ থেকে। ইংরেজি ভাষায় সাবলটার্ন শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে । ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন অফিসারদের বলা হয় সাবলটার্ন। এজন্য তপন রায় চৌধুরী কৌতুক করে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকে হাবিলদার চর্চা বলেও অভিহিত করেছেন তার 'বাঙালনামায়' /[৩৭] তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ অধঃস্তন বা নিম্নস্থিত। আরিস্ততলীয় ন্যায়শাস্ত্রে এর অর্থ এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনো প্রতিজ্ঞার অধীন বিশিষ্ট মূর্ত। সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'সাবর্ডিনেট'। সাবলটার্ন (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়েতেরই' প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাবলটার্ন শ্রেণী হল শ্রমিকশ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতায় এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাস সাবলটার্ন শ্রমিকবেশীর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেজেমনিক' শ্রেণীর অর্থাৎ পুঁজিমালিক, বুর্জোয়া এই বিশ্লেষণে গ্রামশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ওপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেজেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেজেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে সাবলটার্ন শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু যেখানে পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতায় প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্ক কাজ করে সামন্তশ্রেণীর প্রভুত্ব ও কৃষকশ্রেণীর অধীনতার মধ্য দিয়ে। গ্রামশি প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কের সাধারণ চরিত্রটির সন্ধান করেছেন প্রধানত সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলোতে। দু'টি মূল ঝোঁক কাজ করেছে তার মধ্যে। একদিকে ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্যের আর অবজ্ঞার ভাব ছিল, তার বিরুদ্ধে গ্রামশি বলে গেছেন, 'সাবলটার্ন কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। একই সঙ্গে তিনি কৃষকচেতনার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস গবেষণায় সাবলটার্ন শ্রেণীর ধারণা ও তাদের ইতিহাসে অংশগ্রহণের কথা বলেছেন রনজিৎ গুহের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিক। তারা তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ , Elementary Aspect of the Peasant Insurgency in Colonial India (Ranajit Guha); Dominance without Hegemony (Ranajit Guha); Provincializing Europe (Dipesh

Chakrabarti); History and Present (Partha Chaterjee); Princely Imposter (Partha Chaterjee) বইগুলোতে বলেছেন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সংগ্রামে নিম্নবর্গের উপস্থিতি এবং সীমাবদ্ধতার কথা। এ পর্যন্ত নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ১২টি ভল্যুম বেরিয়েছে। এছাড়া আলাদাভাবে তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ তো রয়েছেই। প্রথমদিকে তাঁরা শুধু ইতিহাসে নিম্নবর্গের উপস্থিতির কথা দেখালেও এখন এ ইতিহাসকাররা নিম্নবর্গের চেতনার সীমাবদ্ধতার কথাও বলছেন।

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ফলে মার্কসীয় ইতিহাস দর্শন ও তত্ত্বে অনেক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস দর্শনের এনকাউন্টারে গড়ে উঠেছে নতুন ইতিহাস ঘরানা। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এমনকি বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চা ঘরানার ইতিহাসচর্চা গোষ্ঠী– জন ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র।

তবে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অনেক সমালোচনার জায়গাও এসেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা উপনিবেশিক তথ্য-উপাত্তকে বিপরীত পাঠ দিচ্ছেন তা বিজ্ঞানসম্মত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এছাড়া নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা যে নিম্নবর্গের কথা বলছেন, সে নিম্নবর্গ কি কথা বলতে পারে কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী।[৩৮] আর তপন রায় চৌধুরী তো কৌতুক করে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীদের হাবিলদার ইতিহাসচর্চাকারী বলে ছেড়েছেন।[৩৯] নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীদের আরেক সমালোচক হলেন সাবেকী নিম্নবর্গের ইতিহাসগোষ্ঠীর ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার। 'রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি'তে সাবলটার্ন ডেকলাইন ইন সাবলটার্ন স্টাডিজে তিনি অভিযোগ তুলেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গেরা হারিয়ে যাচ্ছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা এখন ব্যস্ত উত্তর-আধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ফুকোর ক্ষমতা প্রশ্ন আলোচনায়। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা অনেকটা ফুকোডিয়ান ডিসকোর্সে আটকে গেছেন বলেও সুমিত দাবি করেছেন। তবে সে যা-ই হোক নিম্নবর্গের ইতিহাস ইতিহাস দর্শনে এনেছে নতুন দিশা। গোটা উপনিবেশবাদী ইউরোকেন্দ্রিক ইতিহাসের বিপরীতে ইতিহাসে নিম্নবর্গের উপস্থিতিকে মজবুত করে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী আধিপত্যকে কেন্দ্রচ্যুত করবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যপঞ্জি

১. G.W.F Hegel, Philosophy of History, New York 1956

২. গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়; নিম্নবর্গের ইতিহাস; আনন্দ ২০০৪।

৩. E.J Hobsbawm and G.Rude; Captain Swing London 1969

৪. E.J Hobsbawm; Primitive Rebels; Manchester, 1959

৫. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত

৬. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৯৭৯

৭. গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত

৮. বাসদ, বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামো ও রাষ্ট্রচরিত্র; ঢাকা ১৯৯০

৯. বাসদ, প্রাগুক্ত

১০. Frantz Fanon; The Wretched of the Earth; Penguin 2001

১১. Marx; Future Results of British Rule in India , New York Daily Tribune 1853

১২. Karl Marx; প্রাগুক্ত

১৩. Hamza Alavi, 'India and the Colonial mode of Productions', Ralph Miliband and John Savialle (edt) The Social Register; London 1975; Hamza Alavi; Ibid

১৪. Ibid

১৫. Ibid

১৬. Ibid

১৭. Ibid

১৮. ইরফান হাবিব ; ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা ২০০২।

১৯. G.W.F Hegel, Ibid

২০. Marx; Future Results of British Rule in India , New York Daily Tribune 1853

২১. Karl Marx; Ibid

২২. Marx and Engles; The First war of Independence; Tribune 11 July 1853

২৩. Irfan Habib; Understanding 1857, Peoples Democracy, May 2007

www.cpim.org/pd/2007/0132007-irfan.htm
২৪. আহমেদ কামাল; নতুন দিগন্ত ২০০৭
২৫. Gautam Bhadra, Four rebels of 1857 , Subaltern Studies , Vol- 4, Oxford
২৬. Romesh Chandra Majumder; The sepoy mutiny and the Revolt of 1857; 1957
২৭. Marx and Engles, Ibid
২৮. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর; ইতিহাস নির্মাণের ধারা; বাংলাদেশ চর্চা; ২০০৫, ঢাকা ।
২৯. মেসবাহ কামাল, ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান; শহীদ আসাদ ও শ্রেণী রাজনীতি প্রসঙ্গ; শ্রাবণ, ঢাকা ২০০৭ ।
৩০. মেসবাহ কামাল, স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা, কলকাতা, ২০০৬
৩১. Edward W Said; Orientalism, Penguin 2004
৩২. Edward W. Said, Covering Islam, Vintage 1997
৩৩. Aime Cesaire; Discourse on Colonialism; monthly Review 2000.
৩৪. Frantz fanon; Black Skin white Mask; Grove press Inc 1967.
৩৫. Antonio Gramsci; Selections From the Prison Note books, Orient longman 2004
৩৬. Sumit Sarkar; Beyond Nationalist Frame : Relocating postmodernism, Hindutva, History, Permanent Black 2005
৩৭. G. Spivak, Can Subultern Speak; Post Colonial Studies; Routhledge 2004
৩৮. তপন রায় চৌধুরী; বাঙালনামা; আনন্দ মে ২০০৭
৩৯. Sumit Sarker, Writting Social History, Oxford, India, 2004